মাসুদ রানা
নীলছবি
দুই খণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
Naeem
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

নীল ছবি

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7042-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

সেবা প্রকাশনী

বাষট্টি টাকা

Masud Rana
NEEL CHHABI
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

নীল ছবি-১ ১—৯৩
নীল ছবি-২ ৯৪-১৯২

মাসুদ রানার ভলিউম

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) ৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) ৬৭/-
২১৭-২১৮ অধিকারী১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) ৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) ৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৫৬/-
২৬৯-২৮৫ কিলব্যাক+মাদকচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি ৫১/-
২৮০-২৮১ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি ৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) ৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু ৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৪২/-

২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+খাবসের নকশা ৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি ৪০/-
৩০১-৩৪৪ জলদস্যু+ক্রাইম ক্লাব ৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99 ৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী ৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম ৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা
৩১১-৩১৪ বুকের খাঁচা+মুক্তিপণ ৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু ৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা ৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা ৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা ৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল ৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ ৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) ৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ ৪৬/-
৩৩১-৩৪১ রাইডু মিশন+আরেক গডফাদার ৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত ৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+এজেন্ট X-15 ৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন ৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব ৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) ৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী ৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন ৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ ৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা ৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা ৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) ৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ [illegible]+বন্দি রানা ৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন ৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ ৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সফলতা+অখণ্ড অবসর ১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ হাইজার ১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস ৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ ৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট ৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে) ৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা ৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) ৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+টাইপান ৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে ৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) ৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে) ৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট ৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে) ৮৭/-

নীল ছবি-১

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৭৫

এক

প্যারিসের প্লেস ডি লা কংকর্ড।

রাস্তার পাশে বিরাট এক অট্টালিকার পঞ্চম তলায় ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের অফিস। দামী কার্পেট মোড়া সুসজ্জিত অফিসে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে কালো চামড়ামোড়া সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছে ইউরোপ ডিভিশনের চিফ—শ্রী জটিলেশ্বর রায়।

তেহরান থেকে বদলি হয়ে প্যারিসে এসে প্রথম দিকে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল জটিল রায়ের। কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই টের পেয়েছে, এই আকস্মিক বদলিটা ডিমোশন তো নয়ই, রীতিমত কয়েক ধাপ প্রোমোশন। চাকরি যায়-যায়, এমনি অবস্থায় বদলি হলে কার না এমন মনে হয়? কিন্তু এখানে কাজ ও দায়িত্বের নমুনা দেখে ভারমুক্ত হয়ে গেছে মনটা, পূর্ণ উদ্যমে চালু করে দিয়েছে সে তার জটিল কর্মতৎপরতা। এ অঞ্চলে নতুন জোয়ার এসে গেছে ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের কাজেকর্মে। ইতিমধ্যেই হেড অফিস থেকে পাঠানো তিন-তিনটে প্রশংসাপত্র জমে গেছে তার হাতে। আজ এসেছে চতুর্থ চিঠি। সেই সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির সুখবর। মনটা ভাল লাগছে তাই।

সুইভেল চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে রয়েছে জটিল রায়, দাঁতের ফাঁকে নিভু নিভু চুরুট, চোখে পুরু লেনসের চশমা, ঠোঁটের কোণে আত্মতৃপ্তির স্মিত হাসি, আনমনে নাড়ছে বাম হাতে দুই আঙুলে ধরা চকচকে স্টীলের পেপার নাইফ।

ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে পার্কটা। বসন্ত এসেছে মোহময়ী প্যারিসে। সকালের রোদে পার্কে খেলছে একদল শিশু, পেরামবুলেটার ঠেলছে কয়েকজন মাঝবয়সী গৃহিণী, গল্প করছে। চারদিকে একটা খুশি খুশি ভাব। দৃষ্টিটা পার্ক থেকে সরে স্থির হলো ব্যস্ত সড়কের উপর। মহানগরীর কর্মব্যস্ততা দেখলে ভাল লাগে জটিলেশ্বরের। বিশেষ করে টেবিলের উপর যখন ইমিডিয়েট লেখা একটা ফাইলও না থাকে, তখন পুরো একটি ঘণ্টা পার করে দিতে পারে সে ব্যস্ত রাজপথের দিকে চেয়ে। পা দুটো টেবিলের উপর তুলে আরও একটু আরাম করে বসতে যাচ্ছিল জটিল রায়, এমনি সময় বেজে উঠল টেলিফোনের বাযার।

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল জটিলেশ্বরের। টেলিফোন মানেই ঝামেলা। এক নিমেষে সমস্ত মানসিক শান্তি উড়িয়ে দিতে পারে শুধু একটা টেলিফোন। মুহূর্তের

মধ্যে পাল্টে দিতে পারে সবকিছু। তাই বলে না ধরেও তো আর পারা যায় না। ঝামেলা তো হবেই। জটিল রায়ের জীবনের তিন চতুর্থাংশই তো ঝামেলা। রিসিভার কানে তুলে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস?'

সেক্রেটারি আসমা শেরির সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নীতিশ বাবু লাইনে আছেন, স্যার। দেব?'

নীতিশ গুহ জটিলেশ্বর রায়ের ডান হাত। তুখোড় লোক। জটিলেশ্বরের সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম, তা যতই জটিল বা কুটিল হোক না কেন, দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত করবার দায়িত্ব তার। নীতিশের ফোন মানেই ঘাপলা। গেল সুন্দর সকালটা। দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল জটিলেশ্বর।

'দাও।' ক্লিক শব্দ হতেই বলল, 'গুহ বলছ? কি খবর?'

'নমস্কার, স্যার।' নীতিশের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। একটু যেন চাপা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে। 'স্ক্র্যাম্বলার বাটনটা টিপে দিন, স্যার।'

ভ্রূজোড়া কপালে উঠল জটিল রায়ের। যা ভেবেছিল তাই! ঘাপলা। পেপার-নাইফটা গ্লাস-টপ টেবিলের উপর রেখে বোতামটা টিপে দিল সে। বলল, 'বলো এবার।'

'এইমাত্র সমরজিতের রিপোর্ট পেলাম। ওর ডিউটি ছিল অর্লি এয়ারপোর্টে। ও বলছে, এইমাত্র দিল্লী থেকে বি. ও. এ. সি-র ডিরেক্ট ফ্লাইটে প্যারিস পৌঁছেছেন শংকরলালজী। ছদ্মবেশে। জাল পাসপোর্ট নিয়ে।'

বার কয়েক চোখ মিট মিট করল জটিলেশ্বর। নীতিশের কথাগুলো ঠিকমত শুনেছে সে? নাকি কানে কম শুনছে আজকাল? পঞ্চাশ পেরোতেই কানের এই গোলমাল···বয়সটা···'

'কে? কি নাম বললে?' রিসিভারটা কানের সাথে ঠেসে ধরল জটিল রায়।

'ঠিকই শুনেছেন, স্যার,' বলল নীতিশ গুহ। 'আমিও চমকে গিয়েছিলাম প্রথমে। শংকরলালজী। কংগ্রেস নেতা।'

স্পষ্ট অনুভব করল জটিল রায়, হার্টবিট দ্বিগুণ হয়ে গেছে তার। শরীরের সব রক্ত ছুটছে মাথার দিকে।

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল জটিল রায়। 'কী বলছ তুমি! বুঝে বলছ?'

'এইমাত্র অর্লি এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সেন্ট্রাল প্যারিসের দিকে রওনা হয়েছেন শংকরলালজী।' নীতিশের কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন—শুষ্কং কাষ্ঠং। 'ছদ্মবেশে। ছদ্ম পরিচয়ে।'

'অসম্ভব!' প্রায় গর্জে উঠল জটিল রায়। 'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে সমরজিতের। শংকরজী এখন নয়াদিল্লীতে। আগামী ইলেকশনের···'

'কোথায় ওঁর থাকার কথা, কি করবার কথা, সবই জানা আছে আমার, স্যার। কিন্তু বর্তমানে তিনি যে ট্যাক্সিতে করে সেন্ট্রাল প্যারিসের দিকে চলেছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আপনার হয়তো স্মরণ নেই, সার্ভিসে যোগ দেয়ার আগে চার

বছর শংকরজীর বডিগার্ড ছিল আমাদের সমরজিৎ। ওঁর চলার ভঙ্গি, হাঁটতে গিয়ে সামান্য একটু খোঁড়ান, কথা বলার সময় সামান্য একটু ঘাড় কাৎ করা—সব সমরজিতের মুখস্থ। এই লোকটা একজোড়া চওড়া গোঁফ লাগিয়েছে ঠোঁটের ওপর। গাঢ় রঙের সানগ্লাস লাগিয়েছে চোখে, নেমেছে ট্যুরিস্ট ক্লাসের দরজা দিয়ে। কিন্তু সমরজিৎ হলপ করে বলছে, এ-লোক শংকরলালজী ছাড়া আর কেউ নয়। সমরজিৎকে ভাল করেই চেনেন আপনি, স্যার। ভুল করবার লোক ও নয়।'

'কিন্তু—এসব কি বলছ তুমি, গুহ! শংকরজীর নিরাপত্তার জন্যে দিনরাত পাহারায় থাকে আই. বি-র লোক। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে···নাহ্, অসম্ভব! তাহলে টের পেত ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, হুঁশিয়ার করে দিত আমাদের। এত ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার—নাহ্, ভুল হয়েছে সমরজিতের।'

'না, স্যার।' নীতিশ গুহের কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু অসহিষ্ণুতার আভাস প্রকাশ পেল। সেটা বুঝতে পেরে চট করে বলল, 'ক্ষমা করবেন, স্যার। এখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। হাতে সময় নেই। নারায়ণ দেশাইয়ের পরিচয়ে তার পাসপোর্ট নিয়ে এসেছে শংকরজী। দু'জনের চেহারার আশ্চর্য মিলের কথা জানা আছে আপনার। গত বছর কয়েকবার জার্নালিস্টদের হাত থেকে শংকরজীকে রক্ষা করতে নারায়ণ দেশাইকে ব্যবহার করা হয়েছে ডিকয় হিসেবে, সেটাও জানেন। প্রয়োজনে যাতে কাজে লাগতে পারে সেজন্যে দেশাইকে আমরা চওড়া গোঁফ রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলাম, গাঢ় সানগ্লাস পরবার নির্দেশ দিয়েছিলাম—সহজে মিলটা যাতে লোকের চোখে না পড়ে।'

'তুমি শিওর, এই লোকটা দেশাই নয়?'

'ফাইভ হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর। টেলিফোন পাওয়ার সাথে সাথেই আমি নয়াদিল্লীর সাথে যোগাযোগ করে চেক করেছি ব্যাপারটা। দেশাই সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ভেঙে শুয়ে আছে একটা নার্সিং হোমে। আর শংকরজী ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী—একমাত্র স্ত্রী ছাড়া কারও সাথে দেখা করছেন না। আমার বিশ্বাস, কোনমতে আই. বি-র চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেছেন উনি বাড়ি থেকে, ওঁর স্ত্রী চিকিৎসার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন—আসল লোক এখন প্যারিসে। কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'কোথায় উঠেছে বলতে পারবে?'

'না, স্যার। সমরজিৎ ফলো করতে পারেনি। এয়ারপোর্টে দাঁড়ানো শেষ ট্যাক্সিটা নিয়েই ভোঁ করে বেরিয়ে গেছে শংকরজী। ট্যাক্সির নম্বরটা অবশ্য টুকে নিয়েছে ও। অর্লি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে এখন, ট্যাক্সিটা ফিরে এলে ড্রাইভারের কাছ থেকে ঠিকানাটা সংগ্রহ করা যায় কিনা সেই আশায়। কিন্তু ওসবে, স্যার, দেরি হয়ে যাবে অনেক। আপনি যদি বলেন, আমি সমস্ত হোটেল চেক করে দেখতে পারি। দেখব?'

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল জটিলেশ্বর, দ্রুতবেগে চিন্তা চলেছে মাথার

ভিতর। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই। বলল, 'না। মালপত্র কিছু ছিল শংকরজীর সাথে?'

'ছোট্ট একটা সুটকেস। আর কিছুই ছিল না।'

'ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো, গুহ। কিছুই করো না। একেবারে চুপ হয়ে যাও। সমরজিৎকেও তাই করতে বলো। একেবারে চুপ। সেই ট্যাক্সিটা যদি পাওয়া যায়, ঠিকানাটা বের করার চেষ্টা করতে পারে—কিন্তু হালকা ভাবে। কোনমতেই যেন কোনরকম হৈ-চৈ না হয়। বুঝলে? ব্যাপারটা খুব জটিল মনে হচ্ছে। খুব সাবধানে এগোতে হবে আমাদের। টেলিফোনের কাছেই থাকো তুমি, গুহ। ঝট করে দরকার পড়তে পারে তোমাকে।'

নীতিশ গুহ উত্তর দেয়ার আগেই রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল জটিলেশ্বর। চেয়ারটা সামান্য একটু টিল্ট করে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ধবধবে সাদা দেয়ালের দিকে। কমপিউটারের গতিতে কাজ করছে এখন তার উর্বর মস্তিষ্ক।

এই লোকটা যদি সত্যিই শংকরলালজী হয়ে থাকে, কি করছে সে প্যারিসে? সমরজিতের যে ভুল হয়নি সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই আর। পাগল-টাগল হয়ে গেল না তো লোকটা? এই চিন্তাটা এক সেকেণ্ডের বেশি স্থায়িত্ব পেল না ওর মাথায়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পাগল হয়নি। অনিলা শংকর যখন তার স্বামীকে এই রহস্যময়, শুধু রহস্যময় কেন, ভয়ানক বিপজ্জনক যাত্রায় সাহায্য করছে, তার মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে সবার অলক্ষ্যে শংকরলালজীর দেশের বাইরে এই প্যারিসে ছুটে আসবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশেষ কোন কাজে এসেছে শংকরজী, এসেছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে।

ঘামে ভিজে ওঠা হাত দুটো রুমালে মুছল জটিল রায়। কপালে বুলাল রুমালটা। ঘেমে নেয়ে ওঠার মতই ব্যাপার। কোনভাবে যদি জানাজানি হয়ে যায় ব্যাপারটা! হঠাৎ চিনে ফেলে যদি কোন সাংবাদিক! কংগ্রেসের সবচেয়ে দুর্দান্ত নেতা ছদ্মবেশে প্যারিসে! তা-ও আবার জাল পাসপোর্টে! ধরা পড়লে কী ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে ভাবতেই কলজে শুকিয়ে এল জটিলেশ্বরের।

শুধু কংগ্রেসের প্রতিপত্তিশালী নেতাই নয়, ভারতের অন্যতম ধনীদের একজন শংকরলালজী। ভালমানুষি দেখাবার জন্যে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে কংগ্রেসকে গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল—কিন্তু যাদের দেখবার চোখ আছে তারা জানে, আসলে নিজের ভবিষ্যৎ গড়বার কাজে লেগেছিল লোকটা। শোনা যায় গুছিয়ে এনেছে প্রায়—আগামী নির্বাচনে ভানুমতির খেল দেখা যাবে ভারতের রাজনীতিতে। এহেন প্রভাব আর প্রতিপত্তি যে লোকের, এতবড় ঝুঁকি নেয়ার মত কী এমন ব্যক্তিগত দরকার হয়ে পড়ল তার? জটিলেশ্বর রায়ের কাছে একটা ট্রাংকলই কি যথেষ্ট ছিল না? শুধু সাংবাদিক কেন, ডুকসেম ব্যুরো রয়েছে, পাকিস্তানী স্পাই রয়েছে—কারও চোখে পড়ে গেলে...উফ্! এই রকম একটা কাজ কেন করতে গেল লোকটা?

আজকের নয়, শংকরলালজীর সাথে তার পরিচয় গত ত্রিশ বছরের। বোম্বের এলফিনস্টোন কলেজে পড়বার সময় একই হোস্টেলের একই কামরায় ছিল ওরা দুই বছর। শংকরজী অবশ্য ওর চেয়ে এক বছরের সিনিয়ার, কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গভীর এক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ওদের দু'জনের মধ্যে। চোখ বুজলেই সেই সময়ের শংকরজীকে দেখতে পায় জটিলেশ্বর—প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর, যেন তেজি এক রেসের ঘোড়া। নিজ ক্ষমতার বলে উঠে গেছে লোকটা আজ এত উপরে, নিজ হাতে গড়েছে নিজের ভাগ্য। এই লোকটার নজির ওকে বহুবার বহু দুঃখ-দুর্দশা-বিপদের মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ওকে অযোগ্য বলে ফোর্স রিটায়ার করার ব্যবস্থাটা যে শংকরলালজীর জন্যে বানচাল হয়ে গেছে তা ভাল করেই জানা আছে ওর। এই লোকটা কড়া করে ধমক না দিলে আজ জটিলেশ্বরের পক্ষে এই চেয়ারে বসা অসম্ভব হয়ে পড়ত। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সামনে হাজির হয়েছিল শংকরজী: এমন একজন অভিজ্ঞ লোককে হারাতে পারি না আমরা। এমন একটা প্রতিভাকে অকালে নষ্ট করা যায় না। ভুল হয়েছে ওর, মানি, কিন্তু সেটা শুধরে নিয়ে ও যেভাবে শেষরক্ষা করেছে তার জন্যে প্রোমোশন হওয়া উচিত ওর। ওকে রেখে দিন।

কথাগুলো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রেখেছে জটিলেশ্বর। শংকরজীর রাজনীতির প্রতি ওর আস্থা নেই। ওর আখের গুছিয়ে নেয়ার কূট-কৌশল আর অতি-ডানপন্থী কার্যকলাপ মাঝে মাঝে বিরক্তিই উৎপাদন করেছে বরং। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আনুগত্যবোধ রয়েছে ওর মধ্যে। শংকরজীর জন্যে অনেক কিছু করতেই সে একপায়ে খাড়া। কিন্তু এ অবস্থায় ঠিক কি যে করা যায় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সে। শংকরজী নির্বোধ না, কতটা বিপদের ঝুঁকি রয়েছে সেটা ভালমত জেনেশুনে বুঝেই এসেছে। এর ফলে যে তার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, ভাল করেই জানা আছে তার। ধরা পড়লে কি বিশ্রী স্ক্যাণ্ডেলে মুখর হয়ে উঠবে সারা পৃথিবী, স্টোনহাউসের চেয়েও যে কতবড় কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে সেটা, তা বোঝার মত ক্ষমতা রয়েছে শংকরজীর। তবু এইভাবে এখানে আসা··· কি এমন জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল যার ফলে···

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনাগুলো পরিষ্কার হয়ে গেল জটিলেশ্বরের মাথায়। স্থির করল, কিছু না করাই এখনকার জন্যে সবচেয়ে ভাল কাজ হবে। একেবারে হুট করে নিশ্চয়ই আসেনি শংকরজী, নিশ্চয়ই নিজের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেই এসেছে। কাজেই খুব একটা মাথা ঘামাবার দরকার নেই। নীতিশকে চুপ থাকতে বলেছে সে, নির্দেশ পেয়ে চুপ হয়ে যাবে সমরজিৎও। ছদ্ম পরিচয়ে এসেছে, যা করতে এসেছে করুক, তারপর ফিরে যাক তার সাজানো রোগশয্যায়। মাঝপথে কেউ কোন গোলমাল না করলে ঠিক তাই করবে শংকরজী, কিন্তু যদি করে গোলমাল? জাল পাসপোর্ট নিয়ে চলাফেলা করার জন্যে যদি ধরে

ফেলে ফ্রেঞ্চ পুলিস? জানালা দিয়ে ফুলে ছাওয়া পার্কের দিকে দৃষ্টি ফেলল জটিলেশ্বর, চাইল ব্যস্ত রাজপথের দিকে, কিন্তু টের পেল ভাল তো লাগছেই না, উদ্বেগ বাড়ছে উত্তরোত্তর। যদি টের পেয়ে যায় পাকিস্তানীরা! কিংবা কোন ক্র্যাকপট যদি গুলি করে বসে! শত্রুর তো অভাব নেই শংকরলালজীর, যদি চিনতে পেরে…

চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল জটিলেশ্বরের। যা খুশি ঘটে যেতে পারে। এত বিরাট এক পলিটিকাল ফিগার কী ছেলেমানুষি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে! কিছু একটা করা উচিত ওর, কিন্তু কি করবে?

ঠিক যেন এই প্রশ্নের উত্তরেই আবার বেজে উঠল টেলিফোনের বাযার।

'আবার কি?' চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে যাওয়ায় একটু বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল জটিল রায়।

'আপনার একটা কল এসেছে, স্যার,' বলল সুন্দরী আসমা শেরি। 'নাম বলতে চাইছে না কিছুতেই। শুধু বলছে আপনার সাথে এলফিনস্টোন কলেজে পড়েছে। কথা বলতে চায়।'

লম্বা করে দম ছাড়ল জটিলেশ্বর।

'দাও। এক্ষুণি।'

খুট করে একটা ছোট্ট শব্দ হলো, পরমুহূর্তে ভেসে এল একটা ভারি, পুরুষ কণ্ঠস্বর।

'কে? জটিল?'

'হ্যাঁ। নিজের পরিচয় দেবেন না। লাইনটা ওপেন। আমি জানি আপনি কে। যে-কোনরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি আমি। মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারণ করবেন।'

'তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। খুব জরুরী।'

চট করে এনগেজমেন্ট ডায়েরীর উপর চোখ বুলিয়ে নিল জটিলেশ্বর। দেখল, আগামী এক ঘণ্টায় দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কিন্তু কোনটাই তেমন জরুরী না।

'কোথায় উঠেছেন?'

'পার্ক হোটেলে। রিউ মেসলেতে।'

'পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। আপনি কামরাতেই থাকুন। নারায়ণ দেশাইকে খোঁজ করব তো?' শংকরজীকে চমকে দেয়ার লোভটা সংবরণ করতে পারল না জটিলেশ্বর। কথাটা বলার সাথে সাথেই রিসিভার কানে ধরা অবস্থায় শংকরজীর আঁৎকে ওঠা উপভোগ করল।

'হ্যাঁ… কিন্তু তুমি…'

'রওনা হয়ে গেলাম।' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল জটিলেশ্বর। হাসিমুখে পুরু লেনসের চশমাটা মুছে নিয়ে পরল, তারপর উঠে দাঁড়াল। হ্যাঙ্গার থেকে কোটটা নামিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল অফিস কামরা থেকে।

সুন্দরী হলেও দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাবার ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে আসমা

শেরি জটিলেশ্বরের সাহচর্যে। প্রথমে নীতিশ গুহর টেলিফোন, তারপর একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোকের সাথে আলাপ, পরমুহূর্তে বসকে হন্তদন্ত হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বুঝে নিল বড়সড় গোলমাল বেধেছে কোথাও। গত দু'বছরে গোলমালে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে-ও। টাইপ রাইটার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শাড়ি পরা পুতুল।

'তিনটের আগে না-ও ফিরতে পারি,' বলল জটিলেশ্বর চলার গতি একটু কমিয়ে। 'আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো ক্যানসেল করে দাও। বলে দাও শরীর ভাল না।' ক্ষিপ্র পদে চলে গেল সে লিফটের দিকে। চুরুটটা নিভে গেছে সে-খেয়াল নেই।

প্লেস ডি লা রিপাবলিকের কাছে পার্ক হোটেল। মাঝারি। বেশ কিছুটা দূরে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে মিনিট দুয়েক হাঁটল জটিলেশ্বর, বাইরে থেকে লক্ষ করল হোটেলটা, তারপর আলগোছে ঢুকে পড়ল লবিতে। এই হোটেলটা বেছে নিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে শংকরলালজী। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না ভারতের একজন প্রথম সারির নেতা এমন সাধারণ এক হোটেলে এসে উঠতে পারে।

রিসেপশন ডেস্কে বসে আছে টাকমাথা এক মোটা লোক। সস্তা খাবারের গন্ধে ভুরভুর করছে হোটেলের ভিতরটা, তার মধ্যে পেঁয়াজের গন্ধটাই প্রবল। একটা খবরের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে মোটা লোকটা। পিছনে চাবির র‍্যাক, ডানপাশে পুরানো মডেলের একটা টেলিফোন সুইচবোর্ড।

'মশিয়ে নারায়ণ দেশাই আছেন?' ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল জটিলেশ্বর।

বিস্মিত, ঘুমঘুম দৃষ্টিতে চাইল লোকটা ওর মুখের দিকে। চোখ মিটমিট করল।

'কি নাম বললেন?'

নামটা আবার বলল জটিলেশ্বর।

একটা রেজিস্টার বের করল লোকটা নিচের কোন ড্রয়ার থেকে টেনে। পাতা উল্টে শেষ পাতায় এসে থামল। মন দিয়ে পড়ল নামটা, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ছিয়াত্তর নম্বর কামরা। পাঁচতলায়।' কথাটা বলেই আবার কাগজ পড়ায় মন দিল লোকটা। কাগজ থেকে চোখ না সরিয়ে উদাস কণ্ঠে বলল, 'লিফট নেই, মশিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে যেতে হবে। আপনার ডান পাশে সিঁড়ি।'

যথেষ্ট বয়স হলেও হালকাপাতলা গড়ন জটিল রায়ের, রোজ ভোরে স্কিপিং করে ঠিক রেখেছে শরীরটা—টপাটপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল পাঁচতলায়। রোঁয়া ওঠা সবুজ কার্পেট বিছানো করিডরে। দরজার মাথার নম্বর গুনতে গুনতে ছিয়াত্তর নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল সে। খেয়াল করল, বেশ দ্রুত ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভিতরটা। এটা সিঁড়ি ভাঙার ফলে, নাকি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বলে, ঠিক বুঝতে পারল না সে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে

থেকে লম্বা করে দম নিয়ে মৃদু টোকা দিল দরজায়। সামান্য বিরতির পর খুলে গেল দরজা।

'এসো, জটিল। ভেতরে এসো।'

কমদামী আসবাবে সাজানো অপ্রশস্ত বেডরুম। অ্যাটাচড বাথরুমের রঙ-চটা দরজা দেখলেই বোঝা যায় কতটা সস্তা হোটেল। জটিলেশ্বর ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল শংকরলালজী। ছিটকিনি তুলে দিয়ে তালা মেরে দিল ভিতর থেকে। তারপর ফিরল জটিলেশ্বরের দিকে।

লম্বা, চওড়া, প্রকাণ্ড চেহারা শংকরলালজীর। বয়স আটান্ন কি ঊনষাট। চোখে-মুখে ক্ষমতার প্রভা। ভারতীয় পোশাক ছেড়ে বিদেশী পোশাক পরেও প্রবল ব্যক্তিত্ব ঢাকতে পারেনি। চাহনির বৈশিষ্ট্য পৃথক করে দেয় তাকে সাধারণ থেকে, এক নজরেই চেনা যায় এই লোক যে-সে নয়।

বছর পাঁচেক আগে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা হয়েছিল একবার, ইতিমধ্যে আরও খানিকটা বুড়িয়ে যাওয়ার কথা স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু তবু প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝে নিল জটিলেশ্বর, ভয়ানক কোন চাপের মধ্যে রয়েছে শংকরজী। চোখের কোলে কালি, কপালে কয়েকটা বিশেষ ভাঁজ—এগুলো বয়েসের জন্যে নয়, পরিষ্কার উদ্বেগের চিহ্ন।

'অনেকদিন পর দেখা,' বলল শংকরলালজী। 'এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছবে ভাবতেও পারিনি।' সরাসরি জটিল রায়ের চোখের দিকে চাইল এবার। 'কিন্তু নারায়ণ দেশাইয়ের ব্যাপারটা তুমি টের পেলে কি করে?'

কোটটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলাল জটিলেশ্বর। শংকরজীকে বিছানার উপর বসতে দেখে একমাত্র চেয়ারটা দখল করল। চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'অর্লি এয়ারপোর্টেই ধরা পড়ে গেছেন আপনি আমাদের এজেন্টের চোখে। আপনার এমবার্কেশন কার্ড চেক করেই নিশ্চিত হয়েছে সে। নীতিশ ফোন করেছিল খানিক আগে, আমি চেপে যেতে বলেছি ওকে।'

মোনাজাতের ভঙ্গিতে দুই হাতে মুখ ঘষল শংকরজী, কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'কিন্তু এতসবের পরও কি করে চিনে ফেলল তাই ভাবছি,' চোখ না তুলেই বলল শংকরজী।

'অর্লি এয়ারপোর্ট কাভার করছিল সমরজিৎ। ওকে মনে পড়ে? আপনার বডিগার্ড ছিল এক সময়। আপনার হাঁটার ভঙ্গি দেখেই চিনে ফেলেছে ও আপনাকে।'

মুখটা উঁচু করল শংকরজী। হাসল ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে।

'বুঝতে পারছি, তোমার বরখাস্তের কথাটা কানে যেতেই গায়ে পড়ে ওদের সাথে ঝগড়া করে ভালই করেছিলাম। যার যা কাজ। তেমনি হারামীই আছ তুমি, জটিল। তেমনি এফিশিয়েন্ট। তোমার লোকজনগুলোও ভাল।'

'হ্যাঁ। কবে দেশে ফিরবেন বলে ঠিক করেছেন?'

'আজই। নেক্সট ফ্লাইটে। তিন ঘণ্টা পর।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কেন এসেছি আন্দাজ করতে পারো?'

'না,' মাথা নাড়ল জটিলেশ্বর। 'বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই খুব জরুরী কিছু, নইলে এত বড় ঝুঁকি নিতেন না।'

মাথা ঝাঁকাল শংকরলালজী। দুই হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে সরাসরি চাইল জটিলেশ্বরের চোখে। 'অনিলা আর দেশাই সাহায্য না করলে এই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব হত না আমার পক্ষে। তোমার কাছেই এসেছি আমি, জটিল। আমার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। ধুলোর সাথে মিশে যাব আমি যদি তোমার সাহায্য না পাই।'

জটিলেশ্বর দেখল, ধক ধক করে জ্বলছে শংকরজীর চোখজোড়া। বেকায়দায় পড়ে আজ ওর কাছে হাত পাততে হচ্ছে বলে মরমে মরে যাচ্ছে লোকটা। নড়েচড়ে বসল সে চেয়ারে। মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আগেই বলেছি আমি, শংকরজী। মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারণ করবেন। আমার সাধ্যমত সবই করব আমি আপনার জন্যে।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন।

'সত্যিই বলছ?'

'সত্যিই বলছি।'

মস্তবড় একটা শ্বাস ছাড়ল শংকরলালজী।

'আমি জানতাম। অনিলাকেও বলেছি, একমাত্র তোমার উপর ভরসা করা যায় এখন। তোমার সাথে আমার কতদিনের বন্ধুত্ব সেটা শুনে ও-ই সব ব্যবস্থা করেছে আমার এখানে আসার।' কিছুক্ষণ বিরতির পর বলল, 'হাতে সময় খুব কম। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব, তারপর কথা বলা যাবে। তুমি ওই চেয়ারেই বসো, দেখাচ্ছি আমি।'

উঠে দাঁড়াল শংকরজী। দেয়ালের পাশে রাখা ছোট্ট সুটকেস থেকে বের করল একটা এইট মিলিমিটার ফিল্ম প্রোজেক্টর। নীল প্লাস্টিক মোড়া কাভারটা সরিয়ে একটা স্পুল ফিট করল যন্ত্রটায়, তারপর সামনের দেয়ালের দিকে মুখ করে রাখল ওটা ড্রেসিং টেবিলের উপর। একটা সকেটের মধ্যে প্লাগটা ঢুকিয়ে দিয়ে জানালার পুরু ধূলি-মলিন পর্দাগুলো টেনে আঁধার করে দিল ঘরটা।

নিরতিশয় অস্বস্তির সাথে লক্ষ করল জটিলেশ্বর এইসব কার্যকলাপ। কোন কথা বলল না।

সুইচ অন করে সামনে সাদা দেয়ালের উপর ফোকাসটা ঠিক করল শংকরজী দ্রুতহাতে, তারপর বলল, 'আমি দেখেছি। আর দেখতে চাই না আমি এসব।' খাটের দিকে এগোল। প্রোজেক্টরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেয়ালের ছবিটা কেটে গেল মুহূর্তের জন্যে। বিছানার ধারে বসে দুই হাতে গাল আর কপালের

দুইপাশ চেপে ধরে চেয়ে রইল রোঁয়া-ওঠা কার্পেটের দিকে।

ছবিটা দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঁচকে গেল জটিলেশ্বরের। নীলছবি। নোংরা, অশ্লীল। সেক্সের ব্যাপারে সে সবসময়ই অত্যন্ত রক্ষণশীল। আশ্চর্য একটা ঘৃণা আছে তার মেয়েদের প্রতি, তাই চিরকুমার রয়ে গেছে সে। চোখের সামনে একটা লোকের সাথে একটা মেয়ে এমন সব কাণ্ড করতে শুরু করল যে ঘৃণায় রি-রি করে উঠল তার সর্বাঙ্গ। পুরুষটা পরিচয় গোপন করার জন্য। একটা কালো মুখোশ পরেছে মুখে। মেয়েটার কোথাও কোন আবরণ নেই। অত্যন্ত সুন্দরী, বাইশ-তেইশ বছর বয়স, আকর্ষণীয় ফিগার, কিন্তু গায়ের রং পুরুষ লোকটার চেয়ে কিছুটা ঘন। এই ধরনের ছবির কথা শুনেছে জটিলেশ্বর, কোনদিন দেখেনি। কামাতুর, উন্মত্ত নারী-পুরুষ কতটা নির্লজ্জ, জঘন্য ব্যবহার করতে পারে, পশুর চেয়েও কতটা নিচে নেমে যেতে পারে, চোখের সামনে তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। এই ভয়ংকর, অসুন্দর কাজের ছবিও তোলে আবার মানুষ! সে-ছবি দেখে আনন্দও পায়! মিনিট পাঁচেক পর রিলটা শেষ হয়ে যেতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জটিল রায়, কিন্তু সেই সাথে নিজের ভিতর চাপা রাগও অনুভব করল। মাথা খারাপ হয়েছে নাকি লোকটার? ওকে এসব দেখাবার মানে কি?

ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে, ঘুরছে স্পূলটা দ্রুতবেগে, ফিল্মের শেষ মাথা বাড়ি খাচ্ছে প্রোজেক্টরের গায়ে। উঠে গিয়ে সুইচ অফ করে দিল শংকরলালজী। জানালার ধারে গিয়ে সরিয়ে দিল পর্দাগুলো। পিছন ফিরে চাইল জটিলেশ্বরের দিকে।

অন্যদিকে চেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রয়েছে জটিল রায়। চমকে উঠল শংকরজীর কথা শুনে।

কাঁপা গলায় বলল শংকরজী, 'ছবিতে যে মেয়েটাকে দেখলে, ওটা আমার মেয়ে।'

দুই

সমরজিতের তৎপরতায় জটিলেশ্বর ঠিক যতটা খুশি হয়েছে, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ইউরোপ ডিভিশনের বর্তমান চিফ ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারও ঠিক ততটাই খুশি হয়ে উঠল তার এজেন্ট মোহাম্মদ ইসমাইলের উপর—কারণ সে-ও চিনতে পেরেছে শংকরলালজীকে।

মোটাসোটা, আহার-প্রিয়, বয়স্ক মোহাম্মদ ইসমাইলকে অর্লি এয়ারপোর্টের চার্জে রাখা হয়েছে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ। তারিক আখতার এসে তাকে অন্য কোথাও বদলি করেনি তার প্রধান কারণ লোকটা ভীতু আর অলস হিসেবে

সুপরিচিত। তাকে কাজে বহাল রাখবার একমাত্র কারণ হচ্ছে লোকটার অস্বাভাবিক স্মরণশক্তি। ফটোগ্রাফের মত। একবার কিছু দেখলে ভোলে না সে কোনদিন, স্থায়ী ছাপ রয়ে যায় মনের পর্দায়। বহু বছর আগের দেখা যে কোন লোককে চিনতে পারে সে অনায়াসে। শুধু চেহারাই নয়, হাবভাব, এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত মনে রাখতে পারে সে বিনা চেষ্টাতেই।

বছর সাতেক আগে নয়াদিল্লীতে একবার সে দেখেছিল শংকরজীকে। তার মনের ক্যামেরায় ছবি উঠে গিয়েছিল সেইদিনই—চেহারা, চলতে গিয়ে সামান্য একটু খোঁড়ান, কথা বলবার সময় একটু ঘাড় কাৎ করা, গলার স্বর, সব রেকর্ড করে নিয়েছিল সে সেইদিন। সাত বছর পর আজ একনজর দেখেই চিনে ফেলল সে শংকরলালজীকে। দ্রুত পায়ে চলেছে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে। ঘন গোঁফ বা গাঢ় সানগ্লাস ধোঁকা দিতে পারল না ওকে একবিন্দুও।

মুহূর্তে চিনল ইসমাইল শংকরলালজীকে। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী! সমরজিতের মত দ্বিধাগ্রস্ত হলো না সে, এমবার্কেশন কার্ড দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না, দ্রুতপায়ে অনুসরণ করল লোকটাকে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো শেষ গাড়ির ড্রাইভারের সাথে যখন শংকরজী কথা বলছে তখন ভুল করে গাড়িতে উঠে পড়বার ছলে একেবারে কাছে চলে এল ইসমাইল। পরিষ্কার শুনতে পেল সে, 'রিউ মেসলের পার্ক হোটেলে চলো।'

গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল মোহাম্মদ ইসমাইল, এমনি সময়ে বাধা দিল শংকরলালজী।

'এটা আমি নিয়েছি, মশিয়ে।'

এক পা পিছিয়ে গেল ইসমাইল, হতাশ ভঙ্গিতে বলল, 'মাপ করবেন।'

ট্যাক্সিটা রওনা হয়ে যেতেই ছুটল সে টেলিফোন বুদের দিকে। হাঁপ ধরে গেল তার পঁচিশ গজ গিয়েই। প্রচুর পরিমাণে বিয়ার আর গরুর মাংসের কল্যাণে এতই প্রকাণ্ড ভুঁড়ি গজিয়েছে যে আঙুল দিয়ে নিজের নাভি ছুঁতে পারে না। হাঁসফাঁস করতে করতে পৌঁছল সে টেলিফোন কিওস্কের সামনে, আধমিনিট দম নিয়ে ডায়াল করল ব্রিগেডিয়ারের নাম্বারে।

রিপোর্ট শুনেই চমকে উঠল তারিক আখতার। সবুজ দুই চোখ ছোট হয়ে গেল আকারে। মোহাম্মদ ইসমাইল ঠিক দেখেছে কি ভুল দেখেছে সেসব নিয়ে সময় ব্যয় করল না সে, সিদ্ধান্ত নিল মুহূর্তে। পরিষ্কার উর্দুতে নির্দেশ দিল, 'পার্ক হোটেলে চলে যাও এক্ষুণি। হানিফকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি ওখানে। একটা রেডিও কার নিয়ে যাবে ও। শংকরলালজীর প্রতিটা গতিবিধির রিপোর্ট চাই আমি। বুঝতে পেরেছ? যাও, এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও তুমি। ওয়েল ডান।'

তোবড়ানো একখানা রেনোয়া পার্ক করা রয়েছে এয়ারপোর্টের কার পার্কে। প্রায় দৌড়ের মত ছুটল মোহাম্মদ ইসমাইল সেটার দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিশাল শরীরটা কোনমতে স্টিয়ারিং হুইলের নিচে ঠেসে ঢুকাল সে। সমরজিৎ যখন নীতিশ

গুহের সাথে কথা বলছে ঠিক সেই সময় রওনা হয়ে গেল রেনোয়া।

'ওয়েল ডান' শব্দ দুটো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত তৃপ্তি দিচ্ছে ইসমাইলের কানকে। বহু বছর না পেয়ে পেয়ে ভুলেই গিয়েছিল সে প্রশংসা কাকে বলে। ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের মত লোকের মুখ থেকে শব্দ দুটো বেরিয়েছে ভাবতেই আনন্দের শিহরণ বোধ করছে সে সারা শরীরে। প্রতিধ্বনির মত বার বার শুনতে পাচ্ছে যেন সে শব্দ দুটো। হাসিমুখে ছুটল সে অটোরুট ধরে প্যারিসের দিকে।

ছবিতে যে মেয়েটাকে দেখলে, ওটা আমার মেয়ে।

ক্ষণিকের জন্য আবার একবার ভাবল জটিলেশ্বর আজকাল কানে কম শুনছে কিনা, কিন্তু শংকরলালজীর ধসে পড়া ভঙ্গি আর চোখের করুণ দৃষ্টি দেখে বুঝল ঠিকই শুনেছে সে—মেয়েটা শংকরজীরই মেয়ে।

দ্রুতবেগে চালু হয়ে গেল জটিল রায়ের উর্বর মস্তিষ্ক। স্মরণ করতে পারল, শুনেছিল শংকরলালজীর আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে, সুইটজারল্যাণ্ডের এক স্কুলে পড়াশুনা করছে। কবেকার কথা সেটা? তা বছর ছয়েক আগের তো বটেই। তারপর এই মেয়ের ব্যাপারে কোন কথা শোনেনি সে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনিলাকে বিয়ে করে পারিবারিক অশান্তি এড়াবার জন্যে বিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল শংকরজী তার একমাত্র মেয়ের। দ্বিতীয় বিয়েটা রাজনৈতিক বিয়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছে ওরা যুক্তি করে, ছেলে পিলে নেই। নীলছবির মেয়েটার চেহারা স্মরণ করতেই এবার পরিষ্কার চিনতে পারল ও, একেবারে মায়ের চেহারা পেয়েছে মেয়েটা—তেমনি পাতলা-সাতলা, ডিম্বাকৃতি মুখ, পটলচেরা চোখ।

'দুঃখজনক ব্যাপার,' বলল জটিলেশ্বর। এর বেশি কিছু এল না মুখ দিয়ে। কি বলা যায় ভেবে পেল না।

'হ্যাঁ।' আবার খাটের ধারে বসল শংকরলালজী। 'সবটা ব্যাপার শোনা দরকার তোমার।' আবার মোনাজাতের ভঙ্গিতে মুখ মুছল দুই হাতে। 'দেখ, জটিল, সবটা দোষ আমি শিখার ওপর চাপাতে চাই না, দোষ আমাদেরও আছে। কতটা, সেটা তুমি বুঝতে পারবে সব শুনলেই। ওর মা মারা যাওয়ার পর দুটো বছর নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। কিন্তু যেই আমি আবার বিয়ে করলাম, ওমনি যেন ভূত চেপে গেল ওর মাথায়। কিছুতেই বুঝতে চাইল না বিয়ে করাটা আমার জন্যে কতখানি অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্যারিয়ার তৈরি করতে হলে পাশাপাশি দু'জনকে চাই, একার চেষ্টায় ওপরে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না ও সৎমাকে। ফলে অনিলাও ওকে কিছুতেই আপন করে নিতে পারল না। ঠাণ্ডা লড়াই চলল এক বছর। শিখা যখন দেখল এই লড়াইয়ে ওর জিতবার কোনরকম কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন খেপে গিয়ে একেবারে বখে গেল ও। লম্বা লম্বা চুলওয়ালা; টেডি প্যান্ট পরা ছোকরা ডেকে এনে চিড়িয়াখানা

বানিয়ে তুলল বাড়িটাকে। শুধু দিনেই নয়, মাঝরাত পর্যন্ত চলল হৈ-চৈ, পপ্ মিউজিক, আর উন্মাদের নাচ। যেন সারা পৃথিবী আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চায় ও, কারও তোয়াক্কা রাখে না, সবার সবকিছুর বিরুদ্ধে ওর বিদ্রোহ। বাড়িতে আর কাজকর্মের পরিবেশ থাকল না। শাসন করতে চেষ্টা করলাম. আরও বেয়াড়া হয়ে গেল। আধনা-আধনা কথায় তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে সে অনিলার সাথে। ব্যাপারটা যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন সুইটজারল্যান্ডের একটা টপক্লাস স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম ওকে। ওরা কথা দিয়েছিল, বিনয়, ভদ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহনশীলতা, সব শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবে ওকে, সত্যিকার সুশিক্ষিতা এক রমণী বানিয়ে তুলে দেবে আমার হাতে।' হাত দুটো পরীক্ষা করল শংকরলালজী, মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। 'ভগবান! কয়টা বছর কী শান্তিতেই না ছিলাম! চার বছর দেখা হয়নি ওর সাথে, কোন ছুটিতে একবারও বাড়ি আসেনি ও, কিন্তু ওর অভাব বোধ করিনি আমরা কোনদিন। তাছাড়া ব্যস্তও ছিলাম। আমিও, অনিলাও। প্রাণপাত করে ভবিষ্যৎ তৈরি করছি আমরা দুজন তখন। ধাপের পর ধাপ উঠছি ওপরে। উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত থাকল শিখা স্কুলে, তারপর জানাল আর্কিটেকচার পড়তে চায়। খুশি হয়েই মত দিলাম আমরা, একজন বুড়ো প্রফেসার নিয়োগ করে দিলাম, ছুটির সময় তার সাথে জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী ঘুরে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে। দু'বছর ঠিকমতোই পড়াশোনা করল, তারপর বছরখানেক আগে হঠাৎ চিঠি পেলাম প্রফেসারের—সকালে উঠে দেখে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে শিখা। সেই থেকে কোন খোঁজ নেই মেয়ের। বেঁচে আছে . জানতাম—তাই খুব একটা খোঁজাখুঁজি আমরা করিওনি। বরং ভেবেছিলাম, কোন একটা মনের মানুষ জুটিয়ে নিয়ে যদি বিয়ে-টিয়ে করে, কিংবা উড়ে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, যাক। শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য ছিল, চেষ্টার ক্রটি করিনি। নিজের পায়ে নিজেই যে কুড়োল মারে তার যা হয় হোক। আসলে ওর পেছনে ব্যয় করার মত সময় আমাদের হাতে ছিল না। জটিল এক রাজনৈতিক খেলায় হাত দিয়ে জড়িয়ে পড়েছি আমরা তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে।'

জটিলেশ্বর চুপচাপ শুনছে কথা, কিন্তু ওর চিন্তা বইছে অন্য এক খাতে। শংকরলালজীর মেয়ে! নগ্ন অভিনয় করেছে নীল-ছবিতে! শিরশিরে এক ঠাণ্ডা স্রোত অনুভব করছে জটিল রায় মেরুদণ্ডের ভিতর। এই ছবি যদি প্রতিপক্ষের হাতে পড়ে তাহলে সামাজিক, রাজনৈতিক সব ক্যারিয়ার খতম্ হয়ে যাবে লোকটার। একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

কথা বলেই চলেছে শংকরলালজী। 'কিছুটা দোষ আমার নেই, তা বলি না। শাসন করেছি ঠিকই, কিন্তু শিখার আসলে যা দরকার ছিল, বাপের আদর, স্নেহ, ভালবাসা, নিরাপত্তাবোধ—সেসব কিছুই দিতে পারিনি আমি সময়ের অভাবে। আমাকে স্বার্থপর বলতে পারো, কিন্তু আমার জীবনযাত্রাই এমন যে কিশোরী এক মেয়ের মন রেখে, ওর সাথে খাপ খাইয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওকে ভুলতে চেয়েছিলাম আমি,' মস্তবড় একটা শ্বাস ফেলল, 'তার পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই!'

থামল শংকরজী, সোজা চাইল জটিলেশ্বরের চোখের দিকে। কিছু একটা বলা উচিত মনে করে জটিল রায় বলল, 'বুঝতে পারছি। বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার।'

'তুমি তাই বলছ আমার সাথে বন্ধুত্ব আছে বলে। কিন্তু আর সবাই বলবে, যেমন কর্ম তেমনি ফল পেয়েছি আমি। পিতার কর্তব্য পালন না করে অবহেলা করেছি, এখন পড়েছি ঠিক জাঁতাকলে।' পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল শংকরলালজী। 'পড়ে দেখ চিঠিটা।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ খুলল জটিলেশ্বর। কয়েকটা লাইন রয়েছে ইংরেজিতে টাইপ করা। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্ধ, অবিবেচক পিতাকে কুকুর জ্ঞান করি। কুকুরের প্রয়োজন বেত্রাঘাত। এইরকম আরও তিনটি ছবি রয়েছে আমাদের হাতে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ না করলে একে একে সবগুলোই পাঠানো হবে বিরোধী দলের কাছে। কাজেই, বিদায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভণ্ড দেশপ্রেমিকের সেবা ছাড়াও চলবে ভারত-মাতার।

—ইতি,
প্রাণাধিক শিখা।

চিঠিটা পরীক্ষা করল জটিলেশ্বর, আলোর সামনে তুলে ধরে কাগজের জলছাপ লক্ষ করল, তারপর হাত বাড়াল। 'খামটা কোথায়?'

'এই যে, দিচ্ছি,' উঠে গিয়ে ছোট্ট সুটকেসটা নিয়ে এল শংকরলালজী, দুই হাঁটুর উপর রেখে খুলল সেটা। 'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে পাঠানো হয়েছে ফিল্ম আর চিঠি।' একটা শক্ত, মোটা কাগজের এনভেলাপ বের করে এগিয়ে দিল।

এনভেলাপের উপর টাইপ করা রয়েছে: শ্রীযুক্ত শংকরলালজী, ১৩৬ জেল রোড, নয়াদিল্লী। প্রযত্নে—ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, প্যারিস। দয়া করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। ব্যক্তিগত ও জরুরী।

বোঝা গেল, এটা পাঠানো হয়েছে প্যারিস থেকে। ডাকঘরের সীলমোহর নেই, হাতে হাতে পৌঁছেচে খামটা যথাস্থানে। উল্টেপাল্টে দেখল জটিলেশ্বর। মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না। চুপচাপ বসে রইল ওরা দুই মিনিট। তারপর মুখ খুলল শংকরলালজী।

'কেন এখানে এসেছি বুঝতে পারছ, জটিল? এটা তোমার এলাকা। এই প্যারিস থেকেই কেউ চেষ্টা করছে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে, চাইছে যেন আমি আমার ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে সরে দাঁড়াই রাজনীতি থেকে। এদের কোন পলিটিকাল মোটিভও থাকতে পারে, আপাতত ব্যক্তিগত আক্রোশটাই বড় করে দেখছি আমি। বাপের প্রতি অবহেলিত মেয়ের আক্রোশ। অনিলার সাথে আলাপ করেছি আমি এ নিয়ে। ভেঙে পড়েছে ও একেবারে। আমরা দুজনে মিলে অনেক পরিশ্রম করে গড়েছি ক্যারিয়ার। এখন যদি ইলেকশন বাদ দিতে হয়…অনিলা অবশ্য

বলছে সব বাদ দিয়ে দিতে, আর কোন উপায় নেই, কিন্তু তোমার কথা মনে হলো তখন আমার। সরে দাঁড়াবার আগে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি এসেছি তোমার কাছে। দেশাইয়ের সাথে দেখা করলাম নার্সিংহোমে গিয়ে, ওকে বললাম ওর পাসপোর্টটা দরকার আমার, বরাবরের মতই বিনা প্রশ্নে পাসপোর্টটা আমার হাতে তুলে দিল ও, যদিও জানে ধরা পড়লে মহা কেলেংকারিতে জড়িয়ে যাবে ও-ও। যাই হোক, এসে তো পড়েছি, এখন তুমি যদি কোন সমাধান বের করতে না পারো, ধুলোয় মিশে যাবে আমার সবকিছু, সব ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে আমার। কি মনে করো? তোমার দ্বারা কোন সাহায্য আশা করা যায়?' জটিলেশ্বরের মুখের দিকে চাইল শংকরলালজী। 'যদি তুমি…'

জটিল রায়ের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে চট করে থেমে গেল শংকরজী। বুঝতে পারল, গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে জটিলেশ্বর, এখন কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল একটা। একদৃষ্টে খাটের পায়া দেখল জটিল রায় ঝাড়া তিনটে মিনিট, তারপর নড়ে উঠল।

'কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার মেয়ের, আর তার সঙ্গী-সাথীদের খুঁজে বের করতে পারি আমি, চেষ্টা করলে বাকি তিনটে ফিল্মও উদ্ধার করা অসম্ভব হবে না। যোগ্য লোক রয়েছে আমার অধীনে। ওদেরকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বুদ্ধিও রয়েছে আমার ঘটে। এটাই আমার চাকরি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের কারও কোন সাহায্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জটিলেশ্বর। স্থিরদৃষ্টিতে চাইল শংকরলালজীর চোখের দিকে। 'আপনার সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে। যেজন্যে সাহায্য চাই বা না চাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আপনি আমার বিপদের সময়, সাহায্য করেছেন অযাচিত ভাবে। আপনার বিপদের সময়, আমার সাধ্যমত সবকিছু করতে আমি প্রস্তুত, আপনিও তা জানেন। কিন্তু, শংকরজী, আপনার শত্রু আছে। দেশের ভিতরে, বাইরে, সবখানে। আমার অফিসেও এমন কিছু লোক রয়েছে যারা চায় না আপনি ক্ষমতায় আসেন। আপনার নেতৃত্ব, আপনার পলিসি, আপনার মতবাদ পছন্দ করে না, এমন লোকের অভাব নেই। এদের যদি আমি কাজে লাগাই তা হলে ব্যাপারটা লিক-আউট হয়ে যাবে; এদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ খবর ছড়াবে যে আপনার মেয়ে ব্লু ফিল্মে অভিনয় করেছে। এটা ঠেকাবার উপায় নেই। কিছু মনে করবেন না, সময় নেই বলে সোজা-সাপ্টা কর্কশ ভাবেই বলছি সব—আপনাকে সাহায্যের জন্যে আমার অধীনস্থ সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার করতে পারব না আমি। যে মুহূর্তে ওদের কাউকে এই কাজে লাগাব, সাথে সাথেই পুরো ব্যাপারটা অফিশিয়াল হয়ে যাবে। কি সিসটেমে আমাদের কাজ চলে সেটা তো জানাই আছে আপনার। প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে একটা করে ফাইল খুলতে হয় আমাকে, সেই ফাইলের এক কপি পাঠাতে হয় নয়াদিল্লীতে। এই ব্যাপারে ফাইল ওপেন করবার কথা চিন্তাও করা যায় না। কাজেই আমার লোক লাগাতে পারব না আমি এই কাজে।'

আর একবার দুই হাতে মুখ মুছল শংকরলালজী, তারপর সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বিশাল হাতে চাপ দিল জটিল রায়ের কাঁধে। 'ঠিক আছে, জটিল। অনিলাও এই একই কথা বলেছিল আমাকে। তুমি যা বললে সেটা যে কতটা সত্যি আমি জানি। তবু আবছা ভাবে ভেবে নিয়েছিলাম, আসলে মনকে চোখ ঠারা আর কি, হয়তো তোমার কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যেতেও পারে। অবশ্য খুব একটা ভরসা করিনি বলে ততটা হতাশও হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, ফেঁসে গেছি। উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। চেষ্টা করে দেখা গেল...'

'আমি সাহায্য করব না, তা কিন্তু বলিনি আমি আপনাকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জটিলেশ্বর। 'আমি বলছি, এই কাজে আমার লোকজনের সাহায্য নেয়া যাবে না।'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল শংকরলালজী।

'তার মানে তুমি সাহায্য করছ?'

'হ্যাঁ। চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু অনেক টাকা লাগতে পারে।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ডান হাতটা নাড়ল শংকরলালজী।

'আমার কাছে টাকা কি? খরচের ব্যাপারে কোন পরোয়া করি না। কিভাবে সাহায্য করবে ভাবছ?'

'মাসুদ রানাকে গাঁথার চেষ্টা করব বড়শিতে। টোপ যদি একবার গেলাতে পারি, তাহলে আর কোন চিন্তা নেই—কার্যোদ্ধার হবেই, সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।'

'মাসুদ রানা? কে সে?'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক ভয়ানক দুর্ধর্ষ এজেন্ট। কাজটা যদি সে হাতে নেয়...'

'কিন্তু...' ছটফট করে উঠল শংকরলালজী। 'কিন্তু এই ব্যাপারে আর কাউকে, মানে অন্যদেশের লোককে জড়ানো কি ঠিক হবে? ওর কাছ থেকে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, তাছাড়া ও নিজেই যে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইবে না তার ঠিক আছে?'

'এ ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। কারও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মাসুদ রানা যে তাকে ব্ল্যাকমেইল করবে না, সেটা আমি হলপ করে বলতে পারি। আসল সমস্যা কাজটা ওর হাতে গছানো।'

'ঠিকই তো। বিদেশী একজন এজেন্ট এই ধরনের কাজ হাতে নেবে কেন? তাছাড়া ওর পলিটিকাল ইনক্লিনেশন কোন্ দিকে সেটা না জেনে...'

'সেটা জানা আছে আমার। আপনাকে দুচোখে দেখতে পারে না ও। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। এই মুহূর্তে ওর টাকার অত্যন্ত দরকার। মোটাসোটা একটা অংক ওর নাকের সামনে তুলে ধরলে টপ করে টোপ গিলে ফেলতে পারে।'

'লোভী বা অভাবী লোক কিন্তু খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।'

'লোকটা লোভীও নয়, অভাবীও নয়। ওর টাকার দরকার দেশের প্রয়োজনে।

ইন্টারপোলের নারকোটিক ডিভিশনের চিফকে ভজিয়ে একটা কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছিল ছেলেটা, এমনি সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে একশো টাকার নোট ডিমনিটাইজেশনের ব্যাপারে তারা কিছু অসুবিধের মধ্যে আছে, ফরেন কারেনসি দিতে পারবে না এখন। মাথার চুল ছিঁড়ছে এখন ছেলেটা, হাত কামড়ে খেয়ে ফেলবার জোগাড় করছে। সাত দিনের মধ্যে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করতে না পারলে কয়েক মাসের জন্যে পিছিয়ে যাবে ওর কাজ। আধমরা হয়ে গেছে একেবারে, ওর নাকের সামনে পঞ্চাশ হাজার ডলার ধরলে জ্যান্ত হয়ে উঠবে, আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু যোগ্যতা?' সন্দেহ যাচ্ছে না শংকরলালজীর। 'বাংলাদেশের এজেন্ট···পারবে ও এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে?'

'কী যে বলেন!' হাসল জটিলেশ্বর। 'ও যে কাজ পারবে না, সেটা পারবে এমন এজেন্ট সারা দুনিয়ায় আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর সেরা দশজন এজেন্টের মধ্যে ওকে ধরা হয়। দুর্দান্ত ছেলে। যেমন সাহস, তেমনি শেয়ালের মত চতুর। যেমন এক্সপার্ট কারাতে ফাইটার, তেমনি অব্যর্থ হাত ওর পিস্তলে। আমার সাথে অবশ্য খুব ভাল সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওর সততায় কোনরকম সন্দেহ পোষণ করি না আমি। যে-কোন কাজ দিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় ওর ওপর। আমি শিওর না হলে ওর নামটা মুখ দিয়ে উচ্চারণও করতাম না।'

একটু ইতস্তত করল শংকরলালজী, তারপর বলল, 'আর কোন বিকল্প নেই যখন, করো তুমি যা ভাল বোঝ তাই। টাকা আমার কাছে খোলামকুচি, তুমি জানো। পঞ্চাশ হাজার ডলার কিছুই না। যদি ওকে নির্ভরযোগ্য মনে করো, গো অ্যাহেড। তোমার কি মনে হয়, নেবে ও কাজটা?'

'সেটা ওর মুডের ওপর নির্ভর করে। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। ছেলেটা দেশের জন্যে পারে না এমন কাজ নেই। যদি ওকে বোঝাতে পারি যে টাকাটা ওর দরকার, তাহলেই সমাধান হয়ে যাবে সব সমস্যার।'

'অলরাইট। খানিক বাদেই অর্লি এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাব আমি। প্যারিস ছাড়ার আগেই হ্যাঁ বা না একটা কিছু খবর দিতে পারবে না?'

'পারব। আশা করি। উঠি আমি এখন।'

পার্ক হোটেলের উল্টোদিকে একটা কাফের সামনে খোলা চত্বরে হানিফকে পেল মোহাম্মদ ইসমাইল। কফি খাচ্ছে একটা টেবিলের ওপাশে বসে। বিশাল ধড়টা সাবধানে নামাল ইসমাইল চেয়ারের উপর। ঘর্মাক্ত কপাল মুছল নোংরা রুমাল দিয়ে।

'কিছু দেখতে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে হানিফকে।

'আপনার সেই লোক এসে পৌচেছে মিনিট দশেক হলো,' ইসমাইলের দিকে না চেয়ে উত্তর দিল হানিফ। 'এখন ভেতরেই রয়েছে।'

'আর কিছুই দেখনি?'

'না।'

ভ্রূ কুঁচকে হানিফের দিকে চাইল মোহাম্মদ ইসমাইল। দু'চোখে দেখতে পারে না সে এই ছোঁড়াটাকে। ও জানে হানিফও দেখতে পারে না ওকে, সবসময় একটা টিটকারীর ভাব প্রকাশ পায় ওর ব্যবহারে। ভাগ্যিস ছোকরা ওর জুনিয়র, যা বলে রেখে ঢেকে বলতে হয়, নইলে এ-সব হাসি মস্করা সহ্য করা মুশকিল হয়ে যেত ওর পক্ষে।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হানিফের। অতিরিক্ত চিকণ কোমর, অস্বাভাবিক মোটা বেল্ট, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। চেহারা-সুরত একেবারে খারাপ না, কিন্তু চোখ দুটো নিষ্ঠুর, শীতল। মানুষের কাছ থেকে চোখ দুটো আড়াল করবার জন্যে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাল্কা সবুজ রঙের সানগ্লাস পরে থাকে সে। পরিচিত সবাই জানে, এর সাথে কোন গোলমালে জড়িয়ে পড়া মোটেই মঙ্গলজনক নয়; ছোকরা শুধু ভয়ংকর মারপিটবাজই নয়, অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। বাপের টাকায় পড়তে এসেছিল, গোল্লায় গেছে খবর পেয়ে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ওর বাবা, সেই থেকে ভ্যাগাবণ্ড। প্যারিসের এহেন খারাপ জায়গা নেই যেখানে যাতায়াত নেই ওর। তারিক আখতারের সহযোগী সিকান্দার বিল্লার চোখে পড়ে যাওয়ায় চাকরি পেয়েছে সে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ওয়াচার-ইনফরমার হিসেবে। বেতন তেমন সুবিধেজনক কিছু না হলেও মোটামুটি বেশ চলে যায় ওর।

কাফে থেকে একজন ওয়েটার বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ইসমাইলের সামনে।

'কি দেব মশিয়ে?'

বিয়ার বলতে গিয়েও সামলে নিল মোহাম্মদ ইসমাইল। ডিউটির সময় বিয়ার খেয়েছে এই কথা যদি হানিফ লাগিয়ে দেয় তাহলে বিপদ হবে। নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'কফি।'

হো হো করে হেসে উঠল হানিফ। ইশারায় থামতে বলল ওয়েটারকে।

'মানুষ চেন না? খামোকা কষ্ট দিচ্ছ কেন বুড়ো মানুষটাকে। কফিটফি লাগবে না, বিয়ার দাও। কোটের গায়ে তরকারির ঝোলের দাগ দেখেও বুঝতে পারো না কি পদের মানুষ?'

মনে মনে খুশিই হলো ইসমাইল ছোকরার উপর। কোটের গায়ে ঝোলের দাগটা দেখল ঘাড় বাঁকিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ওয়েটারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? যাও। সাহেব যা বলছেন তাই দাও। পয়সাটা উনিই দেবেন।'

বেয়ারা চলে গেল। খরচটা ওর ঘাড়ে ফেলবার কৌশল দেখে হানিফ হাসল মুচকে মুচকে। বলল, 'কোটটা ধোয়ার খরচটাও কি আমার দিতে হবে?'

'না।' বলল ইসমাইল। 'ইচ্ছে করলে নতুন একটা কিনে দিতে পারো।'

'সত্যিই। কাপড়টা মশারীর মত হয়ে এসেছে। নতুন একটা কেনেন না

কেন?'

'তুমি চুলগুলো একটু ছাঁট না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ইসমাইল। 'দেখতে লাগে ঠিক লেসবিয়ান মেয়েমানুষের মত।'

হো হো করে হেসে উঠল হানিফ।

'দারুণ বলেছেন!' হাসি থামিয়ে বলল। 'লেসবিয়ান! হাহ্-হা! বেড়ে বলেছেন। আসলে যতটা বুদ্ধু দেখায় আপনাকে, ততটা...'

'শাটাপ!' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল মোহাম্মদ ইসমাইল। 'মুখ সামলে কথা বলো, ছোকরা।'

এই ধমকে কিছুই মনে করল না হানিফ। মুচকে মুচকে হাসতেই থাকল। 'বেড়ে বলেছেন। লেসবিয়ান! জিনাকে বলতে হবে কথাটা...হেসে খুন হয়ে যাবে!'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মোহাম্মদ ইসমাইল জটিলেশ্বরকে দেখে। সামান্য একটু ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল জটিল রায় পার্ক হোটেলের কাঁচের দরজা ঠেলে।

এই হঠাৎ চেহারার পরিবর্তন চোখ এড়াল না হানিফের। চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'চেনা কেউ?'

'চুপ!' উঠে পড়ল ইসমাইল। কাফের ভিতর একটা টেলিফোন বুদের মধ্যে ঢুকে ডায়াল করল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের নাম্বারে।

'তারিক বলছি,' গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল।

'জটিলেশ্বর রায় এসে ঢুকল পার্ক হোটেলে।' উর্দুতে বলল ইসমাইল।

'জটিল?'

'ইয়েস, স্যার।'

তিন সেকেণ্ড বিরতি, তারপর প্রশ্ন এল, 'হানিফ রয়েছে তোমার সাথে?'

'ইয়েস, স্যার।'

এবার পনেরো সেকেণ্ড বিরতি। পরিষ্কার বুঝতে পারল তারিক আখতার, জরুরী কোন গোপন বৈঠকে মিলিত হচ্ছে শংকরলালজী জটিলেশ্বর রায়ের সাথে। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে কোনরকম ভুল যেন না হয়।

'আরও দুজনকে পাঠাচ্ছি আমি তোমাদের কাছে। জটিল বা শংকর কোন ব্যাটাই যেন তোমাদের চোখের আড়াল না হতে পারে। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যার।'

বেরিয়ে এল ইসমাইল, চেয়ারটা পরীক্ষা করে নিয়ে বসল সাবধানে। নোংরা রুমালে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বিয়ারের মগটা তুলে ঢকঢক করে শেষ করল অর্ধেকটা, তারপর চাইল হানিফের দিকে।

'এইমাত্র যে লোকটা হোটেলে ঢুকল, সে হচ্ছে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ইউরোপ ডিভিশনের চিফ জটিলেশ্বর রায়। ব্রিগেডিয়ার তারিক আরও দুজনকে পাঠাচ্ছে এখানে। হুকুম: জটিলেশ্বর বা শংকরলালজী কেউ যেন চোখের আড়াল না

হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল হানিফ। ঘাড়ের কাছে লম্বা চুল নেচে উঠল বার কয়েক।

বিশাল স্ফিংক্সের মত বসে আছে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার টেবিলের ওপাশে। সবুজ চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাটা ঘরে। স্থির থাকছে না কোথাও।

দরজার গায়ে দুটো টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল সিকান্দার বিল্লাহ। লম্বা, মেদহীন, পেটা শরীর। সরু লম্বাটে মুখ। মুখের ভাঁজে ভাঁজে নিষ্ঠুরতার ছাপ। মাথায় কদম ছাঁট—খাড়া হয়ে রয়েছে চুলগুলো। একনজরেই চেনা যায়, লোকটা খুনী। সবাই জানে সিকান্দার হচ্ছে তারিক আখতারের ডান হাত।

ঘরে ঢুকেই ব্রিগেডিয়ারের উত্তেজিত অবস্থা টের পেয়ে থমকে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ। সবুজ চোখ দুটো তার মুখে এসে স্থির হতেই হাসল। 'কি হয়েছে, বস্?' এগিয়ে এল কয়েক পা। 'এত উত্তেজিত কেন?'

'বসো, বিল্লাহ।' চোখের ইঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ার দেখাল ব্রিগেডিয়ার। টেলিফোনটা বেজে উঠতেই কানে তুলে নিল রিসিভার। 'তারিক বলছি।'

মোহাম্মদ ইসমাইল ফোন করেছে আবার।

'আমি ইসমাইল বলছি, স্যার। জটিল রায়কে ফলো করে আমি আর শুকুর পৌঁছেছি রিউ ডি সুইসেসে। পার্ক হোটেল থেকে বেরোবার সময় ওর হাতে একটা এইট মিলিমিটার কোডাক মুভি প্রোজেক্টর দেখা গেল। ঢোকার সময় হাতে ছিল না, কাজেই এটা পেয়েছে ও শংকরলালজীর কাছ থেকে। হোটেল লিরিকের সামনে নেমেছে জটিলেশ্বর ট্যাক্সি থেকে। ওর পিছন পিছন শুকুরও ঢুকেছিল হোটেলে। এলিভেটারে উঠে ওকে ছয় নম্বর বোতামটা টিপতে দেখে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সিক্সথ ফ্লোরের সাতশো বারো নম্বর কামরা ভাড়া নিয়েছে বাংলাদেশের...'

'মাসুদ রানা। আমি জানি। জটিলেশ্বর নেমে এলে ওর পিছু নেবে শুকুর। তুমি থেকে যাও ওখানে। তুমি ফলো করবে মাসুদ রানাকে। বুঝতে পেরেছ? ওরা কে কোথায় যায়, কি করে, সব খবর চাই আমি। তবে রানার ব্যাপারে খুব সাবধান! যেমন সতর্ক, তেমনি চতুর লোক ও—খবরদার, দেখে না ফেলে! নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনো না। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে এদিকে চাইতেই দেখল তারিক, একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে সিকান্দার বিল্লার ঠোঁটের কোণে, চোখ বুজে হাসছে মিটিমিটি। কথা শুরু করতে যাচ্ছিল ব্রিগেডিয়ার এমনি সময়ে আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

'তারিক বলছি।'

'অর্লি এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেল শংকরলালজী এইমাত্র।' ভেসে এল হানিফের কণ্ঠস্বর। 'শাহ আলী ফলো করছে ওকে, আমিও রওনা হয়ে যাচ্ছি এখুনি। কোন হুকুম আছে, স্যার? কিছু করতে হবে আমাদের?'

'না। জাস্ট ফলো হিম। এয়ারপোর্টে পৌঁছে আবার যোগাযোগ করো। আমি ইতিমধ্যে কি করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব। কিছু করতে হলে জানাব তখন।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোজা চাইল ব্রিগেডিয়ার সিকান্দার বিল্লার চোখের দিকে।

খুব সংক্ষেপে ছদ্মবেশে শংকরলালজীর প্যারিসে আসা, জটিলেশ্বরের সাথে গোপন বৈঠক, ইত্যাদি ব্যাপার জানাল সে বিল্লাকে। তারপর বলল, 'কিছু একটা চলছে ভেতর ভেতর। আমি এক্ষুণি হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করছি। তুমি এক কাজ করো। ইসমাইল, হানিফ, শুকুর, শাহ আলী এই ব্যাপারে কাজ করছে, ওদের চার্জ নাও তুমি এখন থেকে। যেমন করে হোক তোমার জানতে হবে কেন এসেছে শংকরলাল প্যারিসে, জটিলেশ্বরের কাছে ফিল্ম প্রোজেক্টর কেন, মাসুদ রানার সাথে কি সম্পর্ক ওদের। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, বস্।'

উঠে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ।

হেড অফিসের সাথে যোগাযোগের নির্দেশ দিল ব্রিগেডিয়ার ওয়্যারলেস সেকশনকে।

তিন

বেলা দশটার দিকে সামান্য একটু নড়ে উঠল মাসুদ রানা। চোখ না খুলেই আড়মোড়া ভেঙে প্রকাণ্ড এক হাই তুলল, কুকুরের কান্নার মত বিদঘুটে লম্বা ডাক ছাড়ল, তারপর বালিশটা আবার বুকে টেনে নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে টোকা পড়ল ঘরের দরজায়।

ঠিক আধঘণ্টা আগে আধ-ঘুমের মধ্যেই অর্ডার দিয়েছিল সে নাস্তার। এসে গেছে। বাম চোখের চার ভাগের একভাগ খুলে দেখল রানা টেবিলের উপর পরিপাটি করে নাস্তা সাজিয়ে রেখে বার কয়েক ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করে বেরিয়ে গেল ওয়েটারটা বাইরে।

আরও খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করবার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু পাঁউরুটি টোস্ট, স্ক্র্যাম্বল্‌ড এগ আর কফির গন্ধে শূন্য অন্তরটা কেমন যেন উথাল পাথাল শুরু করে দিল, বার দুই হাই তুলে এপাশ ওপাশ ফিরে উঠে পড়ল সে বিছানা ছেড়ে। আধো-ঘুম আধো-জাগরণ অবস্থায় বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। তিন মিনিটের মধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল জ্যান্ত মাসুদ রানা। সদ্যস্নাত। ক্লিন শেভড্। নীল ট্রাউজার আর একটা সোয়েট শার্ট পরা।

নাস্তা শেষ করে কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে কিং সাইজ একখানা সিগারেট ধরাল রানা। এখন? কি করবে সে এখন? কোন কাজ নেই হাতে।

কাজ না থাকলে ভয়ানক খারাপ লাগে ওর। স্টেলমেট অবস্থা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অথচ সেই অবস্থাতেই পড়েছে সে আজ হঠাৎ করে। সবকিছু গুছিয়ে তৈরি হয়েছিল সে বড় একটা কাজে নামার জন্যে, অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করে নিয়েছিল ইন্টারপোলের চ্যানেল, ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, এমনি সময় ঠিক যেন ছাত ধসে পড়েছে ওর মাথার উপর—বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ফরেন এক্সচেঞ্জ দিতে পারছি না এখন, দুঃখিত। কদিন অপেক্ষা করো। নদীর মাছ, আটকা পড়েছে যেন রানা দীঘিতে।

সব শুনে ইন্টারপোলের নারকোটিক ডিভিশনের চীফ ফিলিপ কার্টারেট ধার দিতে চেয়েছিল তার সারা জীবনের সঞ্চয় থেকে। রাজি হয়নি রানা। গ্র্যাণ্ডপ্রিক্স (গ্রাঁপ্রি) রেসিং টীম ব্লু অ্যাঞ্জেলের মালিক কোটিপতি মাইকেল হ্যামারের কাছে ধার চাইবার পরামর্শ দিয়েছিল, বলেছিল খুশি হয়ে রাজি হবে হ্যামার। কিন্তু রাজি হয়নি রানা। এতে ওর দেশের মুখ ছোট হবে। জুয়াতে আশ্চর্য ভাগ্য রানার—ইচ্ছে করলে প্যারিসের যে কোন নামজাদা ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে টাকা তুলে নিতে পারে সে, নিজের কোন ব্যাপার হলে তাই করত, কিন্তু দেশের জন্যে কোন শুভ কাজে জুয়ার টাকা ব্যবহার করতে বাধছে ওর। হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছিল সে, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে জিজ্ঞেস করেছিল কি করবে সে এখন, ফিরে আসবে কিনা—সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারেননি বৃদ্ধ। রানা জিজ্ঞেস করেছিল নিজে রোজগারের চেষ্টা করবে কিনা। জবাব এসেছিল, আত্মসম্মান নষ্ট না করে যদি পারো, করো; কিন্তু কিভাবে কি করবে সে ব্যাপারে কোনকিছুই মাথায় আসছে না আমার। আর একটা সপ্তাহ দেখ, তার মধ্যে কোন ব্যবস্থা না হলে ফিরে না এসেই বা উপায় কি।

জাহাজটা এসে যাবে দশ দিনের মধ্যেই। এই সুযোগটা হারালে সমস্ত কাজ পিছিয়ে যাবে ছয় মাসের জন্যে। অথচ অন্তত পক্ষে ত্রিশটা হাজার ডলার জোগাড় করতে হবে ওর কাজে হাত দিতে হলে, এর মধ্যে বিশ হাজার লাগবে আগামী কাল বা পরশুর মধ্যেই।

কিছু একটা উপায় খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল রানা কয়েক মিনিট। পরিষ্কার বুঝতে পারল, ও একটা অপদার্থ লোক, এমন কোন গুণ বা যোগ্যতা ওর মধ্যে নেই যার বিনিময়ে এই ঠেকার সময়ে সৎ পথে উপার্জন করে নিতে পারে ত্রিশ হাজার ডলার। হাল ছেড়ে দিয়ে গোটা তিনেক গালি দিল সে নিজেকে। সাথে সাথেই বেজে উঠল টেলিফোন রিসিভারটা। কানে তুলতেই ভেসে এল একটা চেনা-চেনা কণ্ঠস্বর।

'মাসুদ রানা?'

'বলছি।' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। 'আপনি কে বলছেন?'

'দশটা মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আসছি। বিশেষ দরকার।'

কথাটা বলেই রিসিভার ছেড়ে দিল লোকটা নিজের পরিচয় না দিয়ে। ব্যাপার কি? ভুরু জোড়া আরও একটু কুঞ্চিত হলো রানার। অপেক্ষা করতে বলছে। গলাটা চেনা চেনা, কিন্তু বোঝা গেল না কে। কে লোকটা? ওর কাছে কি দরকার? এই হোটেলেই যে মাসুদ রানা আছে সেটা জানল কি করে? পরিষ্কার বাংলা বলছে যখন…বাঙালী। কিন্তু কে হতে পারে?

ঠিক দশ মিনিট পর করিডরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা, শব্দটা থামল এসে ওর ঘরের দরজার সামনে। দরজায় টোকা পড়তেই উঠে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে। চুরুটের হালকা গন্ধ নাকে যেতেই চট করে চিনে ফেলল সে কণ্ঠস্বরটা। একটানে দরজাটা হাঁ করল রানা।

জটিলেশ্বর রায়। কয়েক সেকেণ্ড চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা দু'জন। তারপর জটিল রায়ের হাতের মুভি প্রোজেকটরের উপর এসে স্থির হলো রানার দৃষ্টি। হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। মাথা নাড়ল।

'আজকাল প্রোজেকটর বিক্রি করেন বুঝি? নিতাম, কিন্তু মাসের শেষ, টাকা নেই হাতে।'

'টাকা নেই জেনেই এসেছি,' হাসল জটিলেশ্বর। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' দরজা ছেড়ে পিছিয়ে গেল রানা। 'বিশেষ দরকার তো আর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা যায় না। আসুন। ওয়েলকাম।' ঘরে ঢুকে জটিল রায়কে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দেখে হাসল সে। 'দরকারটা শুধু বিশেষ নয়, গোপনীয়ও।'

দুটো সোফায় বসল দু'জন।

'হ্যাঁ,' বলল জটিলেশ্বর। 'একটা কাজ নিয়ে এসেছি আমি আপনার কাছে। শুধু বিশেষ বা গোপনীয়ই নয়, ব্যাপারটা বেসরকারী। অনেক টাকা পেতে পারেন আপনি বিনিময়ে।'

'তাই নাকি? কত টাকা?'

'এই ধরুন, পঞ্চাশ হাজার ডলার?' ছোট্ট করে শিস দিল রানা। জটিল রায় বুঝতে পারল এক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েকটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। বুঝতে পারল টোপটা আকর্ষণীয় বোধ হয়েছে ওর কাছে, কিন্তু সেই সাথে সন্দেহ আর সতর্কতা এসে যাচ্ছে জেলখানার প্রাচীরের মত। চট করে বলল, 'আপনার অ্যাসাইনমেন্টের সাথে কোন যোগাযোগ নেই এর। আপনার দেশের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই। নিতান্তই ব্যক্তিগত কাজ।'

'আমার কাছে টাকা নেই জেনেই আপনি এসেছেন,' জটিলেশ্বরের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল আবার রানা। 'গোড়াতেই কথাটার একটা ব্যাখ্যা দরকার। তাই না?'

'ওটা একটা কথার কথা। আপনার দেশে একশো টাকার নোট অচল ঘোষণা হওয়ায় ভাবলাম হয়তো টাকার ঠেকা আপনার থাকতেও পারে। পঞ্চাশ হাজার

ডলারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি, যদি কাজটা করে দিতে পারেন।' সরাসরি চাইল রানার চোখে। 'করবেন?'

প্রায় আধ মিনিট চোখ বুজে চিন্তা করল রানা। জটিল রায়ের জটিলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে তার। যত টাকার লোভই দেখাক না কেন, ভাল মত ভেবে চিন্তে বুঝে নিতে হবে আগে। চট করে কিছুই মাথায় এল না ওর। কি এমন গোপনীয়, বেসরকারী, বিশেষ কাজ হতে পারে যার জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে রাজি আছে জটিলেশ্বর রায়?

'কাজটা কতদিনের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটা নির্ভর করে আপনার যোগ্যতা ও ক্ষমতার ওপর। এক মাসও লেগে যেতে পারে, আবার হয়তো সাতদিনেই শেষ করতে পারবেন।'

'টাকাটা কবে দিচ্ছেন? একবারে না ইনস্টলমেন্টে?'

'দুই ইনস্টলমেন্টে। কাজটা যদি আপনি হাতে নেন তাহলে আজই পাবেন ত্রিশ হাজার, কাজটা শেষ হলে পাবেন বাকি বিশ হাজার। নগদ।'

'বেশ, শোনা যাক, কি ধরনের কাজ।'

'নিচ্ছেন আপনি?' খুশি হয়ে উঠল জটিলেশ্বর। 'কথা দিচ্ছেন?'

'সেটা বলা যাবে না আগে থেকে। সবটা শুনলে বলতে পারব। জেনে শুনে তারপর কথা দেব আমি।'

'ঠিক আছে।' কার্পেটের উপর নামিয়ে রাখা প্রোজেকটরের দিকে ইঙ্গিত করল জটিল রায়। 'এটা চালাতে পারেন? এর কলকব্জা জানা নেই আমার। একটা ফিল্ম দেখাতে চাই আমি আপনাকে।'

'নিশ্চয়ই।' উঠে দাঁড়াল রানা। সুইচবোর্ডের কাছে একটা টেবিলের উপর প্রোজেকটরটা রেখে ফিল্ম পরাল তাতে যত্নের সাথে, তারপর জানালার ভারি কার্টেন টেনে আঁধার করে দিল ঘরটা। ফিরে এসে সুইচ টিপে প্রোজেকটর চালু করে দিয়ে বসল সোফায়। দেয়ালের গায়ে চালু হয়ে গেল নীলছবি। কি ধরনের ছবি দেখছে টের পেয়ে গেল রানা আধ মিনিটের মধ্যেই। মৃদু হেসে বলল, 'সারপ্রাইজিং।' তারপর আর একটা কথাও না বলে আগাগোড়া পুরোটা ছবি দেখল সে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে।

সুন্দরী মেয়েটা বিশাল চেহারার পেশীবহুল একটা হুডপরা গুণ্ডার কাছে আত্মসমর্পণ করল মিনিট দুয়েক ছোটাছুটি আর ধস্তাধস্তির পর। ততক্ষণে জামা কাপড় খুলে ফেলেছে সে মেয়েটির। ল্যাঙ মেরে ঝপাং করে ওকে বিছানায় ফেলতেই হাসল মেয়েটা, বোঝা গেল এতক্ষণের ধস্তাধস্তি আর চিৎকার পুরুষটাকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বিকৃত কেলি—সঙ্গীকে আরও উত্তেজিত করে তোলার প্রচেষ্টা মাত্র। এরপর কামোন্মত্ত নারী-পুরুষ এমন সব কাণ্ড শুরু করল যা স্বাভাবিক মানুষ করে না কোনদিনই। চুপচাপ দেখল রানা এই কদর্য কারবার। স্পূল শেষ হয়ে গিয়ে ফিল্মের শেষ মাথা ফড়ফড় আরম্ভ করতেই প্রোজেকটরের সুইচ অফ

করে, জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে ফিরে এল সোফায়।

'এইবার শোনা যাক,' বলল সে। 'নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যে নিশ্চয়ই ছবিটা আনেননি সাথে করে? ঘটনাটা খুলে বলুন।'

'এই রকম আরও তিনটে ফিল্ম আছে,' বলল জটিলেশ্বর দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুটটা হাতে নিয়ে। 'খুঁজে বের করে আমার হাতে তুলে দিতে হবে ওগুলো। মেয়েটাকেও চাই আমি। আপনার কি মনে হয়, পারবেন ওগুলো খুঁজে বের করতে? না পারলে সরাসরি বারণ করে দিন। আমার যতদূর বিশ্বাস এ ছবি প্যারিসেই তোলা হয়েছে, খুব সম্ভব মেয়েটাকেও পাওয়া যাবে এই প্যারিসেই। পারবেন ওকে ফিরিয়ে আনতে?'

হাতের তালু দিয়ে হাঁটু ঘষছে রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জটিলেশ্বরের মুখের দিকে।

'পুরো ঘটনাটা বলুন।'

'আপনার যতটা জানা দরকার আপনি জেনেছেন। এর বেশি আপনার জানার কোন দরকার নেই। ব্যাপারটা গোপনীয়। আপনাকে টাকা দেয়া হবে...'

'ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করে কোন লাভ নেই মিস্টার রায়। কাজটা হাতে নিতে হলে আমার জানতে হবে আগাগোড়া সবটা। আমার প্রথম প্রশ্ন: আপনি এর মধ্যে কেন?'

'দেখুন, আপনাকে যতটা বলা যায় বলেছি। আপনি তিনটে ফিল্ম খুঁজে বের করে নিয়ে আসুন, মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনুন, ব্যস, আপনার কাজ শেষ, টাকা পাবেন। এর বেশি জানার কোন প্রয়োজন নেই আপনার। এখন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিন, কাজটা আপনি নেবেন কি নেবেন না।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা, গোল একটা ঘন ধোঁয়ার রিঙ ছাতের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে চাইল জটিল রায়ের চোখের দিকে। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কেমন আছেন, মিস্টার রায়? কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই তো? সুখী?'

চমকে উঠল জটিলেশ্বর। ঠিক যেন বোলতার কামড় খেয়েছে।

'এসব কথার মানে? ঠিক কি বলতে চাইছেন...' রাগের আভাস প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠস্বরে।

'মেজাজটা ঠিক মানাচ্ছে না, মিস্টার রায়,' আরও একটু বিস্তৃত হলো রানার হাসি। 'আমি আপনার কাজ নিইনি এখনও। যদি নিই, তাও আপনার কর্মচারী হিসেবে কাজটা করব না আমি। আমার সাথে মেজাজ করে কোন ভাল ফল পাবেন না আপনি। আপনি ভুলে গেছেন যে আমি বাংলাদেশের সেরা এজেন্টদের একজন। ভুলে গেছেন যে আমাদেরও একটা শক্তিশালী নেটওঅর্ক রয়েছে। ভুলে গেছেন যে এমন অনেক কথা আমাদের জানা আছে যা আপনারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। ওই মেয়েটার নাম শিখা শঙ্কর—আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী শংকরলালজীর

মেয়ে। সেই জন্যেই এত টাকার অফার নিয়ে আজ আপনি স্বয়ং আমার হোটেল কামরায় এসে হাজির হয়েছেন। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব কাজটা ঠিকই করেছেন। ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন আপনি। আমি জানি আপনার কলিক পেইন নেই, কাজেই দয়া করে চোখমুখটা স্বাভাবিক করুন। মেয়েটা শংকরজীর মেয়ে। তাই না?'

ধীরে একবার বুক ভরে দম নিয়ে সবটা বাতাস বের করে দিল জটিলেশ্বর। 'আপনি চেনেন ওকে?'

'চিনি মানে, দেখেছি। আলাপ নেই। মাস তিনেক আগে রোমের এক হুল্লোড়-পার্টিতে মাতাল অবস্থায় ঢলাঢলি করতে দেখেছিলাম, একই রাতে তিনবার তিন ছোকরার সাথে 'লাভ রুমে' যেতে দেখেছিলাম। কে একজন কানে কানে বলেছিল, ওর নাম শিখা শংকর—শংকরলালজীর একমাত্র কন্যা।'

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে জানেন আপনি?'

'জানি না। কিন্তু জানতে খুব বেশি সময় লাগবে না। যাই হোক, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। পরিষ্কার জবাব দিন। শংকরজীর মেয়ে ওটা?'

'হ্যাঁ।' খানিক ইতস্তত করে বলল জটিলেশ্বর। বুঝতে পারল, আর চেপে রাখবার কোন অর্থ হয় না। 'এই মেয়েটার মাধ্যমে কেউ ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করছে শংকরলালজীকে, যদি রাজনীতি থেকে সরে না দাঁড়ায় তাহলে এই রকম আরও তিনটে ছবি পাঠানো হবে বিরোধী দলের কাছে। একেবারে ধুলোয় মিশে যাবে লোকটা। আমার কাছে এসেছিল বেসরকারী সাহায্যের জন্যে। আমি এসেছি আপনার কাছে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। অনেকটা আপন মনেই বলল, 'মস্ত এক পরিকল্পনা করেছিল শংকরলালজী, নেমেছিল গভীর এক খেলায়। সব ভেস্তে যেতে বসেছে এখন অবাধ্য মেয়ের জ্বালায়। পঞ্চাশ হাজার ডলারের বিনিময়ে আবার সব ঠিক করে নিতে চাইছে লোকটা। আমাকে ব্যবহার করতে চাইছে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাতিয়ার হিসেবে।'

'পঞ্চাশ হাজার যথেষ্ট নয়?' জিজ্ঞেস করল উৎকণ্ঠিত জটিলেশ্বর।

'যথেষ্ট,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ভাবছি সত্যিই আমি কাজটা করতে চাই কিনা। আমি এইসব লোককে পছন্দ করি না। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বহু নিচে নামতে পারে এরা। এমন জঘন্য কাজ নেই যা করতে পারে না আর সবাইকে দাবিয়ে ওপরে ওঠার জন্যে। ওর ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি কোন রকম সহানুভূতি নেই আমার। আমি ভারতীয় হলে ওকে ভোট দিতাম না। কয়টা বাজে জানতে চাইলেও উত্তর দিতাম না।'

'দয়া করে প্রোজেক্টরটা কেসে ভরে দেবেন?' শান্ত কণ্ঠে বলল জটিলেশ্বর। 'বুঝতে পারছি, খামোকা সময় নষ্ট করছি আমি এখানে বসে বসে।'

জটিলেশ্বরকে উঠে দাঁড়াতে দেখে হাসল রানা। 'অত স্পর্শকাতর হবেন না। লোকটাকে পছন্দ করি না আমি, তার মানে এই নয় যে ওর টাকাটাও আমার অপছন্দ। টাকার দরকার না থাকলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু আমার দরকার। ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। ফিল্মটা থাক আমার কাছে। দুই একদিনের মধ্যেই কোন সুখবর জানাতে পারব আশা করি।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার দুয়েক দেখল জটিল রায় রানাকে।

'অর্থাৎ কাজটা নিচ্ছেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই। আজ বিকেলের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন আমার ফি।'

'সেজন্যে কোন চিন্তা নেই। আজকেই পেয়ে যাবেন আপনি ত্রিশ হাজার। আর একটা কথা গোপনীয়তার ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করা···'

'লাগবে না। ক্লায়েন্টকে বিপদে ফেলা আমার ধর্ম নয়। নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি। গুড বাই।'

শুকুর পাঞ্জাবী লোক, সম্প্রতি এসেছে পাকিস্তান থেকে। লম্বা চওড়া, শান্তশিষ্ট চেহারা, একটু ভারিক্কি বয়সের। সেইজন্যেই ওকে বিশেষভাবে পছন্দ করে মোহাম্মদ ইসমাইল। শুকুর লোকটা ঠাণ্ডা, কিন্তু মারপিটের সময় ভয়ানক দুর্ধর্ষ বলে পরিচিত। পিস্তলের হাতও চমৎকার। ওর সামনে বিয়ার অর্ডার দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ইসমাইল। হানিফের মত ফাৎরা লোক না যে এই সামান্য ব্যাপার রিপোর্ট করবে অফিসে।

মিনিট পনেরো লিরিক হোটেল থেকে চল্লিশ গজ দূরে একটা কাফেতে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করল ওরা, তারপর একটু উসখুস করে শুকুর বলল, 'ইচ্ছে করলে জটিলেশ্বরকে ফলো করতে পারো তুমি। মাসুদ রানার পিছনে থাকতে পারি আমি।'

মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হলো ইসমাইল। এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে শুকুর মনে করে না মাসুদ রানার মত একজন দুর্ধর্ষ এজেন্টকে অনুসরণ করবার ক্ষমতা ওর মধ্যে আছে। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমাকে রানার পিছনে থাকবার হুকুম দেয়া হয়েছে। অর্ডার ইজ অর্ডার।'

কাঁধ ঝাঁকাল শুকুর।

'ঠিক আছে। আমার আপত্তির কিছুই নেই। বরং আমার জন্যে সেটাই ভাল। তুমি বাবা একটু সাবধানে থেকো। রানা হচ্ছে যাকে বলে সত্যিকার প্রফেশনাল।' হাসল। 'বিপদে পড়লে স্মরণশক্তি দিয়ে পার পাবে না ওর হাত থেকে।'

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতার পর দুই ঢোক বিয়ার গলা দিয়ে নামিয়ে ইসমাইল বলল, 'আমিও প্রফেশনাল।' সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইল শুকুরের চোখের দিকে। 'সন্দেহ আছে তাতে?'

যদিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে শুকুরের, তবু মাথা নেড়ে বলল, 'না,

না। সেজন্যে বলিনি। অর্ডার ইজ অর্ডার। ব্রিগেডিয়ার সাহেব নিজেই তো অর্ডার দিয়েছেন। উনি তোমার-আমার চেয়ে ভাল বোঝেন কে কোন্ কাজের যোগ্য। তাই না? ভাল কথা, হঠাৎ করে তারিক আখতারকে এখানে বদলি করল কেন? ডিমোশন?'

'না।' আশ্বস্ত হয়ে মাথা নাড়ল ইসমাইল। 'জটিলেশ্বর রায়কে এখানে বদলি করায় পিণ্ডির টনক নড়ল যে এখানকার নিয়ম কানুনের আরও উন্নতি হওয়া দরকার। এঁকে পাঠানো হয়েছে সবকিছু গুছিয়ে দেয়ার জন্যে। চলে যাবেন কয়েকমাস পরেই। যাই বলো, এ রকম একটা এগজিকিউটিভ হয় না। কি বলো?'

'তা তো বটেই। তবে মাসুদ রানার কাছে এই লোকও কিন্তু মস্ত ঘোল খেয়েছে একবার। লাহোরে…'

'জানি।' ঘটনাটা শুকুর সবিস্তারে বর্ণনা করবার আগেই বলল ইসমাইল। 'ওই দেখ, তোমার চিড়িয়া বেরিয়ে আসছে হোটেল থেকে। বিলটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ো।'

একটা নোট তস্তরী চাপা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল শুকুর। চলায় ওর চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা। জটিলেশ্বরের সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবার আগেই নিজের গাড়িতে উঠে বসেছে সে। ট্যাক্সি রওনা হতেই ওর দিকে একবার হাত নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দিল শুকুর। হঠাৎ বড় একা বোধ করল ইসমাইল। অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ির মত অনুভূতি শুরু হলো ওর পেটের মধ্যে। ঘেমে উঠল হাতের তালু। বুঝতে পারল সে, নার্ভাস হয়ে পড়ছে। ঠিকই বলেছিল শুকুর। মাসুদ রানা শুধু প্রফেশনাল নয়, একজন অসাধারণ এজেন্ট। রানার ভারটা ওকে দিতে পারলে খুবই ভাল হত, ব্রিগেডিয়ারও তেমন কিছু মনে করতেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু শুকুরের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার ব্যাপারে আসলে বেধেছে ওর আত্মসম্মানে। খানিক বাদেই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবে মাসুদ রানা, এবং তাকে অনুসরণ করতে হবে ওর, অথচ ধরা পড়লে চলবে না, কোথায় যায় কি করে সব রিপোর্ট করতে হবে ব্রিগেডিয়ারের কাছে—ভাবতেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। যদি হারিয়ে ফেলে? যদি টের পেয়ে যায় মাসুদ রানা? শুকনো ঠোঁট চাটল ইসমাইল। অর্ডার দিল আর এক ক্যান বিয়ারের। সাথে কিছু খাবার হলে মন্দ হত না, কিন্তু তাহলে হঠাৎ রানা বেরিয়ে এলে খাবার ফেলে উঠতে পারবে না, এই ভয়ে আর কিছু অর্ডারই দিল না সে।

এইভাবে মিনিট বিশেক ছটফট করবার পর আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না মোহাম্মদ ইসমাইল। বেয়ারা ডেকে বিল চুকিয়ে দিয়ে খানিক হাঁটাহাঁটি করল রাস্তায়। সেটাও অসহ্য হয়ে ওঠায় উঠে বসল ওর তোবড়ানো রেনোয়ায়।

আরও দশ মিনিট পর হোটেল লিরিক থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ছাই রঙা সোয়েটারের ওপর কালো একটা লেদার জ্যাকেট পরা, ঠোঁটের কোণে সিগারেট, হাত দুটো জ্যাকেটের পকেটে।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে রইল ইসমাইল। দেখল, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে লম্বা পা ফেলে কয়েক গজ দূরে পার্ক করে রাখা একটা লাল ল্যান্সিয়ায় উঠছে রানা। ল্যান্সিয়া

চলতে শুরু করতেই পিছু নিল রেনোয়া। আশপাশে, সামনে-পিছনে এত অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় যে খানিকক্ষণ অনুসরণ করেই ধরা পড়বার অহেতুক ভয় বেশ অনেকটা কেটে গেল ইসমাইলের। রিউ রেমণ্ড লসেরাঁ ছাড়িয়ে এভিনিউ ডু মেইনে পড়ল ওরা। খানিকদূর গিয়েই বামে মোড় নিল ল্যান্সিয়া, রেনোয়াও মোড় নিল আগে দুটো গাড়িকে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে। রিউ ডি ভগিরার্ডে এসে ডাইনে মোড় নিল রানা, বেশ কিছুদূর গিয়ে থেমে দাঁড়াল একটা পার্কিং স্পেস পেয়ে।

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ইসমাইলের। পিছনের ট্রাফিকের চাপে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে সে। কাছেপিঠে কোথাও পার্কিং স্পেস দেখতে পাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে যতদূর দেখা যায় রানার উপর নজর রাখবার চেষ্টা করল সে। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে একটা আঙিনার মত জায়গার দিকে এগোতে দেখল, তারপর আড়াল হয়ে গেল একটা লরির ওপাশে। ভাগ্যদেবীকে গোটা কয়েক গালি দিল সে, আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতে বাধ্য হলো, তারপর একটা সাইড স্ট্রীট পেয়ে মোড় নিল। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়িকে ব্যাক করতে দেখে আরও একটু কমাল গতি, ওটা বেরিয়ে যেতেই ঢুকে পড়ল ফাঁকা জায়গায়। ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল সে গাড়ি থেকে, গাড়ি লক না করেই দ্রুতপায়ে ছুটল উল্টোপথে।

ল্যান্সিয়াটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রানার পাত্তা নেই। চারদিকে চাইল ইসমাইল। আঙিনার মত জায়গাটায় এগিয়ে গিয়ে অনেকগুলো দরজা চোখে পড়ল ওর। নেমপ্লেটগুলো পড়তে পড়তে একটা নামের উপর থমকে গেল ওর চোখ। লেখা আছে: সানুকি হাকাওয়াগা—ফটোগ্রাফিক স্টুডিয়ো।

মুভি প্রোজেকটরের কথা স্মরণ করে আন্দাজ করে নিল ইসমাইল, এইখানেই ঢুকেছে মাসুদ রানা। মনে মনে আক্ষেপ হলো, শুকুরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেই পারত, ওর ঘাড়ে রানার ভার চাপিয়ে দিতে পারলে আর কোন দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তে হত না ওকে—গর্ব এসেই মাটি করেছে সব। গাড়ি পাহারা দিয়ে কোন লাভ নেই। এখান থেকে বেরিয়ে এসেই গাড়িতে উঠে ভোঁ করে চলে যাবে মাসুদ রানা। দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে রিউ ডি ভগিরার্ডে উঠতে উঠতে পগার পার হয়ে যাবে রানা, হারিয়ে যাবে গাড়ির ভিড়ে। সুযোগ বুঝে নিজের গাড়িটা কাছাকাছি এনে রাখবার চিন্তাটা দূর করে দিল সে, ঠিক করল, আরও লোকের সাহায্য চাইতে হবে ওর এখন ব্রিগেডিয়ারের কাছে।

কাছাকাছিই একটা ড্রাগস্টোর দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে এগোল সে ওটার দিকে।

দু'মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে ডায়াল করল ব্রিগেডিয়ারের নাম্বারে।

চার

অনুসরণের ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি রানা। খুশি মনে একেবারে দুই সিঁড়ি করে টপকে উঠে এল তেতলায় হাকাওয়াগার স্টুডিয়োর দরজার সামনে। বেল টিপল।

পাঁচ-ছয় বছর ধরে জানাশোনা ওর এই জাপানী ফটোগ্রাফারের সাথে। বাচ্চা একটা হাতির মতই বিশাল হাকাওয়াগার শরীর। সর্বদা হাসিখুশি। বিনয়াবনত। কিন্তু ছবির বাজারে দারুণ ব্যবসা করছে সে চুটিয়ে। লাগজারি হোটেলগুলোতে আমেরিকান টুরিস্টদের জন্যে কালার স্লাইড আর এইট মিলিমিটার ফিল্ম সাপ্লাই দেয় সে। ফিল্মগুলো প্যারিস-রমণীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তোলা। পর্ণোগ্রাফি হয় না ওর তোলা ছবি, কাছাকাছি গেলেও সারাটা ছবি জুড়ে আশ্চর্য এক রুচিসম্মত শিল্পস্বাদ থাকে বলে আজ পর্যন্ত আইনের কোন ফ্যাকড়ায় পড়তে হয়নি ওকে। এসব ছবির দারুণ সেল। বেশির ভাগ আমেরিকান টুরিস্টই এগুলো কিনে নিয়ে দেশে ফেরে বন্ধু-বান্ধব আর প্রতিবেশীকে প্যারিসে না গিয়ে কি হারাচ্ছে দেখাবে বলে—যদিও সত্যি সত্যিই এসবের দর্শন তাদের মেলে না প্যারিসে এসে।

উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে ওর ব্যবসার। মানুষের দুর্বলতার গলিঘুঁচি বুঝে নিয়ে ঠিক পরিমাণ মত ডোজ ব্যবহার করে সানুকি হাকাওয়াগা। নোংরামি থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে নিজেকে। কয়েক বছরেই প্যারিসের প্লেবয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে নিজেকে। শান-শওকত দেখে মনে হয় সুখেই আছে।

টাইট প্যান্ট পরা এক ছোকরা দরজা খুলল। বেল্টটা কোমরের এতই নিচে বেঁধেছে যে ভয় হয় এক্ষুণি বুঝি খসে পড়ে যাবে। অনেক চর্চায় রপ্ত করা হাসি ঠোঁটে নিয়ে ভুরু জোড়া কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস, মশিয়ে?'

'সানুকি আছে? দেখা হবে, না ডিমে তা দিচ্ছে?'

ভুরু জোড়া আরও একটু উপরে উঠল।

'মশিয়ে হাকাওয়াগা ছবি তুলছেন।'

'তার মানে বসে থাকো এখন আধঘণ্টা!' ছোকরাকে প্রায় ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। 'ঠিক আছে, অপেক্ষা করব আমি। গোলাপী আলোয় আলোকিত করিডরের শেষ মাথায় ওয়েটিং রুম, জানে রানা, সেদিকেই এগোল। হাকাওয়াগা স্টুডিয়োর চারদিকে বিলাসের ছড়াছড়ি, অপূর্ব সুন্দর জাপানী কায়দায় সাজানো গোছানো সবকিছু। এতটা পারিপাট্য ভাল লাগে না রানার, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। দুধ-সাদা এক নগ্নমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে—এটাই ওয়েটিং রুম।

পিছন পিছন এল ছোকরা।

'কি নাম বলব, মশিয়ে?'

'বলুন মাসুদ রানা। চেনে আমাকে।'

অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দরজার দিকে হাত বাড়াল ছোকরা। 'আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। দয়া করে বসুন এই ঘরে।'

চকচকে পালিশ করা আসবাবপত্রে সাজানো ওয়েটিং রুমে ঢুকল রানা। চার দেয়াল ঘেঁষে আরাম কেদারা, ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর ছড়ানো আছে অনেকগুলো ম্যাগাজিন। দেয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো হাকাওয়াগার তোলা বিরাট আকৃতির গোটা কয়েক নুড মাস্টারপিস।

ঘরে ঢুকেই আরেকজনের উপস্থিতি অনুভব করল রানা। চট করে চোখ গেল ওর ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসা যুবতীর দিকে। বাম হাতের সরু আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে একটা ফিলটারটিপড সিগারেট, অপর হাতে পাতা উল্টাচ্ছে কালার ম্যাগাজিনের। চোখ তুলে চাইল মেয়েটা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানাকে, দৃষ্টিটা তিন সেকেণ্ড থমকে গেল রানার চোখে, রানাও ওকে লক্ষ করছে দেখে দেখার সুযোগ দিল সে পত্রিকায় মনোনিবেশ করে।

এক নজরেই পছন্দ হয়ে গেল রানার মেয়েটিকে। কাটা চেহারা। তেইশ-চব্বিশ মত বয়স। কোন্ দেশী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গায়ের রং খুবই ফর্সা, কিন্তু ইউরোপীয়ানদের মত না। মধ্যপ্রাচ্যের হতে পারে। কোমর পর্যন্ত লম্বা রেশমী খয়েরি চুল, চোখের মণি কুচকুচে কালো, গোলাপী ঠোঁট। পাতলা, লম্বা। অপূর্ব সুন্দর ছিমছাম নিটোল ফিগার। আগাগোড়া বুক চেরা সাদা একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরা, পায়ের উপর পা তোলা থাকায় প্রায় উরু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নিটোল একখানা পা। বেল্ট বাঁধেনি বলে বুকের কিয়দংশ উন্মুক্ত।

চোখ তুলল মেয়েটা। রানাকে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতে দেখে একহাতে বুকের কাপড় ঠিক করল। ভুবন ভুলানো হাসি হাসল রানা।

'ডেন্টিস্টের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবার মত, তাই না?' ইংরেজীতে বলল রানা। 'মডেল হিসেবে কাজ করছেন বুঝি সানুকির সাথে?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল মেয়েটা। ওর চোখের বঙ্কিম দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য দেখতে পেল রানা। সিগারেটের গোড়ায় ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে কপালের উপর থেকে একগোছা চুল সরাল। 'আপনি? আপনিও কি তাই?'

'সর্বনাশ!' হেসে উঠল রানা। দুটো চেয়ার খালি রেখে তার পাশেরটায় বসল। 'আমাকে শূট করবে সানুকি? পিস্তল দিয়ে হয়তো রাজি হতে পারে, ক্যামেরা দিয়ে নয়। আমি এমনি এসেছি। পরিচয় আছে, এই পথে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'আমি জিন্নাত আযমী।' ছাই ঝাড়ল মেয়েটা, তারপর অবাক হয়ে চাইল রানার দিকে। 'মাসুদ রানা? আমি মনে করেছিলাম সাউথ আমেরিকান বুঝি। নিদেন পক্ষে স্প্যানিস। এখন দেখছি দেশোওয়ালী ভাই। আপনি পাকিস্তানী না?'

'না। আগে ছিলাম—এখন বাংলাদেশী। আপনি পাকিস্তানী বুঝি? আমি ভেবেছিলাম ইরানী বা ইজিপশিয়ান। প্রায়ই পোজ দেন বুঝি এখানে? রেগুলার?'

মাথা নাড়ল জিন্নাত, মুখ বিকৃত করল।

'মাসে একবার। এখানে প্রতিযোগিতা খুব বেশি। যারই একটু চেহারা-সুরত আছে সে-ই ছুটে আসে এখানে। অনেকে আছে বিনা পয়সায় মডেল দিতেও এক পায়ে খাড়া। হাকাওয়াগার ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারলেই জীবন ধন্য মনে করে। পেশাদারীদের নাকাল অবস্থা।'

'খুব খারাপ কথা!' বলল রানা। 'মডেল দেয়া ছাড়া আর কি করেন আপনি?'

'কারও সাথে বিছানায় সুই-টুই কিনা জানতে চাইছেন?'

'সেটা পরে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম,' হাসল রানা। 'আপাতত জীবিকার কথাই জানতে চেয়েছি।'

'অনেক কিছু করি। হয়তো কোন পোশাক তৈরির ব্যাপারে মডেল হলাম কিছুদিন, কিংবা কোন দোকানের শো গার্ল। এই রকম। পেইন্টিং শিখতে এসেছিলাম এখানে স্কলারশিপ নিয়ে, খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে বখে গেছি। তিন বছর পর টাকার গাছটা শুকিয়ে মরে গেল। সেই থেকে নানান ধরনের কাজ করে রোজগার করতে হয় আমাকে।' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে রানাকে। 'আপনি কি করেন?'

'আমার অবস্থাও অনেকটা আপনারই মত। কিন্তু রোজগারের জন্যে কাজ করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। কাজ জিনিসটা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। নীতির বাইরে।'

'আমারও। কিন্তু কাজ না করে চলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল জিন্নাত। 'খাওয়া-পরার জন্যে টাকার দরকার হয় না আপনার?'

'হয়। লোকে বলে যে কোন বড় শহরের আকাশে বাতাসে টাকা ওড়ে। কথাটা সত্যি। আমি তার থেকে আমার দরকার মত টাকা ধরে ফেলি টপাটপ।'

'তার মানে খাওয়া পরার জন্যে কোনই কাজ করতে হয় না আপনার?'

'নাহ্। যদি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, কোন কাজ করি না আমি। আপনাকে দেখেও তো মনে হয়, এমন একটা চেহারা নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে খুব একটা দুশ্চিন্তা করবার দরকার হয় না আপনার।'

মৃদু হাসল জিন্নাত। 'দুশ্চিন্তা করছি তা বলছি না। কিন্তু আপনি কিছুই কাজ করেন না, সে কেমন কথা? আপনার টাকা সব হাওয়া থেকে পাওয়া?' কথাটা বলতে বলতে ইচ্ছে করেই বুকের কাপড়টা বেশ খানিকটা খসে যেতে দিল সে। ওদিকে রানার চোখ যেতেই ঢেকে ফেলল আবার। 'কিভাবে ধরেন টাকাগুলো?'

'কায়দা আছে। আসুন না একদিন ডিনার খাওয়া যাক একসাথে, তখন আলোচনা করা যাবে এই ব্যাপারে। কৌশলটা শিখিয়ে দেব আপনাকেও। অবশ্য যদি আপনার আগ্রহ থাকে

আবার একবার রানাকে দেখল মেয়েটা, তারপর মাথা ঝাঁকাল।
'নিশ্চয়ই। কাজ না করে যদি হাওয়া থেকে টাকা পাওয়া যায়, আমি আগ্রহী।'
'এই দেখুন, আমাদের দু'জনের মধ্যে মিল পাওয়া যাচ্ছে। আমরা একে অপরের সাহায্যে আসতে পারি।' সরাসরি মেয়েটার চোখে চোখ রাখল রানা। 'শেয গ্যারিন রেস্তোরাঁ চেনেন?'
মেয়েটার আয়ত চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।
'নাম শুনেছি। কিন্তু···অতিরিক্ত খরচা না ওখানে?'
কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খুব একটা বেশি কোথায়? তবে খাবারটা ভাল। আসুন না ওখানে, রাত নয়টায়, ডিনার খাওয়া যাক একসাথে? আপনার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'
তিন সেকেণ্ড চেয়ে রইল মেয়েটা রানার চোখের দিকে। তারপর কঠিন হয়ে গেল মুখটা।
'এসব ব্যাপারে ঠকানো খুব একটা পৌরুষের কাজ নয়।'
'আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝলাম না। একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।'
'এপ্রিল ফুল করতে চাইছেন!'
'দেখুন, ঠাট্টা বা ঠকানোর কথা আমার মাথায় আসেনি। বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। আমি ডিনারের দাওয়াত দিয়েছি আপনাকে, এটা অন্যায় মনে হচ্ছে আপনার কাছে?'
'দাওয়াত দেয়াটা অন্যায় কিছুই নয়। ডিনারের পর কারও সাথে বিছানায় যাওয়ার মধ্যেও অন্যায় দেখি না। কিন্তু ওরকম গর্জিয়াস রেস্তোরাঁয় গিয়ে যদি দেখা যায় সব ফক্কা, আমন্ত্রণ কর্তা অনুপস্থিত, সেই অবস্থায় একটা মেয়ের যে কি পরিমাণ অসম্মান···'
'বুঝেছি এবার!' হাসল রানা। 'আপনার মনে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে তুলে নেয়া। না, আমন্ত্রণটা তুলে নিচ্ছি না, অবিশ্বাসিনীকে তুলে নেব আমি যাওয়ার পথে। কোথায় থাকেন আপনি?'
সহজ হয়ে গেল মেয়েটা। হাসল।
'সেক্ষেত্রে বরং বিশ্বাসই করব আমি আপনাকে। ঠিক আছে, ন'টায় পৌছব আমি শেয গ্যারিনে।' হেলান দিয়ে বসল মেয়েটা, বাম পা-টা ডান পায়ের উপর থেকে নামিয়ে ডান পা-টা চড়াল বাম পায়ের উপর। চিকচিক করছে চোখ দুটো। 'আপনিও কি খাওয়ার পর আমাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং দেখাতে নিয়ে যাবেন আপনার ঘরে?'
'নাহ্, পেইন্টিং নেই আমার হোটেল কামরায়।' হাসল রানা। 'তবে যদি দেখতে চান, বিংশ শতাব্দীর এক নিখুঁত ভাস্কর্য দেখাতে পারি। বাংলাদেশী। একেবারে জীবন্ত।'
উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল জিন্নাত আযমী।

ঠিক এমনি সময়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল যেন আস্ত একটা বাচ্চা হাতী। সানুকি হাকাওয়াগা। দু'শো আশি পাউণ্ড ওজন নিয়ে কি করে যে লোকটা এত দ্রুত চলাফেরা করে বোঝা মুশকিল। সবসময় একটা তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছে যেন লোকটা।

রানা বাউলি কেটে সরে যাওয়ার আগেই বিশাল মোটা দুই বাহু জড়িয়ে ধরল ওকে, টেনে নিয়ে এল বেলুনের মত ফোলা বুকের উপর। দুই হাতে চাপড় মারছে সে রানার পিঠে, মনে হচ্ছে ফাঁপা রাবারের খোলস্। দুই কাঁধ ধরে ঠেলে পিছনে সরাল সে রানাকে, দুই কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে হাসি, প্রকাণ্ড হাসিখুশি মুখটা জ্বলজ্বল করছে অনাবিল আনন্দে।

'রানা! ও মাই ডার্লিং রানা! কল্পনাও করতে পারিনি হঠাৎ এভাবে তোমার দেখা পাব। কী সৌভাগ্য আজ আমার! কাল রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি আমি, আর আজ তুমি সশরীরে হাজির! আশ্চর্য না?'

'গুলপট্টি রাখ তো,' কোনমতে ওর হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে বলল রানা, 'এক ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন। ওঁর কাজটা সেরে নাও আগে, তারপর তোমার সাথে কথা আছে।'

'ওহ্-হো! জিন্না ডার্লিং এর কথা বলছ?' জিন্নাতের দিকে ফিরল সানুকি। হেল্লো, বেবি। এ হচ্ছে আমার অনেক পুরোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানা। ধরতে গেলে বাল্যবন্ধু। ওর মত মানুষ হয় না। আমার মহা বিপদের সময় ও...'

'সানুকি!' ধমক মারল রানা। 'চাপাবাজি রাখ। পরিচয় হয়েছে আমাদের। কি শুরু করলে তুমি!'

থতমত খেয়ে গেল হাকাওয়াগা।

'খারাপ কিছু বলে ফেলেছি?'

'এখনও বলোনি, কিন্তু লক্ষণ সেই রকমই দেখা যাচ্ছে। মিস আযমী অপেক্ষা করছেন ছবি তোলার জন্যে।'

নাটুকে ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে হতাশ হওয়ার মুদ্রা দেখাল হাকাওয়াগা, মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ।

'আজ আর হবে না, সুইট ডার্লিং। দেখতেই পাচ্ছ, স্বাভাবিক অবস্থায় নেই আমি আর। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। এখন ছবি তোলা অসম্ভব। রানার সাথে কথা বলতে হবে আগে। তুমি এক কাজ করো। কার্লোকে বলো আগামীকাল তোমার জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে। আজকেরটাও যেন চুকিয়ে দেয়। কাল ঠিক এই সময়ে এসো। কেমন? এখন ছবি তুলতে পারব না, রানার সাথে কথা বলতে হবে।'

ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল জিন্নাতের।

'খামোকা বসে থাকার জন্যে ওই ছুঁচো আমাকে পয়সা দেবে ভেবেছেন? অসম্ভব।'

'ছি, এরকম বলে না, ডার্লিং। আমি বলে দিচ্ছি ওকে। তুমি কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার পাওনা চুকিয়ে দেবে ও। অলরাইট?' রানার উরুর সমান মোটা একটা হাত দিয়ে রানার কাঁধ জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগোল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল রানা। চোখ টিপল মেয়েটা।

'নয়টা। ভুলে যাবেন না আবার!' বলল রানা।

'দশটা। ভাস্কর্য দেখাচ্ছেন। ভুলে যাবেন না আবার!' বলল মেয়েটা।

ছোট্ট একটা শিস দিল সানুকি, টেনে হিঁচড়ে রানাকে নিয়ে এগোল করিডর ধরে। কয়েক কদম গিয়ে বলল, 'ওই মেয়েটার সাথে বদমায়েশীর প্ল্যান করেছ বলে মনে হচ্ছে, রানা?'

'করলে ক্ষতি কি? রোগ-টোগ আছে নাকি?'

'রোগের চেয়েও খারাপ। খারাপ একটা পুরুষ বন্ধু আছে ওর।' দড়াম করে দরজা খুলে রানাকে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল সে নিজের প্রাইভেট অফিসে। 'ছোকরা রেগে গেলে ছুরি মারে।'

'তাতে কি?' হাসল রানা। 'ও তো আমিও করি।'

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। একেবারে চোখ ধাঁধানো কারবার। প্রচুর টাকা ব্যয় করে এই ঘরটা সাজিয়েছে সানুকি। কোনদিক থেকে কার্পণ্য করেনি। মস্তবড় ডেস্কটা আগাগোড়া ঝকঝকে মসৃণ তামা দিয়ে ঢাকা, জেব্রার চামড়া দিয়ে মোড়া হয়েছে লাউঞ্জিং চেয়ারগুলোর গদি। দেয়ালের গায়ে বসানো একজোড়া সোনালি হাতের উপর জ্বলছে দুটো মোলায়েম গোলাপী বাতি। উল্টো দিকের দেয়ালটা কাঁচের—অপূর্ব সুন্দর ছোট্ট একটা বাগান দেখা যাচ্ছে ওপাশে। তিন দেয়ালে চিত্রিত রয়েছে নানারকম জাপানী ডিজাইন।

'খুব পয়সা লুটছ মনে হচ্ছে!' চারদিকে নজর বুলিয়ে বলল রানা।

'তোমার পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করেই হেসে উঠল সানুকি হুপিং কফে আক্রান্ত বাচ্চার মত। মনে হলো বেলুনের মত ভুঁড়িটা উড়ে যাবে এক্ষুণি শরীর থেকে বেরিয়ে। 'আমার পুরো এক মাসের রোজগার লাগিয়ে দিয়েছি এর পিছনে। অনেক খেটেপিটে সাজানো হয়েছে ঘরটা। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, রানা, ভাল লাগছে তোমার কাছে?'

'গুমোট লাগছে,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে।' বসে পড়ল সে একখানা জেব্রার চামড়া ঢাকা চেয়ারে।

'সত্যিই?' যার-পর-নাই খুশি হয়ে উঠল সানুকি। 'শুনে খুব খুশি হলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও একজ্যাক্টলি ঠিক তাই মনে হয়। কিন্তু আমার কাস্টোমারদের অবস্থা যদি দেখতে! এই ঘরে ঢুকলে প্যান্টে পেচ্ছাব করে দেয়ার অবস্থা হয়ে যায় ব্যাটাদের।'

'দেখ, সানুকি, আমার তাড়া আছে। একটা ব্যাপারে সাহায্য দরকার

তোমার।'

বোকা বোকা ভাবটা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সানুকির চেহারা থেকে। তীক্ষ্ণ, সজাগ হয়ে উঠল চোখ দুটো। আত্মভোলা, ছেলেমানুষী ভাবটা উবে গেছে বেমালুম।

'আমার সাহায্য? একশোবার! যা চাইবে তাই দেব তোমাকে—শুধু চাওয়ার অপেক্ষা।'

কথা একটু বাড়িয়েই বলে হাকাওয়াগা। কিন্তু ওর চোখের দিকে চেয়ে রানা বুঝল খুব একটা বাড়িয়ে বলছে না লোকটা এখন। বছর কয়েক আগে ভয়ানক এক ব্ল্যাকমেইলারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল রানা ওকে। তার জন্যে খানিকটা বেআইনি কাজ করতে হয়েছিল রানাকে; কিন্তু সেটুকু না করলে রক্ষা করা যেত না সানুকিকে, লাটে উঠত ওর এই জমজমাট ব্যবসা। অনেক সাধ্যসাধনা করেও বিনিময়ে কিছুই দিতে পারেনি সে রানাকে। সেই থেকে ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে সে এই সিংহ-হৃদয় যুবকের।

'তোমার জন্যে সবকিছুই করতে পারি আমি, ডার্লিং। যা চাইবে, পাবে।' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল সানুকি।

'তোমাকে একটা ফিল্ম দেখাতে চাই,' বলল রানা। 'আমি আশা করছি তুমি আমাকে বলতে পারবে কে তুলেছে ফিল্মটা, কোথায় তোলা হয়েছে এটা, আর ছবির অভিনেতা লোকটা কে। এটা আরেকটা ব্ল্যাকমেইলের চক্কোর। খুবই জরুরী।'

'দেখা যাক আগে,' উঠে দাঁড়াল সানুকি। 'চলো, স্টুডিয়োতে চলো।'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। তোমার ওপর আস্থা না থাকলে কিছুতেই এই ছবি দেখাতাম না আমি তোমাকে। তোমার মুখ থেকে একটা শব্দ উচ্চারণ হলে…'

'কাট ইট, ডার্লিং। একসময় আমি তোমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। তুমিও আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

সানুকির প্রকাণ্ড মুখটা গম্ভীর। অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে রানাকে নিয়ে স্টুডিয়োর মস্ত দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে। বিরাট স্টুডিয়ো। নানান রকম স্ক্রীন ঝোলানো রয়েছে এদিক ওদিকে, আলো কম বেশি করবার জন্যে নানান আকৃতির পেডেস্টাল পর্দা, অসংখ্য স্পট ও ফ্লাড লাইট, নানান ধরনের বিদঘুটে ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। একপাশে একটা সোনালী মঞ্চের উপর মস্তবড় একখানা ডবলবেড খাট—বেশির ভাগ শূটিং হয় ওখানেই।

টাইট প্যান্ট পরা ছোকরা একমনে একটা সিঙ্গেললেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করছে ব্যস্ত হাতে।

'এখন যাও, কার্লো। এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি।' বলল সানুকি। 'জিনাকে ওর পাওনা চুকিয়ে দাও। চলে যেতে বলেছি আজ। কাপড় পরছে। কাল ঠিক এই সময়ে আসতে বলেছি ওকে, লিখে রেখো।'

'কিছুই কাজ করল না, পুরো টাকা দিয়ে দেব?' অসন্তুষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইল কার্লো।

'ও কাজ করতেই এসেছিল। আমরা কাজ করাইনি সেজন্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত আমাদের। আর সব স্টুডিয়ো কি করে আমি শুনতে চাই না। যাও, যা বলছি করোগে।'

বেরিয়ে গেল কার্লো। ঝটাং করে বল্টু লাগিয়ে দিল সানুকি ভিতর থেকে।

'আর কারও ঢোকার উপায় রইল না,' বলল সানুকি। 'আমরা দুজন এইঘরে একা। বের করো দেখি ফিল্মটা, দেখা যাক।'

এই কথার প্রথম অংশটুকু সত্য—আর কারও ঢুকবার উপায় নেই, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটুকু সঠিক নয়। কারণ, কার্লোর খোঁজে নিঃশব্দ পায়ে স্টুডিয়োতে এসে ঢুকেছিল জিন্নাত আযমী। কার্লো দেখতে পায়নি ওকে। রানা আর সানুকির পায়ের শব্দ শুনে চট করে সরে দাঁড়িয়েছিল একটা স্ক্রীনের আড়ালে। রানার সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল জেগেছিল ওর মনে, সানুকির সাথে লোকটার কি এমন জরুরী প্রয়োজন সেটা জানার আগ্রহ দমন করতে পারল না সে, রয়েই গেল পর্দার আড়ালে।

এইট মিলিমিটার রীলটা এগিয়ে দিল রানা। একটা প্রোজেক্টরে পরাল সেটা সানুকি, লাইট অফ করে চালু করে দিল প্রোজেক্টর। আট ফুট বাই আট ফুট একটা সাদা পর্দার ওপর পরিষ্কার ফুটে উঠল শিখা শংকরের নগ্ন শরীর।

রানা আর সানুকি চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছে নীলছবি। পর্দার আড়াল থেকে মাথা বের করল জিন্নাত, কি ধরনের ছবি বুঝতে পেরে মুখ টিপে হাসল, তারপর চট করে সরে গেল আড়ালে।

স্পুলটা শেষ হয়ে যেতেই বাতি জ্বেলে দিয়ে রানার দিকে ফিরল সানুকি। 'কে মেয়েটা? এই র‍্যাকেটে যারা কাজ করে তাদের বেশিরভাগ মেয়েকেই চিনি আমি, কিন্তু এটাকে দেখিনি আগে আর। কে মেয়েটা?'

'একে চেনার দরকার নেই।' একটা টেবিলের উপর চড়ে বসল রানা পা ঝুলিয়ে। 'আপাতত ওর ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই। এ ছবির ক্যামেরাম্যানটা কে বলতে পারো?'

চোখমুখ বিকৃত করে কানের লতি চুলকাল সানুকি কিছুক্ষণ।

'ছয়জন আছে প্যারিসে এসব ছবি তোলে।' একটা টুলে বসে রানার মুখের দিকে চাইল সানুকি। 'যদিও বেআইনি, কারবারটা অনেক টাকার। টাকার লোভেই যায় মানুষ এতে। কখন পুলিস এসে টুঁটি টিপে ধরবে ঠিক নেই, তবু ঝুঁকি নেয় মানুষ—কারণ এই লাইনে অঢেল টাকা। কত টাকা, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এইমাত্র যে ছবিটা দেখলাম এটার কথাই ধরো। এর দাম কম করে হলেও তিরিশ হাজার ডলার। একটা ছবির দাম এত না, আসলে শত শত কপি তৈরি করে ওরা প্রতিটা ফিল্মের। এখানকার স্থানীয় মার্কেট তো আছেই, এসব

স্মাগল করে পাঠানো হয় পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শহরে—সবচেয়ে বড় মার্কেট হচ্ছে আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড। প্রত্যেকটা কপি বিক্রি হয় একশো ডলারে। খরচ-খরচা আর কমিশন বাদ দিয়ে একেকটা ছবির জন্যে এদের হাতে থাকে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার। অথচ এসব ছবির প্রোডাকশন ঝামেলা এতই কম যে সপ্তাহে একটা করে তৈরি করতে পারে অনায়াসে। আমি ইচ্ছে করলে দিনে একটা করে নামাতে পারি, আইনের ভয়ে যাই না ওতে। যাই হোক, এই ছয়জনের প্রত্যেকের নিজস্ব ক্যামেরা টেকনিক আছে। আমার যতদূর বিশ্বাস এই ছবি উইলিয়াম নেবর বলে এক ছোকরার তোলা। কসম খেয়ে অবশ্য বলা যায় না, তবে লাইটিং, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল আর কম্পোজিশন থেকে নেবরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'রিউ গ্যারিবাল্ডিতে ওর একটা স্টুডিয়ো আছে। সিনেমা স্টার আর ধনী মহিলাদের স্টুডিয়ো পোর্ট্রেট তোলে। বেশ সুনামও করেছে। কিন্তু এটা হচ্ছে ফ্রন্ট কাভার। লোক দেখানো। আসল টাকা আসে ওর নীলছবি থেকে।'

'ওর সাথে জানাশোনা আছে তোমার?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল সানুকি। বলল. 'ঘৃণা করি,আমি। ওর সাথে এক বাসে উঠব না. এক রেস্তোরাঁয় খাব না পর্যন্ত। জানোয়ার একটা।'

'আর এই ফিল্মের অভিনেতা জানোয়ারটা কে?'

'মুখোশ রয়েছে বলে হলপ করে বলা যায় না। তবে শুনেছি, এই সব ছবির জন্যে একটা ষাঁড় ঠিক করা আছে নেবরের। নিকোলো ট্র্যাচিয়া। ইটালিয়ান। শুনেছি বরাবর ওকেই ব্যবহার করে নেবর। লোকটাকে দেখিনি আমি কোনদিন। শুনেছি, যাতে চেনা না যায় সেজন্যে হুড পরে নেয় লোকটা কাজের সময়। স্যামির বারে কাজ করে লোকটা। মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে আমেরিকান ট্যুরিস্ট যায় ওখানে, ও মক্কেল ধরে আলাপ করিয়ে দেয় নেবরের এজেন্টের সাথে, কিছু কমিশন পায়।' শরীরের ভারটা বিশাল নিতম্বের একপাশ থেকে আরেক পাশে সরিয়ে নড়ে বসল সানুকি। 'কিন্তু এই মেয়েটা বড় জব্বর, হে। অ্যামেচার বোঝা যায় এক নজরেই, কিন্তু কলাকৌশলগুলো প্রফেশনালকেও হার মানায়। এই নোংরা ছবিতে কাজ করতে গেল কেন? ওকে পেলে দারুণ কিছু ছবি বানাতে পারতাম আমি। খারাপ কিছু না, কিন্তু পয়সা আর কারও চেয়ে কম দিতাম না। সফিসটিকেশন এমনই এক জিনিস, রুচি এমনই এক জিনিস, যে সব নোংরামি, অশ্লীলতা ঢেকে যায় ওর জাদু স্পর্শে; শুচি, শুভ্র, সুন্দর হয়ে ওঠে সবকিছু। কে মেয়েটা?'

'এই দেখ, আমি এলাম এক কাজে, আর তিনি ব্যবসার কথা ভাবছেন।' সিগারেট ধরাল রানা। 'ও মেয়ে তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আপাতত ওর চিন্তা দূর করে দাও মাথা থেকে। ওর ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার। এরকম আরও তিনটে ফিল্ম আছে উইলিয়াম নেবরের কাছে। সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। মনে হচ্ছে ওর সাথে দেখা করে ওর একটা হাত আচ্ছা করে মুচড়ে না দিলে বেরোবে না

ওগুলো।'

সানুকি হাকাওয়াগার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'সাবধান, সুইট ডার্লিং! পেরেকের মত শক্ত লোক!'

'চিন্তা নেই,' বলল রানা। নেমে পড়ল টেবিল থেকে। 'দরকার মনে করলে হাতুড়ি হয়ে যাব। চলি এখন, দোস্ত। নেবরের সাথে মোলাকাতটা সেরে ফেলি আজই।' চোখের ইঙ্গিত করল। 'ফিল্মটা খুলে দাও।'

'সে কি!' আকাশ থেকে পড়ল সানুকি। 'তোমার সাথে লাঞ্চ খাব বলে বিদায় করে দিলাম মেয়েটাকে। এতদিন পর দেখা, চলি বললেই হলো?'

'আরেকদিন আসব, সানুকি। আজ যাই। তাড়া আছে। তোমার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ফিল্মটা রিওয়াইণ্ড করে রানার হাতে দিল সানুকি।

'ঠিক আছে, ঘোড়ায় চড়ে এসেছ যখন, ঠেকাব না। তবে আর কিছু দরকার হলে টেলিফোন করতে ভুলো না।'

দরজার দিকে এগোল ওরা। বল্টু খুলে বেরিয়ে গেল করিডরে।

পর্দার আড়াল থেকে পা টিপে বেরিয়ে এল জিন্নাত আযমী। সবার অলক্ষ্যে দ্রুতপায়ে চলে এল ড্রেসিংরুমের দরজার কাছে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কেউ নেই। চট করে ঢুকে পড়ল ড্রেসিংরুমে।

দরদর ঘাম ঝরছে মোহাম্মদ ইসমাইলের চিবুক বেয়ে। বার বার ঘড়ি দেখছে সে। ব্রিগেডিয়ারকে পায়নি সে ফোনে, সিকান্দার বিল্লাহ ধরেছিল টেলিফোন। এক্ষুণি লোক পাঠাচ্ছি বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল বিল্লাহ, কিন্তু কোথায়? এখন পর্যন্ত কারও পাত্তা নেই।

কেউ এসে পৌছবার আগেই যদি বেরিয়ে এসে গাড়ি নিয়ে চলে যায় মাসুদ রানা? ওকেই তো দায়ী করবে ব্রিগেডিয়ার। কোন কৈফিয়ৎ দিয়েই সন্তুষ্ট করতে পারবে না সে তারিক আখতারকে। কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না লোকটা। মহা বিপদে পড়বে সে হাত ফস্কে রানা বেরিয়ে গেলে।

ঘামে ভেজা নোংরা রুমাল বের করে মুখ মুছল ইসমাইল। জিভটা শুকিয়ে এসেছে ওর, বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ হাতুড়ি পিটছে হৃৎপিণ্ডটা। একবার এ পায়ে একবার ও পায়ে ভর দিয়ে অপেক্ষা করছে সে অস্থির চিত্তে।

ঠিক এমনি সময়ে হাকাওয়াগার স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

মনে মনে সিকান্দার বিল্লার পাঠানো লোকের প্রত্যাশা এত বেশি করে করছিল ইসমাইল যে রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল। রানাকে আশা করেনি বলে সে খেয়ালও করেনি যে আঙিনার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও বেকায়দা ভঙ্গিতে, নইলে আঙিনার এদিক ওদিক বেশ কয়েকটা দরজা রয়েছে, বারান্দা রয়েছে, একটু আড়ালে দাঁড়ালে ওকে দেখতেই পেত না

রানা। রানাকে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ঝট করে পিছন ফিরল ইসমাইল, পা বাড়াল সামনে। স্বাভাবিকভাবে পিছন ফিরলে রানা হয়তো খেয়ালই করত না, কিন্তু এই ঘাবড়ে যাওয়াটা নজর এড়াল না ওর। মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল সে ভিতর ভিতর, মোটাসোটা টাকপড়া লোকটাকে হঠাৎ পিছন ফিরতে দেখেই ছোট হয়ে গেল চোখজোড়া।

নেবরের স্টুডিয়োটা সানুকির স্টুডিয়ো থেকে খুব দূর না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পার্কিং স্পেস পাওয়া যাবে কি যাবে না ঠিক নেই, কাজেই এটুকু রাস্তা হেঁটেই যাবে সে। লম্বা পা ফেলে এগোতে গিয়ে ধাক্কা খেল সে ইসমাইলের পিঠে। ডাইনে যাবে না বাঁয়ে যাবে ঠিক করে উঠতে পারছে না মোটা লোকটা।

পরস্পরের দিকে চাইল দুজন।

মুহূর্তে চিনতে পারল রানা। লোকটাকে কোথায়, কবে, কি অবস্থায় দেখেছে পরিষ্কার মনে পড়ল ওর। আট বছর আগে দেখেছিল ওকে করাচীতে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ওয়াচার ছিল লোকটা। নাম খুব সম্ভব মোহাম্মদ ইসমাইল।

'মাফ করবেন,' বলল রানা। ইসমাইলকে, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল বুলেভার্ড পাস্তুরের দিকে লম্বা পা ফেলে।

আকস্মিক সৌভাগ্যে বিস্মিত হলো ইসমাইল, খুশি মনে পিছু নিল রানার। চিনতে তো পারেইনি, গাড়িতে না উঠে অনুসরণের সুযোগ দেয়ায় রীতিমত কৃতজ্ঞ বোধ করল সে রানার প্রতি। আর একটু আস্তে হাঁটলে অবশ্য ভাল হত, ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁসফাঁস করে ছুটতে হচ্ছে ওর, ধাক্কা লেগে যাচ্ছে রাস্তার লোকের গায়ে, তবু খুশি হলো সে মনে মনে—যাই হোক, হারিয়ে ফেলবার ভয় নেই আর এখন।

রানা ভাবছে: এর মানেটা কি? দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল, নাকি পাকিস্তানীরা টের পেয়ে গেল শংকরলালজীর এই হঠাৎ আগমন? পিছু লেগে গেছে ওরা?

বুলেভার্ড (বুলভার) পাস্তুরে পৌঁছে একটা ব্যস্ত রেস্তোরাঁর সামনে থামল রানা। ব্যাপারটা একটু ভালমত বুঝে নেয়া দরকার। তার আগে, বেলা হয়ে গেছে, লাঞ্চটা সেরে নিলে মন্দ হয় না। এদিক ওদিক চেয়ে ভিতরে ঢুকল রানা, প্রশস্ত ঘরটার কোণের দিকে খালি টেবিল দেখে এগোল সেদিকে।

রানাকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখল ইসমাইল, বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল খানিক। ওরও ক্ষিধে লেগে গেছে ভীষণ। রেস্তোরাঁর বাইরে পাতা একটা খালি টেবিলের দিকে এগোল সে পায়ে পায়ে। এখান থেকে বেরোবার দরজাটা দেখা যায় পরিষ্কার, রানা বেরোলে দেখতে পাবে সে, কিন্তু খাবারের অর্ডার দেয়া কি ঠিক হবে? যদি খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে আসে মাসুদ রানা? সাত পাঁচ ভাবছে, এমনি সময়ে গরম স্টেকের গন্ধ নাকে আসতেই আর সামলাতে পারল না সে নিজেকে, হাঁউমাউখাঁউ করে উঠল পেটের ভিতরটা, ধুপধাপ টেবিল চাপড়ে

ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অর্ডার দিল সে লেগার এবং বীফ রোলের।

রানা যেখানে বসেছে সেখান থেকে বাইরের আঙিনার বেশ কিছুটা অংশ দেখা যায়। ইসমাইলকে দেখতে পেল সে। মুচকি হেসে স্টেকের অর্ডার দিল।

ভুল জায়গায় বসেছে ইসমাইল, বুঝতে পারল রানা। ওর পক্ষে ওখান থেকে বেরোবার দরজার উপর নজর রাখাই শুধু সম্ভব, রানাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। এই সুবিধেটুকুর সদ্ব্যবহার করল সে। আলগোছে গিয়ে ঢুকল টেলিফোন কিওস্কে, ডায়াল করল জটিলেশ্বরের নাম্বারে।

আসমা শেরির বেড়া ডিঙিয়ে জটিলেশ্বরের কানেকশন পেয়ে রানা বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের পাকিস্তানী বন্ধুরাও এই ফিল্মটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ইসমাইল ঘুরছে আমার পিছন পিছন।'

ইসমাইল কে সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করল না জটিলেশ্বর। ভাল করে চেনে সে প্যারিসে কার্যরত প্রত্যেকটি পাকিস্তানী এজেন্ট এবং ওয়াচারকে। খবরটা শুনেই আঁৎকে উঠল সে।

'মাই গড! ফিল্মটা আপনার সাথে রয়েছে?'

'হ্যাঁ। পকেটে।'

'আপনি কোথা থেকে বলছেন এখন?' আর এক পর্দা চড়ে গেল জটিল রায়ের গলা।

ঠিকানাটা বলল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'এক্ষুণি দুজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আপনাকে গার্ড দেবে ওরা। যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন আপনি।'

'খুব ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?' বলল রানা। 'তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাবেন না। আমার নিরাপত্তার জন্যে আপনি লোক পাঠালেই ব্যাপারটা অফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে। সেটা কি ভাল হবে?'

রানার কথার যৌক্তিকতা বুঝতে পারল জটিল রায়, কিন্তু উদ্বেগ তাতে কমল না।

'কিন্তু…কিন্তু ওরা যদি আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেয় ওটা?'

হেসে উঠল রানা। 'ছেলের হাতের মোয়া নাকি? এই দিন দুপুরে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু কেড়ে নেবে, এমন বাপের ব্যাটা পয়দা হয়নি এখনও। খামোকা বাজে চিন্তা না করে অন্য লাইনে মাথাটা একটু ঘামান। ওরা এই ব্যাপারে ইন্টারস্টেড, কথাটা আপনাকে জানানো দরকার মনে করে রিং করলাম, আপনার সাহায্যের জন্যে নয়। আরও দিক থাকতে পারে যেগুলো আপনার সামলানো দরকার।' কথাটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

নিজের টেবিলে ফিরে এসে দেখল, এসে গেছে স্টেক। গরম ভাপ উঠছে। গন্ধটাও চমৎকার। ধীরে সুস্থে তৃপ্তির সাথে লাঞ্চ সারল রানা, মোটা অংকের বকশিশ সহ বিল শোধ করল, তারপর স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল

বাইরে।

কয়েক গজ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল ওকে ইসমাইল, তারপর চলল পিছন পিছন। পেটের দাবি মিটে যাওয়ায় মনের জোরও বেড়ে গেছে ইসমাইলের। রানা ওকে চিনতে পারেনি দেখে নিশ্চিন্তে আশপাশের লোকদের কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে, সবার বিরক্তি উৎপাদন করে চলেছে সে ঘর্মাক্ত কলেবরে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খসিয়ে দিল রানা ইসমাইলকে। মোড়ের কাছে একটা রেডিওর দোকানের সামনে ছোটখাট একটা ভিড়। কাঁচের জানালার ওপাশে রাখা টেলিভিশন সেটে প্রোগ্রাম দেখছে পনেরো-বিশজন ভিড় করে। লোকগুলোকে পেরিয়েই বিদ্যুৎবেগে বাঁয়ে সরে গেল রানা, চট করে একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল একটা অফিসবিল্ডিঙের করিডরে। এতই দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মোহাম্মদ ইসমাইল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে ফুটপাথের মাঝখানে। গেল কোথায়! রানাকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন? ওকে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে লোকজন। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে আতঙ্কিত ইসমাইল ছুটল সামনের দিকে হাঁসফাঁস করতে করতে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে। পাগলের মত ডাইনে বাঁয়ে চাইতে চাইতে দরজাটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সে।

করিডরটা এপাশের রাস্তা থেকে ওপাশের রাস্তা পর্যন্ত সরু একটা গলির মত। দুপাশে অসংখ্য ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস। হাসিমুখে ওদিকের রাস্তায় বেরিয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল রানা। একাধিক অনুসরণকারী থাকতে পারে মনে করে বারকয়েক বাস বদল করল সে, বারকয়েক ট্যাক্সি বদল করল। বিশ মিনিট পর নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা গিয়ে উঠল সে জটিলেশ্বরের অফিসে।

পাঁচ

প্যারিসের পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলোর বেশির ভাগেরই সবচেয়ে উপরের তলায় 'চেমব্রেস ডি বন' বলে অনেকগুলো ছোট ছোট খুপরি ঘর আছে। সেকালে চাকরবাকরদের থাকবার জন্যে তৈরি হত এগুলো। এখন চাকর পাওয়া দুষ্কর, নিচতালার ভাড়াটে নিজেরাই রান্নাবান্না এবং বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই এই খুপরি ঘরগুলো বাড়িওয়ালা বা ওয়ালী ভাড়া দেয় ছাত্র-ছাত্রী বা গরীব লোকদের।

রিউ সিঙ্গারের এই রকম একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের দশতলায় থাকে জিন্নাত আযমী ছোট্ট খুপরি ঘর নিয়ে। ঘরের একটা অংশে টয়লেট বেসিন আর একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, একপাশে একটা সিঙ্গল বেড খাট। এছাড়া রয়েছে আরও দুটো

আসবাব—একটা পায়া মচকানো আর্মচেয়ার, আর একটা প্লাস্টিক ওয়ারড্রোব। এতেই ভর্তি হয়ে গেছে ঘরটা, আর কিছু রাখবার জায়গা নেই। খাটের ওপাশে একটা কাঁচের জানালা। জানালার তাকে রাখা ছোট্ট একখানা ট্র্যানজিস্টার রেডিও। জিনা যতক্ষণ জেগে থাকে, সর্বক্ষণ সুইং মিউজিক বাজে তাতে। খাটের নিচে একখানা ইজেল, ধূলিমলিন গোটাকয়েক ক্যানভাস, আর রঙ-তুলি।

দশ তালার উপরে এই রকম আরও আটটা কামরা আছে। স্বল্প আয়ের জনাকয়েক বুড়োবুড়ি থাকে সেসব ঘরে। রোজগারের জন্যে সারাদিন এত পরিশ্রম করে ওরা, যে বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীর খোঁজ নেবার মত শক্তি বা ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। ওরা কেউ হয়তো জানেও না যে জিনার ঘরে জিনা একা থাকে না, ওর এক পুরুষ বন্ধু আবু হানিফও থাকে।

বছর দুয়েক আগে প্যারিসেরই কোন এক পট-পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল ওদের। একনজরেই পছন্দ করেছিল জিনা এই ছোকরাকে। লম্বা চুল আর সবুজ সানগ্লাস মুগ্ধ করেছিল ওকে। মাস তিনেক আগে রাস্তায় আবার দেখা। ছোকরা যখন নিজের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে ওকে জিজ্ঞেস করল ওর জানাশোনা কোথাও কম ভাড়ার কোন কামরা আছে কিনা, তখন বিনা দ্বিধায় প্রস্তাব দিল সে, যতদিন না ওরকম একটা ঘর পাওয়া যাচ্ছে ততদিন ইচ্ছে করলে ওর সাথেই থাকতে পারে হানিফ।

পরদিনই একখানা ভাঙাচোরা সুটকেস নিয়ে এসে উঠেছে হানিফ এই কামরায়। কি করে জিজ্ঞেস করায় উত্তরে হেসেছে, 'ভয় নেই, ঘর ভাড়ার অর্ধেকটা দিতে পারব।' প্রশ্নটা সেজন্যে করেনি, আসলেই জানতে চায় কি ধরনের কাজ করে ও, এ কথা বলায় রহস্যময় হাসি হেসে বলেছে, 'প্লেস ডি লা ম্যাডিলিনে নোংরা পোস্টকার্ড বিক্রি করি। পুলিসের ভয় একটু আছে অবশ্য, কিন্তু ভাল পয়সা পাওয়া যায় এতে। বিদেশী ট্যুরিস্টদের একটু আভাস দিলেই একেবারে লুফে নেয় এসব।'

জিনা বিশ্বাস করেনি এসব কথার একবিন্দুও। কারণ কোন কোনদিন ঘরে ফিরতে রাত তিনটে বেজে যায় হানিফের, কোন কোনদিন কার যেন চোদ্দগুষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে ভোর পোনে ছ'টায় কাপড় পরে বেরিয়ে যায় বাইরে। বেআইনী কিছু করে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর, তবে কাজটা পোস্টকার্ড বিক্রি জাতীয় কিছু না, তারচেয়ে কঠিন কিছু—ড্রাগস বা ওই জাতীয় কিছু হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না জিনার। প্রথম দু'মাস ভাড়ার অর্ধেক দেয়ার পর নিজেই পুরোটা দিতে শুরু করেছে হানিফ, তাছাড়া একসাথে কোন রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে বিলটা বরাবর দিচ্ছে হানিফই—কাজেই সন্তুষ্ট চিত্তে থাকতে দিয়েছে সে ওকে।

বিছানাতেও ছোকরা এক্সপার্ট। ভালবাসার নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে চলেছে সে, আজ পর্যন্ত পুরানো হয়ে যায়নি। মোটামুটি আগের চেয়ে অনেক ভাল

আছে জিনা এখন, অবিবাহিত দাম্পত্যজীবন মন্দ কাটছে না। বেশ সহজ একটা সম্পর্ক বজায় রয়েছে ওদের মধ্যে। মাঝে মাঝে অবশ্য হঠাৎ চটে ওঠে হানিফ, মুহূর্তে খেপে লাল হয়ে যায় সামান্য কোন কারণেই—কিন্তু সেটাও তেমন কোন সমস্যা নয়, ধারাটা বুঝে নিয়েছে জিনা। একবার আঙুলের নখ কাটা নিয়ে লেগেছিল দুজনের মধ্যে। টিটকারীর সাথে কি একটা কথা বলায় এক সেকেণ্ডের মধ্যেই জানোয়ার হয়ে গেল ছোকরা, উদোম পাছার উপর এমন জোরে এক চাপড় কষাল যে চিৎকারের চোটে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে টিটকারী বা ঘ্যানর ঘ্যানর এড়িয়ে চলে জিনা, গোলমালও বাধে না কোন।

স্কলারশিপটা যতদিন ছিল বেশ ছিল জিনা। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যখন পাস করতে পারল না, তখনও বাপের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখে, এই আর কদিনের মধ্যেই ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি বলে মাঝে মাঝেই টাকা আনাত সে—কিন্তু মোটর দুর্ঘটনায় বাপের মৃত্যু ঘটায় টাকা আসবার সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে ওর। অথচ দেশে ফিরবার কোন ইচ্ছে বা তাড়া নেই ওর মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব, পার্টি-পার্টি, হৈ-হট্টোগোলে বেশ কেটে গেল কিছুদিন। তারপর টাকার অভাবে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের বিছানায় রাত কাটাতে শুরু করল। বার দুই পুলিসের ঝামেলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে যখন অন্য পথ খুঁজছিল, ঠিক সেই সময়ে পরিচয় হয়ে গেল সানুকি হাকাওয়াগার সাথে। প্রতিমাসে হাজার ফ্র্যাংকের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এতে খাওয়া থাকার মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে গেল ওর। যার-পর-নাই খুশি হয়ে উঠল জিনা: কারণ এটুকুর নিশ্চয়তাই প্রয়োজন ছিল ওর, জামা-কাপড় বা কসমেটিকসের জন্যে চিন্তা ছিল না, গত কয়েক বছর ধরে শপ লিফটিঙে হাত পাকিয়ে ফেলেছে সে—চলতে থাকল সেই রকমই। হানিফ এসে জোটায় আর্থিক দিক থেকে আরও একটু সচ্ছল হয়েছে সে, বিদেশী ট্যুরিস্টদের সাথে ঘুমানোটা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ছোটখাট চুরি-চামারি চলছে আগেরই মত।

ঘরে ফিরে রানার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল জিনা। পুরুষ বটে! হোক বাঙালী, কিন্তু যেমন-তুখোর চেহারা, তেমনি স্মার্ট। একেবারে লেটেস্ট মডেল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে ওর। শেয গ্যারিনের মত রেস্তোরাঁয় খাবে সে আজ মাসুদ রানার সাথে! হ্যাণ্ডব্যাগটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে প্রথমেই প্লাস্টিক ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। শেয গ্যারিনে পরে যাওয়ার মত উপযুক্ত কাপড় আছে ওর? স্কার্ট পরবে, না সালোয়ার কামিজ, না শাড়ি? লোকটা বাঙালী যখন, শাড়িই বোধহয় ঠিক—মনে মনে ভাবল জিনা। সুইস সিল্কের লাল ডোরাকাটা শাড়িটা বের করে আনল সে, এর সাথে ম্যাচ করা ব্লাউজ বের করল। কোন্ সেন্টটা মাখবে, কোন্ স্যাণ্ডেলটা পরে যাবে সেটাও স্থির করে ফেলল সে মনে মনে। তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

চোখ বুজতেই রানার চেহারাটা ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। পুরুষ বটে! হানিফও লম্বা, পাতলা-সাতলা, তরুণ, দেখতে ভাল, আত্মবিশ্বাসী, বেপরোয়া।

কিন্তু এই লোকটার সাথে কোন দিক থেকেই লাগে না। এর মধ্যে আলাদা একটা ধার রয়েছে। এক কথায় চৌকশ। এই লোকটাও সময় বিশেষে হানিফের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, টের পেয়েছে জিনা, কিন্তু এর মধ্যে অন্য রকম একটা সফিসটিকেশন রয়েছে, ওর মত ওরকম চাঁছাছোলা নয়। কথাবার্তার মধ্যেও রয়েছে একটা মার্জিত, ভদ্র ভাব। তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও। মাঝে মাঝে হানিফের লম্বা চুল আর সবুজ সানগ্লাস বিরক্তিই উৎপাদন করছে ওর আজকাল। মাঝে মাঝে চুলে একটু আধটু সাবান-টাবান দিলেও এক কথা ছিল, কিন্তু এ লোক গোসলই করে পনেরো বিশদিন পর পর।

চুলের কথা মনে আসতেই লাফিয়ে উঠল জিনা। ওয়াশ বেসিনের উপরে টাঙানো আয়নায় মাথাটা এদিক ওদিক ফিরিয়ে নিজের চুলগুলো পরীক্ষা করে দেখল। বুঝতে পারল শ্যাম্পুর সময় হয়ে গিয়েছে। গরম পানির কল ছেড়ে বেসিনটা ভরতে শুরু করল সে।

সাদা একটা প্যান্টি আর ব্রা পরা অবস্থায় বেসিনের উপর ঝুঁকে চুল ভিজাচ্ছিল জিনা, অসংখ্য সুতানলী সাপের মত কিলবিল করছিল চুলগুলো বেসিনময়, এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল আবু হানিফ। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা হানিফকে প্রলুব্ধ করতে পারে মনে করে চট করে বলল জিনা, 'খবরদার! আমাকে ছুঁলেই এখন পানি ছিটাব।'

কিন্তু দেখা গেল ছোঁয়াছুঁয়ির মুডে নেই হানিফ এখন। গোমড়া মুখ নিয়ে বসল খাটের একপাশে। অর্লি এয়ারপোর্টে গিয়ে আশা ভঙ্গ হয়েছে বেচারার। শুধু তাই নয়, বাজে করে বকা দিয়েছে ওকে আজ সিকান্দার বিল্লাহ। পুলিস ব্যারিয়ার পেরিয়ে শংকরলালজীকে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখেই ফোন করেছিল সে অফিসে। ও আশা করেছিল, নয়াদিল্লীর টিকেট কেটে শংকরলালজীর পিছু ধাওয়া করতে হবে ওকে, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যাবে সে লোকটাকে। তাড়া করতে করতে যখন লোকটা হাঁপিয়ে উঠবে…ইত্যাদি। মোটকথা কল্পনার রাশ আলগা করে দিয়েছিল সে শংকরজীর পিছু নিতে বলায়।

অফিসে ফোন করতেই সিকান্দার বিল্লাহ জানতে চাইল শংকরলালজী প্লেনে উঠেছে কিনা। হানিফ বলল—খুব সম্ভব উঠেছে। 'খুব সম্ভব' শুনে খেপে গেল সিকান্দার বিল্লাহ— সম্ভাবনার কথা তোমার কাছে জানতে চাই না আমি। প্লেনে উঠেছে? অসহিষ্ণু কণ্ঠে হানিফ বলছে—দিল্লীর টিকেট থাকলে আমিও ঢুকতে পারতাম পুলিস ব্যারিয়ার ভেদ করে, ওর প্রত্যেকটাকাজের রিপোর্ট দিতে পারতাম আপনাকে। বাইরে থেকে কি করে শিওর হয়ে বলি, বলুন? একথা শুনে অবুঝের মত তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সিকান্দার বিল্লাহ—তোমাকে পুলিস ব্যারিয়ার পার করতে আমার দিল্লীর টিকেট কেটে দিতে হবে? উল্লুক কোথাকার! যতসব গর্দভ এসে জুটেছে আমার এখানে! এই বলে ঝটাং করে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে সে।

চাকরিটা আছে কি নেই, সে ব্যাপারে একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে এসেছে

ঘরে। মনটা বিষিয়ে আছে। ভয়ানক রেগে আছে সে ভিতর ভিতর। কারও কোন সমালোচনা বা কটূক্তি সহ্য করবার মানসিকতা নেই ওর মধ্যে, কিন্তু সিকান্দার বিল্লার বিরুদ্ধে কিছু করবার ক্ষমতাও নেই। তাই টগবগ করে ফুটছে ওর ভিতরটা। মুড নেই।

বেসিনের উপর চুল নিঙড়াচ্ছে জিনা। একটা সিগারেট ধরাল হানিফ। খানিক উসখুস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? তোমার না আজ কাজে যাওয়ার কথা? ঘরে বসে সাজগোজ হচ্ছে যে বড়?'

'হাকাওয়াগার কাছে এক লোক এসেছিল,' বলল জিনা। তোয়ালে দিয়ে চুল জড়াচ্ছে সে। 'দারুণ লোক! আজ আর কাজ করতে রাজি হলো না, কাল যেতে বলেছে আবার। আজ রাতে ডিনারে যাচ্ছি আমি লোকটার সাথে।'

নিরুৎসুক হানিফ চুপচাপ টানতেই থাকল সিগারেট। প্রথমরাতেই নিজেদের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ওরা—যে কোন একজন সঙ্গী বদল করতে পারে যখন ইচ্ছে, যার সাথে খুশি মিশতে পারে। অপরজন কোন আপত্তি করতে পারবে না। কাজেই কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করল না হানিফ।

'স্বপ্নের মত এক লোক!' আবার বলল জিনা। 'অদ্ভুত।'

'ওকে নিয়ে এখানে ফিরছ না তো?' জিজ্ঞেস করল হানিফ। 'আজ রাতে আমি থাকছি খুব সম্ভব।'

'এখানে? খেপেছ তুমি!' কপালে উঠল জিনার চোখ। 'এই ইঁদুরের গর্তে আনব আমি ওকে! সেই ক্লাসের লোক না। শেয গ্যারিনে যাচ্ছি আমরা...ওই রেস্তোরাঁর নামও শোননি তুমি কোনদিন। বিরাট বড়লোকদের রেস্তোরাঁ ওটা।'

'শেয গ্যারিন চেনাতে এসো না আমাকে।' ভিতর ভিতর ছোট্ট একটা ঈর্ষার খোঁচা লাগল হানিফের বুকে। ও কোনদিন ওর কোন বান্ধবীকে ওই রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া লোকটা যে জিনাকে শুধু খাওয়াবেই না, নিজের ঘরেও নিয়ে যাবে, ভাবতে কেমন একটু খারাপও লাগল ওর। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তবে তোমার ভালর জন্যেই বলছি, একটু সাবধানে থেকো। হাকাওয়াগার বন্ধু যখন, নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়, ভাল লোক না।'

'এই লোক খারাপ না,' বলল জিনা। 'খারাপ লোক দেখলেই চেনা যায়। ডিনারের পর আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে অপূর্ব এক ভাস্কর্য দেখাবে বলে কথা দিয়েছে লোকটা। মেল ন্যুড। জীবন্ত!' পিঠের উপর ঝাড়ল সে চুলগুলো। 'টাকাওয়ালা লোক...তোমাদের মত ভ্যাগাবণ্ড না।'

'তা নাহলে তোমার মত ভ্যাগাবণ্ডের সাথে ওর মেলামেশা কেন? দুধে ধোয়াই যদি হবে, তাহলে হাকাওয়াগার মত...'

'সানুকিকে একটা ফিল্ম দেখিয়েছে লোকটা...ব্লু ফিল্ম। ও আসলে গিয়েছিল সানুকির কাছে জানতে, কে তুলেছে ফিল্মটা, অভিনেতা লোকটা কে, এইসব। কেন এসব কথা জানতে চায় আল্লাই মালুম...'

হালকা সবুজ সানগ্লাসের পিছনে সজাগ হয়ে উঠল হানিফের তীব্র চোখদুটো।
'লোকটার নাম জানো?'
'নিশ্চয়ই!' বিস্মিত দৃষ্টিতে হানিফের সানগ্লাসের দিকে চাইল জিনা। 'কি মনে করেছ তুমি আমাকে? নাম না জেনেই হুট করে যে ডাকবে তার সাথেই বেরিয়ে যাব আমি ডিনার খেতে?'
'শুধু ডিনার খেতে কেন, অপরিচিত লোকের সাথে ঘুমাতেও পারো তুমি। যাই হোক কি নাম ওর?'
'ওর নাম দিয়ে তোমার কি দরকার···' হানিফের ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠতে দেখে চট করে বলল জিনা, 'মাসুদ রানা। তোমার হিংসে হওয়ার জন্যে বলছি না, সত্যি তুখোড় এক লোক!'
নামটা শোনামাত্র সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল হানিফের। এই নাম ওর অপরিচিত নয়। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অফিসেই কার মুখে যেন শুনেছিল, খুব সম্ভব মোহাম্মদ ইসমাইল হবে, যে এই নামের তুখোড় এক বাঙালী এজেন্ট আছে—ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারকে পর্যন্ত ঘোল খাইয়ে দিয়েছিল একবার লাহোরে। পার্ক হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় জটিলেশ্বরের হাতে একটা এইট মিলিমিটার মুভি প্রোজেক্টর দেখেছিল ওরা চারজন। জটিলেশ্বর গিয়েছিল মাসুদ রানার হোটেলে, শুনেছে সে। এখন দেখা যাচ্ছে মাসুদ রানা ব্লু ফিল্ম দেখাচ্ছে সানুকি হাকাওয়াগাকে, খোঁজ খবর করছে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো একই সূত্রে গাঁথা বলে মনে হচ্ছে ওর। মাসুদ রানা কি ওদের হয়ে কাজ করছে? আগে জানা দরকার এই লোকটা সেই মাসুদ রানা কিনা, তারপর যোগাযোগ করতে হবে হারামী বিল্লার সাথে।
'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'মাছি গিলে ফেলেছ মনে হচ্ছে?'
'কেমন দেখতে লোকটা? লম্বা, কালো? বাঙালী?'
'কালো ঠিক বলা যায় না। উজ্জ্বল শ্যামলা রঙ। ঠিক আমার মনের মত।'
'দেখতে লম্বা? বাঙালী?'
'হ্যাঁ। দারুণ হ্যাণ্ডসাম।'
প্রবল এক উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল হানিফের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। দুটো চাপড় দিল বিছানার উপর।
'এদিকে এসো। বসো এখানে।'
'ব্যস্ত আছি দেখতে পাচ্ছ না?' আয়নার দিকে ফিরল জিনা। 'যা বলবার বলো, কান দুটো খোলাই আছে আমার, শুনতে···উফ্!'
জিনার পিছন দিকটায় হানিফের হাতের প্রচণ্ড চপেটাঘাত পিস্তলের গুলির মত শব্দ তুলল।
'উউ উউউ! জানোয়ার কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে সে ব্যথার চোটে। বেসিনের দিকে এক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল

হানিফের কণ্ঠস্বর শুনে।

'ভাল চাও তো এখানে এসে বসো, জিনা। তা নইলে কপালে খারাবি আছে তোমার আজ।'

হানিফের মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠল জিনা। ওর রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখে হিংস্র একটা ভাব দেখতে পেল সে। ঠোঁট দুটো খানিকটা সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ভয় পেল।

'ঠিক আছে, আসছি। এর জন্য এত জোরে মারার দরকার ছিল না।' দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে খাটের কিনারায় বসল সে। 'বলো! ইশ্‌শ্‌. ভয়ানক ব্যথা লেগেছে!'

'রানার সাথে হাকাওয়াগার কি কি কথা হয়েছে সব জানতে চাই আমি। কোন কিছু বাদ না দিয়ে গোড়া থেকে বলো। একটা মিছে কথা বললে খুন করে ফেলব।'

'কিন্তু কেন?' অবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে চাইল জিনা হানিফের মুখের দিকে। 'এসব শুনে তোমার…'

চড়াৎ করে আরেকটা চাপড় পড়ল ওর নগ্ন উরুর উপর, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

'বলো!' ছোট্ট একটা গর্জন ছাড়ল হানিফ।

শুধু ব্যথা নয়, রীতিমত ভয় পেয়েছে জিনা। গড়গড় করে বলে ফেলল সবকিছু। সব শুনে ভ্রূ কুঁচকাল হানিফ। 'আজ রাত ন'টার সময় শেষ গ্যারিনে দেখা হওয়ার কথা?'

'হ্যাঁ।' লাল হয়ে যাওয়া উরু ডলতে ডলতে টপ করে একফোঁটা চোখের পানি ফেলল জিনা। 'দেখো, কি করেছ! তোমাকে এখানে জায়গা দিয়ে যে কত বড় ভুল…'

'শাটাপ!' হুঙ্কার ছাড়ল হানিফ। কিছুক্ষণ চিন্তা করল ভুরু কুঁচকে, তারপর বলল, 'তুমি শিওর যে ওটা একটা ব্লু ফিল্ম?'

'ব্লু না রেড জানি না—দুইজনই ন্যাংটো ছিল, ব্যস্ত ছিল বিছানার ওপর।'

উঠে দাঁড়াল হানিফ।

'শোনো। আর একটা শব্দও বের করবে না মুখ থেকে। কারও সাথে কো[illegible] কথা না। বুঝতে পেরেছ?' সানগ্লাস খুলে তীব্র দৃষ্টিতে চাইল সে জিনার চোখে। 'ব্যাপারটা হাসি মস্করা নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বের করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার। কাজেই সাবধান!'

ভিতর ভিতর কুঁকড়ে গেল জিনা। তীব্র দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে সরে বসল খানিকটা।

'কাউকে কিছু বলব না আমি…কসম।'

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই ঘরেই থাকো। কোথাও নড়বে না এখা[illegible] থেকে।'

'ঠিক আছে। থাকব।'

আর একবার কঠোর দৃষ্টিতে জিনাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঝট করে ঘুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল হানিফ। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শোনা গেল, তিন ধাপ করে নামছে একেকবারে।

কি হলো! ভাবল জিনা। খোদা! কি হলো ওর! পাগল-টাগল হয়ে গেল নাকি? এরকম তো করেনি আগে কোনদিন! মনে হচ্ছিল, একটু এদিক ওদিক হলেই খুন করে ফেলবে। এসবের মানে কি?

খেয়াল করল জিনা, কাঁপছে ওর সর্বশরীর। চুলের আগা থেকে টপ টপ পানি পড়ে ভিজছে বেডশীট।

জটিলেশ্বরের অফিসের সামনেও পি.সি.আই. এজেন্ট থাকতে পারে মনে করে মিনিট দুয়েকের হাঁটা-পথ বাকি থাকতেই ছেড়ে দিল রানা ট্যাক্সি। চারটা পাশ দেখে শুনে বুঝে নিয়ে একটা সাইড ডোর দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। পঞ্চমতলায় উঠে আসমা শেরির অফিস কামরাটা খুঁজে নিতে বেশি দেরি হলো না ওর। ঢুকেই ভুবন-ভুলানো হাসি হাসল রানা।

রানাকে দেখামাত্রই টাইপ বন্ধ করে ঝট করে একটা মোটাসোটা রুলার হাতে তুলে নিল আসমা শেরি, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখল ওকে আপাদমস্তক। ও জানে, সাবধান না হলে এই লোকের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারবে না। বেশ কয়েকবার পা পিছলাতে গিয়েও সামলে নিতে পেরেছে সে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু এমন সব কথা বলে লোকটা, যে মনটা স্থির রাখা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

'হেল্লো, বিউটিফুল!' বলল রানা, কিন্তু রুলারটা দেখে বেশি কাছে এগোতে সাহস পেল না। 'অনেকদিন পর দেখা। আমার অভাবে তোমার যে কত কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি। চোখমুখ একটু যেন শুকনো শুকনো লাগছে। কিন্তু কি করব বলো, এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে...'

ইন্টারকমের সুইচ টিপে দিল আসমা শেরি। চট করে রানা বলল, 'কাল...পরশু কোন একদিন কোথাও একসাথে ডিনার খেলে কেমন হয়?'

জবাব না দিয়ে ইন্টারকমে বলল শেরি, 'মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন, স্যার।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' উত্তর এল সাথে সাথেই।

সুদৃশ্য একটা আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখাল আসমা শেরি। 'ঢুকে পড়ো, রোমিও।'

দুঃখিত ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা।

'শুধু যদি বুঝতে পারতে কি হারাচ্ছ! তোমার একটা রাত আমি সারাজীবনের সুখস্মৃতি করে দিতে পারতাম।'

'মেয়ের অভাব নেই,' নিরুৎসুক কণ্ঠে বলল শেরি। 'উনি অপেক্ষা করছেন।' রুলারটা নামিয়ে রাখল সে হাতের কাছে।

'মেয়ে তো অনেকই আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু তোমার মত আর একটাও দেখাতে পারবে?'

টাইপ শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানাকে এক পা এগোতে দেখে চট করে রুলারটা তুলে নিল সে আবার।

'সোজা ভেতরে গিয়ে ঢোকো!' ভুরু কুঁচকাল আসমা। 'আর একটা কথা বললেই বাড়ি লাগাব।'

'রেগে গেলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়।'

ঝটাং করে দরজা খুলে গেল। মুখ বের করল জটিলেশ্বর।

'দেরি কিসের? চলে আসুন, ভেতরে চলে আসুন।'

ভিতরে গিয়ে ঢুকল রানা। ভিজিটার্স চেয়ারে আরাম করে বসে পায়ের উপর পা তুলে সিগারেট ধরাল।

'আপনি ঠিক জানেন আপনাকেই ফলো করছিল ইসমাইল?' প্রথমেই কাজের কথায় এল জটিলেশ্বর।

'অবশ্যই,' বলল রানা, পকেট থেকে ফিল্মটা বের করে রাখল টেবিলের উপর। 'তালাচাবি মেরে রেখে দিন এটা। পাকিস্তানীরা যখন আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এ ফিল্ম সাথে রাখা আর তাজা ডিনামাইট রাখা এক কথা।'

'আপনার কি ধারণা—এয়ারপোর্টেই ধরা পড়ে গেছে শংকরলালজী ইসমাইলের চোখে?'

'আমার তো তাই মনে হয়।' লম্বা করে একটা টান দিল রানা সিগারেটে, সরু করে ধোঁয়া ছাড়ল ঠোঁটের কোণা দিয়ে। 'ভাবছি, পুলিসকে খবর দিল না কেন ওরা। এক টেলিফোনেই তো চিৎ করে দিতে পারত ওরা শংকরলালজীকে। একে ছদ্মবেশ, তার ওপর জাল পাসপোর্ট। আসল লোককে ছেড়ে আমার পেছনে ঘুরে কি লাভ ওদের?'

'ঠিক এই কথাটাই ভাবছি আমি সেই থেকে,' বলল জটিলেশ্বর। 'নেহায়েত সৌভাগ্য ছাড়া আর কি ভাবব বুঝতে পারছি না। চিনে ফেলেছে, ইচ্ছে করলেই ধরিয়ে দিতে পারে, অথচ তা না করে আপনার পেছনে ঘুরছে, কেন শংকরজী প্যারিসে এসেছিল সেটা জানার চেষ্টা করছে। কেন?'

'সম্ভবত শংকরলালজীর মার্কিন ঘেঁষা নীতির পেছনে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ওদের। উনি প্রধানমন্ত্রী হলে ওদের অনেক সুবিধে। কাজেই কোনরকম বাধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়নি। তাই বলে এই নয় যে তাকে ব্ল্যাকমেইল করবার মত কোন তথ্য-প্রমাণ হাতে পেলে ছেড়ে দেবে ওরা। ওরা যদি মনে করে ব্যাপারটা গুরুতর কিছু, তাহলে সানুকির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে দ্বিধা করবে না।'

বারকয়েক চোখ মিটমিট করল জটিলেশ্বর, একটু ভেবে-চিন্তে বলল, 'শংকরলালজীর পেছনে পাকিস্তানী সমর্থন রয়েছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি ধরে নিচ্ছি, কোন কারণে ওঁকে ছেড়ে ফিল্মটার প্রতিই আগ্রহী হয়ে উঠেছে

ওরা। প্রবল চাপের কথা বলছিলেন, সানুকিটা কে?'

সানুকি হাকাওয়াগার পরিচয় দিল রানা। তারপর বলল, 'ছবিটা ওকে না দেখিয়ে উপায় ছিল না। এছাড়া আর কোনভাবে এই ফিল্মের ক্যামেরাম্যানকে চিনবার রাস্তা ছিল না। মেয়েটাকে অবশ্য চিনতে পারেনি সানুকি, কিন্তু ফটোগ্রাফার এবং অভিনেতার ব্যাপারে সামান্য আলো দেখাতে পেরেছে। কিন্তু আমি ভাবছি, সানুকি নরম লোক, চাপে পড়লে এই আলোটা পাকিস্তানীদেরও দেখিয়ে দেবে। আর খানিক এগোলেই আসল ব্যাপার বুঝে নিতে কোনই অসুবিধে হবে না ওদের। তারপর শংকরজীকে বড়শীতে গেঁথে নেয়া ওদের পক্ষে অতি সহজ কাজ।'

কয়েক সেকেণ্ড সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে নিভু নিভু চুরুটটা টানল জটিলেশ্বর। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কথাটা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে অফিশিয়াল কিছু করবার উপায় নেই, মিস্টার রানা। পুরোটা ব্যাপারেই আপনার ওপর নির্ভর করছি আমি। এই ফটোগ্রাফারটাকে প্রোটেকশন দেয়ার কি ব্যবস্থা? আপনি পারবেন ওদিকটা সামলাতে?'

'না পারার কোন কারণ দেখি না,' বলল রানা। 'জনাচারেক ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু তার আগে আমার প্রথম ইনস্টলমেন্টটা চুকিয়ে দিন, এ ব্যাপারে পুরো মনোযোগ দেয়ার আগে টাকাগুলো আমার হাতে আসা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। ড্রয়ার টেনে একটা মোটাসোটা খাম বের করল জটিলেশ্বর, ধুপ করে ফেলল সেটা রানার সামনে টেবিলের উপর। 'একশো ডলারের তিনশোটা নোট রয়েছে এতে—পুরো ত্রিশ হাজার।'

হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিল রানা, নোটগুলো বের করে তিন ভাগ করে রাখল জ্যাকেটের তিন পকেটে। হাসল। 'দিন, টেলিফোনটা এদিকে দিন।' রিসিভার কানে তুলে নিয়ে আসমাকে বলল লাইনটা ডিরেক্ট করে দিতে, ডায়াল টোন পেয়ে একটা বিশেষ নাম্বারে রিং করে নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। আবার হাসল। 'নিরাপদ হয়ে গেল সানুকি হাকাওয়াগা। কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভব হলে শংকরলালজীকেও আপনার একটু সাবধান করে দেয়া দরকার। ওঁর জানা উচিত যে পাকিস্তানীরা লেগে গেছে পেছনে।'

'কিভাবে? কোডেড কেব্‌ল্ পাঠিয়ে কোন লাভ নেই, কোড ব্রেক করবার সাধ্য তার নেই। সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের কোন উপায় নেই আমার। যতক্ষণ না সে আমার সাথে যোগাযোগ করছে ততক্ষণ কিছুই জানাতে পারছি না আমি তাকে। মুশকিল হচ্ছে, আমি যাই করতে যাই না কেন ব্যাপারটা অফিশিয়াল হয়ে যাবে, বিপদে কেবল সে-ই পড়বে না, আমিও পড়ব।'

কয়েক সেকেণ্ড অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষল রানা, তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি, টাকাটা আমার রীতিমত পরিশ্রম করে উপার্জন করতে হবে।

দুটো দলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে আমাকে। যতটা ভেবেছিলাম ততটা সহজ হবে না কাজ উদ্ধার করা।'

কোন কথা বলল না জটিল রায়, গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল, 'আর একটা কথা। আসমার পিছনে খামোকা সময় নষ্ট করছেন আপনি। অত্যন্ত সিরিয়াস মেয়ে ও। ও সব হালকা আমোদ-ফুর্তির অনেক উর্ধ্বে! কাজ ছাড়া বোঝে না কিছুই। ওর পিছনে লেগে কোন লাভ হবে না।'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। 'অবাক করলেন, মিস্টার রায়। আমি ভেবেছিলাম আপনিই এসবের উর্ধ্বে! আপনি যে আবার এ নিয়ে মাথা ঘামান, জানতাম না। শুনুন, বাড়িতে কুল গাছ লাগালে পাড়ার ছেলেরা ঢিল মারবেই, ও ঠেকানো যাবে না। যতক্ষণ কমপ্লেন না পাচ্ছেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এতে কুল গাছের তেমন কোন আপত্তি নেই। অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না। ছেলেরা সাবধানেই ঢিল মারবে যাতে আপনার জানালার কাঁচ ভেঙে কানডলা না খেতে হয়।' দরজার দিকে এগোল রানা। 'চলি এখন, শীঘ্রি দেখা হবে আবার।'

রানাকে দেখামাত্রই রুলারটা তুলে নিল আসমা শেরি।

ধীর পায়ে ওর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হাসল ভুবন-ভুলানো হাসি।

'আমার বাবা বলতেন, সুন্দরী মেয়ে দেখে ভয় পাসনে কোনদিন, তুই এক পা এগোলে দেখবি ও তোর দিকে দশ পা এগিয়ে এসেছে। সেই হিসেবে তোমার ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ কদম ডিউ হয়ে গেছে। আর কত কষ্ট করবে? শেষে তো দৌড়েও কূল পাবে না।'

রুলারটা দিয়ে লিফটের দিকে ইঙ্গিত করল আসমা শেরি।

দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা এপাশ ওপাশ।

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসিব ফিরে, ধানসিড়িটির তীরে—হয়তো মানুষ নয়...'

পিছনের দরজাটা খুলে গেল, মাথা বের করল জটিলেশ্বর।

'কি ব্যাপার, আপনি যাননি এখনও?'

'না। মিস শেরি একটা গল্প বলছিল, তাই শুনছিলাম। আপনি আরও কিছু বলবেন?'

কটমট করে রানার দিকে একবার চেয়ে টাইপে মন দিল আসমা শেরি। বাঁকা হাসি হাসল জটিলেশ্বর।

'না। আমি ভাবলাম আপনাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দেব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লিফটের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল জটিলেশ্বর। টাইপ করতে করতে মুচকি হাসল আসমা শেরি।

*

ডেস্কের ওপাশে ভুরু-কুঁচকে বসে আছে সিকান্দার বিল্লাহ টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে।

'কি বললে? মাসুদ রানা?'

'ইয়েস, সার।' হানিফের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপাশ থেকে।

দু'মিনিট চুপচাপ শুনল বিল্লাহ। খুশি হয়ে উঠেছে সে ভিতর ভিতর। রানাকে হারিয়ে ফেলে ইসমাইল যখন টেলিফোন করেছিল তখন সামনে এগোবার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকান্দার বিল্লার। হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করে শংকরজীকে ঘাঁটাতে বারণ করে দিয়েছে তারিক আখতার। কিন্তু সেই সাথে বলেছে রানার পিছু যেন ছাড়া না হয়, ব্যাপারটা কী জানতে হবে। লিংক হারিয়ে গিয়েছিল। এই লম্বাচুলো, সবুজ সানগ্লাস পরা বিদঘুটে ছোকরা নতুন আর এক পথ বের করে ফেলায় ধন্যবাদ জানাল সে ভাগ্যকে। ঠিক করল বেতন বাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে সে এই ছোকরার।

'এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায়?' সব শুনে জিজ্ঞেস করল বিল্লাহ।

'কোন্ মেয়েকে বিশ্বাস করা যায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল হানিফ। 'জোর আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি ওর মধ্যে, কাঁপ উঠে গেছে ওর সারা শরীরে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে এ-ভয় বলা যায় না।'

'ওর বিরুদ্ধে এমন কিছু তোমার আছে, কোন তথ্য বা প্রমাণ, যা দিয়ে ওর ভয়টা বজায় রাখা যায়?'

'না, স্যার। তবে ছিঁচকে চুরির অভ্যাস আছে ওর। দোকান থেকে এটা ওটা প্রায় নিয়ে আসে চুরি করে।'

'প্রমাণ আছে কোন?'

'ঘরভর্তি প্রমাণ আছে। ওর ঘরের নব্বই ভাগ টুকিটাকি জিনিসই চোরাই মাল।'

'এটা কোন প্রমাণ হলো না। রানা যখন ওর প্রতি কিছুটা দুর্বলতা দেখিয়েছে, আমার মনে হয় ভবিষ্যতেও আমরা ব্যবহার করতে পারব এই মেয়েটাকে। আমাদের হয়ে কাজ করবে ও?'

সামান্য একটু ইতস্তত করল হানিফ।

'আমার মনে হয় না। আসল ব্যাপার হচ্ছে ব্রেন বলতে কিচ্ছু নেই ওর। টাকা, জামাকাপড় আর যৌনসুখ ছাড়া বোঝে না কিছুই। থাকার মধ্যে আছে শুধু শরীরটা। ঘটে যদি খানিকটা বুদ্ধি থাকত...'

'ব্রেন না থাকতে পারে, কিন্তু ওর যেটা আছে সেটা আবার তোমার নেই। তোমার প্রতি মাসুদ রানা আগ্রহী হবে না কোনদিনই। কাজেই শরীরটাও কম দামী অ্যাসেট না। যাই হোক, ওকে বলো দেশের জন্যে কিছু কাজ তার করতে হবে। টাকাও দেব—ছয়শো ফ্র্যাংক করে দেব ওকে মাসে। জানিয়ে দাও, এ প্রস্তাব গ্রহণ

না করে কোন উপায় নেই ওর। যদি আমাদের সাহায্য না করে একদিন ভয়ানক কিছু ঘটবে হঠাৎ—কেউ ঠেকাতে পারবে না। মোটকথা ভয় দেখিয়ে একেবারে ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দাও ওর। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি, স্যার।'

'ঠিক আছে। এইবার শোনো মন দিয়ে…' জিনাকে দিয়ে কি কি করাতে হবে বুঝিয়ে দিল বিল্লাহ হানিফকে। তারপর বলল, 'ওয়েল ডান, মাই বয়। তোমার অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, কিন্তু আগ্রহ আছে—অনেক ভাল করবে তুমি ভবিষ্যতে। অন্তত গর্দভ ইসমাইলের চেয়ে যে তিনগুণ ভাল করবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। যা বললাম সেই মত কাজে লেগে যাও। তোমার বেতন বাড়াবার সুপারিশ করব আমি ব্রিগেডিয়ারের কাছে।'

খুশিতে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে আবু হানিফ। হাসিমুখে নামিয়ে রাখল রিসিভার। খানিক আগের ধমক খাওয়ার কথা ভুলে গেছে সে বেমালুম।

ছয়

শুকুরের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেছে সে আগেই, কাজেই জটিলেশ্বরের অফিস থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হলো না রানার মোটেও। সাইড ডোর দিয়ে আলগোছে বেরিয়ে ট্যাকসি নিল সে, আড়চোখে দেখল পার্কের গেটের কাছে তেমনি পায়চারি করছে পি.সি.আই. এজেন্ট।

তবু বিশ্বাস নেই, আরও কোন ওয়াচার থাকতে পারে মনে করে সোজা ইন্টারপোলের নারকোটিক্স ডিভিশনের চীফ ফিলিপ কার্টারেটের অফিসে গিয়ে উঠল সে প্রথম। বুড়োর হাতে বিশ হাজার ডলার ধরিয়ে দিয়ে, গোটাকয়েক দরকারী কথা সেরে নিয়ে আবার পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ট্যাকসি নিল। এবার সোজা রিউ গ্যারিবালডি।

প্রকাণ্ড এক দালানের চারতলায় উইলিয়াম নেবরের স্টুডিয়ো। বাইরে থেকে দেখতে দালানটা পুরানো ধাঁচের হলেও ভিতরে ঢুকে দেখা গেল একেবারে ঝকঝকে ব্যবস্থা। লেটেস্ট মডেলের এলিভেটরে চড়ে উঠে এল রানা চারতলায়। স্টুডিয়োর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ফটো ইলেকট্রিক সেল চালিত কপাট খুলে গেল আপনাআপনি। করিডরে বিছানো রয়েছে সাদা সুয়েড—তার উপর চমৎকার সোনালি নক্সা আঁকা। কয়েক পা এগিয়ে লাল ভেলভেটের ড্রেপারি করা ছোট একটা লবি পাওয়া গেল—গোটা কয়েক গিলটি করা ফোমের গদি আঁটা আধুনিক ডিজাইনের চেয়ার সাজানো রয়েছে সুন্দর করে, মাঝে একটা তেমনি ঝকঝকে কাঁচঢাকা টেবিল, টেবিলের উপর কয়েকটা ফটোগ্রাফিক ম্যাগাজিন।

চারপাশে একবার নজর বুলিয়েই টের পেল রানা নেবরের স্টুডিয়োর জাঁকজমকের পাশে সানুকিরটা কিছুই নয়। অনেক অনেক বেশি টাকা ঢেলেছে নেবর ওর স্টুডিয়োর শান শওকতের পিছনে। ঠাটবাটের উপরেই আসলে নির্ভর করে খরিদ্দারের আকর্ষণ, শো'র উপর চলে ব্যবসা। মনে হচ্ছে, যে-কোন আসবাবে নাক ঠেকালে কড়কড়ে তাজা নোটের গন্ধ পাওয়া যাবে।

রানা যখন চারপাশে নজর বুলাচ্ছে ঠিক সেই সময় সামনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বয়স্ক এক লোক। লম্বা, মাথায় কালো হ্যাট, গায়ে হালকা ছাই রঙের ওভারকোট। বেপরোয়া একটা অতি বড়লোকি চাল রয়েছে লোকটার হাঁটার ভঙ্গিতে। গ্লাভ পরা ডান হাতে একটা মোটা এনভেলাপ। লোকটার কাপড়ের কাটিং থেকে শুরু করে নাক, মুখ, চোখ, চাহনি, সবকিছু থেকে আভিজাত্যের ছটা বেরোচ্ছে। কিন্তু রানার উপর চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল লোকটা। মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসী ভাবটা পরিণত হলো ভড়কে যাওয়া চঞ্চলতায়। চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে বাইরের দরজার দিকে এগোল লোকটা, কয়েক পা এগিয়ে চট করে আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানার উপর। রানাকে দেখামাত্র হাতের এনভেলাপটা আরও একটু আঁকড়ে ধরতে দেখেই বুঝে গেল রানা ওর ভিতর কি আছে। ভয় পাওয়ার কারণটাও ওর কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গেল। নোংরা ছবি কিনে নিয়ে ফিরছে অভিজাত খরিদ্দার—এই অবস্থায় ধরা পড়ে গেলে জাত, মান সব যাবে লোকটার। লোকটার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই খশখশ আওয়াজ পেল রানা পিছনে।

'কাকে চান, মশিয়ে?'

রুক্ষ নারীকণ্ঠে পিছন ফিরল রানা। পর্দা সরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স্ক এক মহিলা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে। মুখের চেহারায় ভাল মন্দ কোনরকম ভাবের প্রকাশ দেখতে না পেয়ে অবাক হলো রানা। মনে হচ্ছে মুখোশ পরে আছে ভদ্রমহিলা।

'মিস্টার উইলিয়াম নেবরকে,' যথাসাধ্য মিষ্টি হেসে বলল রানা।

দেয়ালের গায়ে লেগে টেনিস বল যেমন ফিরে আসে, দেয়ালের কিছুই হয় না; তেমনি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল রানার হাসিটা—অপরপক্ষ যেমন ছিল তেমনি নির্বিকার।

'মিস্টার নেবর নেই।'

'নেই, মানে, উনি এখানে কাজ করেন না আর এখন?'

'উনি এখন নেই এখানে।'

'তাহলে কোথায় পাব ওঁকে?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল মহিলা রানাকে। জামাকাপড়ের নমুনা এবং চেহারা দেখে সে যে মোটেই মুগ্ধ হতে পারেনি, বুঝল রানা। তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটল মহিলার চোখে।

'সিটিং দিতে চান?'

অটোমেটিক দরজাটা খুলে গেল, আর একজন অভিজাত প্রবীণ লোক ঢুকল ভিতরে। এর গায়েও অঢেল টাকার গন্ধ। রানাকে দেখে সামান্য একটু ইতস্তত করল লোকটা, তারপর দেঁতো হাসি হাসল মহিলার দিকে চেয়ে।

'আহ্ চেরি, আজ ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে,' কথাটা বলেই আবার অস্বস্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে রানার প্রতি।

সামান্য একটু সরে পথ দিল মহিলা লোকটাকে, সামান্য একটু হাসল দয়া করে। বলল, 'ভিতরে গিয়ে বসুন, মশিয়ে। এক্ষুণি আসছি আমি।'

মহিলার গায়ে গা ঘষে ভিতরে গেল লোকটা। ঠাণ্ডা, নিরুৎসুক দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল মহিলা।

'আপনার নামটা দিয়ে যান, মিস্টার নেবর এলে আমি জানাব যে আপনি এসেছিলেন।'

'আমার কাজটা খুবই জরুরী। উনি ফিরবেন কখন?'

'সোমবারের আগে না। আপনার নামটা জানতে পারি?'

'খুব জরুরী কাজ। ওঁর সাথে কোথায় যোগাযোগ করা যায় বলুন তো?'

কটমট করে চাইল মহিলা রানার দিকে। কাঁটাতারের বেড়ার মত হিংস্র হয়ে উঠেছে সে ভিতর ভিতর। রুক্ষ কণ্ঠে আবার বলল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'মোহাম্মদ ইসমাইল। মিস্টার নেবরের সাথে আমার ব্যবসা আছে।'

'উনি ফিরে এলে আমি বলব,' কথাটা বলতে বলতে পিছিয়ে গেল মহিলা, রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না। 'ইচ্ছে করলে সোমবার ফোনে দেখা করবার সময় চাইতে পারেন।' দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বেরিয়ে এল রানা। লিফটের বোতাম টিপে চিন্তা করল এখন কি করা যায়। উইলিয়াম নেবর সম্পর্কে কোন তথ্যই বের করা গেল না মেয়েলোকটার কাছ থেকে। অথচ এরই উপর নির্ভর করছে কাজের অগ্রগতি। লোকটা যদি প্যারিসের বাইরে গিয়ে থাকে এবং সোমবারের আগে ফিরে না আসে, তাহলে এখানে বসে আঙুল চোষা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না ওর।

লিফট এসে দাঁড়াল। নিচে নামতে নামতে হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। দুটো দশ ডলারের নোট বের করে নিয়ে জায়গামত ভরে দিল মানিব্যাগ। লিফট এসে একতলায় থামতেই সোজা গিয়ে দাঁড়াল কনসিয়ার্যের জানালার সামনে। দুটো টোকা দিল কাঁচের উপর।

রোগা এক কুঁজো বুড়ো চেয়ারে বসে ঢুলছিল, চমকে চাইল এদিকে। জানালা খুলে মাথা ঝাঁকাল, 'কি চাই, মশিয়ে?'

'কিছু মনে করবেন না,' বলল রানা মিষ্টি হাসি হেসে। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। মিস্টার নেবরের সাথে দেখা করা দরকার আমার। খুব

জরুরী।'

'চারতলা।' ভুরু উঁচু করে উপর দিকে ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ, তারপর জানালা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলো।

'আপনার সাহায্য দরকার আমার,' চট করে বলল রানা। নোট দুটো রাখল জানালার তাকে, একটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেছে যেন হাওয়ায় উড়ে না যায়।

বারদুয়েক নোট এবং রানার মুখের উপরে দৃষ্টি বুলিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের চেহারা, বার্ধক্য জর্জরিত নিরুৎসুক মুখে ফুটে উঠল আগ্রহ।

'আপনি ব্যস্ত লোক,' বলল রানা। 'তবে আপনার সময়ের মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত।' নোটের উপর থেকে আঙুলটা সরাল সে। 'চারতলায় গিয়েছিলাম আমি। শুনলাম মিস্টার নেবর বাইরে কোথাও গেছেন। অথচ তাঁর সাথে যত শীঘ্রি সম্ভব দেখা করা দরকার আমার। আপনি কি বলতে পারবেন কোথায় পাওয়া যাবে ওঁকে?'

'ওর সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করেননি, মশিয়ে?' প্রশ্ন করল কনসিয়ার্য, আর একবার চোখ বুলাল নোট দুটোর উপর।

'করেছিলাম। কিন্তু কোন স্পষ্ট উত্তর দিচ্ছে না মহিলা। সবাইকে সব কথা বলাও যায় না। আসলে, বেশ কিছু টাকা পাই আমি মিস্টার নেবরের কাছে। অনেকদিন থেকে ঘোরাচ্ছে। এতদিন তেমন একটা চাপ দিইনি, কিন্তু হঠাৎ করে এমন একটা অসুবিধের মধ্যে পড়ে গিয়েছি যে ওঁকে খুঁজে বের করে টাকা আদায় না করতে পারলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।' কথাগুলো বলে আবার হাসল রানা। 'আপনার পক্ষে হয়তো এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে না।' বলে আঙুল বাড়াল, কিন্তু রানার আঙুল নোটের কাছে পৌঁছুবার আগেই বিদ্যুৎবেগে ছোঁ মেরে তুলে নিল বুড়ো নোট দুটো।

'আমি জানি ও কোথায় আছে,' নিচু গলায় বলল বৃদ্ধ। 'ওর সেক্রেটারির কাছে গতকাল চিঠি এসেছে একটা। সেই ছোটবেলা থেকে স্ট্যাম্প জমাই আমি, বিদেশী টিকিট দেখেই হাতে তুলে নিয়েছিলাম আমি খামটা, নেবরের হাতের লেখা চিনলাম। গারমিশখের আলপেনহফ হোটেল থেকে লেখা। ওখানেই আছে ও। যাবার আগে আমাকে বলেছিল একমাসের লম্বা ছুটিতে যাচ্ছে ও প্যারিসের বাইরে।'

'কবে গেছে ও?'

'এইতো, গত সোমবার।'

'অনেক উপকার হলো,' বলল রানা। 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'পয়সার বিনিময়ে তথ্য—এজন্যে ধন্যবাদের কিছুই নেই। আপনার পাওনা টাকাটা এখন পেলে হয়, মশিয়ে। লোকটা ঠিক ভদ্রলোক না, বেশ কিছুটা নীচ প্রকৃতির।'

বুড়োকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা ব্যস্ত রাজপথে।

ঘড়ি দেখল। চারটে বিশ। স্যামির বারে গিয়ে নিকোলো ট্র্যাচিয়ার সাথে দু'চারটে কথা বলা দরকার মনে করল সে। এখনই যাওয়া ভাল, আর খানিক বাদে ভিড় হবে মেলা।

এভিনিউ ডি চ্যাম্পস এলিসিস ছাড়িয়ে রিউ বেরিতে পাওয়া গেল স্যামির বার। স্বল্পালোকিত, সাদামাঠা বার। দর্শনীয় জায়গাগুলোর আশপাশে, যেখানে ট্যুরিস্ট সমাগম হয় বেশি, সেসব জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মত গজায় এই ধরনের বার। সুইংডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল রানা ভিতরে। সরু, লম্বা ঘরটার শেষ মাথায় আট-দশটা লম্বা টুলের ওপাশে বার কাউন্টার, সামনের দিকে একসারি সাজানো চেয়ার টেবিল। বারম্যান ছাড়া একটি লোকও নেই দোকানে। খরিদ্দার নেই দেখে একমনে একটা রেসিংশীটের উপর ঝুঁকে রয়েছে সুদর্শন বারম্যান, হাতে বলপেন।

এক নজরেই আন্দাজ করে নিল রানা, এই লোকটাই নিকোলো ট্র্যাচিয়া। লম্বা, চওড়া, প্রকাণ্ড কাঁধ। পেশীবহুল শরীর আর নাকের কাছাকাছি বসানো ছোট ছোট চোখ দেখেই বোঝা যায় লোকটা অসম্ভব কামুক। মস্তিষ্কের স্বল্পতা পুষিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি ওকে তীব্র কামনা দিয়ে।

চোখ তুলল বারম্যান, রেসিংশীটটা সরিয়ে রাখল, ব্যবসাদারি হাসি হেসে শক্তিশালী দুই বাহু দিয়ে কাউন্টারে ভর করে ঝুঁকল সামনের দিকে।

'ইয়েস, সিনর? কি দেব আপনাকে?'

একটা টুলে উঠে বসল রানা। বুঝে গেছে সে এই ব্যাটাই ইটালিয়ান বুল, নিকোলো ট্র্যাচিয়া।

'রাই হুইস্কি আর জিঞ্জারেল।'

'ইয়েস, সিনর···চমৎকার রিফ্রেশিং ড্রিংক।'

'হ্যাঁ। আমার সাথে আপনিও একটা খান।'

চট করে রানার দিকে চেয়ে হাসল লোকটা। 'থ্যাংকিউ।' যত্নের সাথে বানাল দুটো ড্রিংক, একটা গ্লাস রানার সামনে রেখে নিজে নিল একটা। বলল, 'দিনের প্রথম। গুডলাক।'

'সান্তে!' বলল রানা গ্লাসটা তুলে নিয়ে।

দুই চুমুক দিয়ে আলগোছে কথা পাড়ল রানা। 'আপনিই কি নিকোলো ট্র্যাচিয়া?'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল বারম্যানের।

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনাকে তো আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না? মানুষের চেহারা খুব মনে থাকে আমার।'

'খুব ভাল। এক্ষুণি একটা মেয়েকে স্মরণ করবার অনুরোধ জানাব ভাবছিলাম।'

'অনেক পদের অনেক মেয়ে আসে এখানে। সবার চেহারা মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া পুরুষদের ওপরই নজর রাখি আমি বেশি।' চতুর হাসি হাসল লোকটা। 'ওরাই বিল পে করে কিনা!'

'বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, এক্ষুণি মেয়েটাকে স্মরণ না করলেও চলবে। কিন্তু বলুন তো, উইলিয়াম নেবরের সাথে আজকাল কাজ কারবার কেমন চলছে আপনার?'

দ্রিম করে নাকের উপর এক বক্সিং খেলেও অতটা চমকে উঠত না ট্র্যাচিয়া, যতটা চমকাল রানার কথা শুনে। হাতে ধরা গ্লাস থেকে ছলকে জামায় পড়ল খানিকটা তরল পদার্থ। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল সে। ঘন সন্নিবেশিত চোখ দুটো ভাবলেশহীন হয়ে গেছে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কিন্তু খুব দ্রুত সামলে নিল লোকটা, ধাক্কার প্রাথমিক ঘোরটা কেটে যেতেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইল সে রানার চোখে।

'ওই নামে কাউকে চিনি না আমি,' বলল সে। 'কিছু মনে করবেন না, কাজ পড়ে রয়েছে আমার।'

'কাজ তো সবারই রয়েছে,' বলল রানা। 'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কয়েকটা কথা শুধু জানতে চাই আমি। আপনার সাইডলাইন কি, জানা আছে আমার; কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে বিপদে পড়তেই হবে। যাতে আপনি কোন বিপদে না পড়েন সেটা দেখব আমি। কি বুঝছেন? শতখানেক ডলার রোজগার করতে পারেন আপনি শুধু কয়েকটা কথার বিনিময়ে।'

'আমি তো বলেছি আপনাকে, সিনর। কাজ আছে আমার!' রানার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে লোকটা।

'ঠিক আছে,' উদাস কণ্ঠে বলল রানা। 'যা ভাল বোঝেন। আমার টাকাটা পছন্দ হচ্ছে না আপনার, ভাইস স্কোয়াডের একজন ইন্সপেক্টরকে যদি পাঠিয়ে দিই, হয়তো তার প্রশ্নের জবাব দেয়াটা সহজ হবে।'

সরে যেতে যেতেও থেমে দাঁড়াল ট্র্যাচিয়া, খানিক ইতস্তত করে চোখ পাকিয়ে চাইল রানার দিকে।

'কে আপনি? আপনি এসব প্রশ্ন করছেন কেন?'

'ধরে নিন, আমি এক দোস্ত আপনার,' হাসল রানা। মানিব্যাগ বের করে দশটা দশ ডলারের নোট হাতে নিল। 'এগুলো এক্ষুণি পকেটে পুরতে পারেন যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন। ভয় নেই, যা বলবেন সেটা গোপন থাকবে, আমার মুখ থেকে কারও কানে যাবে না। আপনার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই, একটা মেয়েকে খুঁজছি আমি, আপনার সাথে অভিনয় করেছিল সে, ছবি তুলেছিল নেবর।'

আড়চোখে নোটগুলো দেখল ট্র্যাচিয়া, ঠোঁট চাটল একবার, এক ঢোক হুইস্কি খেল, তারপর ভ্রূকুটি করল।

'ওগুলো আমার জন্যে?'

'ঠিক ধরেছেন। যদি প্রশ্নের উত্তর দেন। কথা দিচ্ছি, যা বলবেন তার জন্যে কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না আপনাকে।'

খানিক ইতস্তত করল ট্র্যাচিয়া, চিন্তা করল—বারকয়েক নোটগুলোর দিকে

চেয়ে বুঝতে পারল ওগুলো বড় বেশি আকর্ষণ করছে, ওগুলোর মায়া কাটানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। গ্লাসটা শেষ করে আরও এক গ্লাস তৈরি করল একই জিনিস। রানা বুঝতে পারল, ভোঁতা মাথাটা খাটাবার চেষ্টা করছে লোকটা ভ্রূ কুঁচকে। চুপচাপ চেয়ে রইল সে ট্র্যাচিয়ার মুখের দিকে।

'কি জানতে চান আপনি?' অবশেষে প্রশ্ন করল ট্র্যাচিয়া।

'একখানা এইট মিলিমিটার ফিল্ম দেখেছি আমি ইদানীং,' বলল রানা। 'একটা হুড পরা অবস্থায় আপনি অভিনয় করেছেন ওতে। আপনার পার্টনার ছিল ভারতীয় একটা মেয়ে। একই বিষয়বস্তু নিয়ে আরও তিনটে ছবি তোলা হয়েছিল. খুব সম্ভব একই সময়ে। কিছু স্মরণে আসছে আপনার?'

আবার একবার নোটগুলোর দিকে চাইল ট্র্যাচিয়া।

'সত্যিই বলছেন, ওগুলো আমার জন্যে?'

পাঁচটা নোট আলাদা করে ঠেলে এগিয়ে দিল রানা কাউন্টারের উপর।

'বাকিগুলো পাবেন কথা শেষ হলে।'

চট করে নোটগুলো তুলে নিয়ে হিপ পকেটে ঢুকিয়ে দিল ট্র্যাচিয়া।

'গোপনীয়তা রক্ষা করবেন, কথা দিচ্ছেন?'

'আপনাকে কোন অবস্থাতেই গোলমালে জড়াব না, এটুকু কথা দিতে পারি,' বলল রানা। 'এবার শোনা যাক ছবিটা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য।'

'ডেকে পাঠাল নেবর, স্পেশাল ছবি হবে একটা। হ্যাঁ, নোংরা ছবিতে পার্ট করি আমি। টাকা এবং আনন্দ—দুটোই পাই এ কাজে। প্রায় সপ্তাহেই এক আধবার ডাক পড়ে। গত মাসে ডেকে পাঠাল। স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখি আনকোরা নতুন এক মেয়ে। আগে আর দেখিনি ওকে কোনদিন। একেবারে নতুন।' কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামল ট্র্যাচিয়া। স্মৃতি রোমন্থন করছে। কামাতুর হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। চিক চিক করছে চোখদুটো। 'দারুণ! বুঝলেন? অ্যামেচার, কিন্তু দারুণ!'

'ওর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'নাহ্। চেরি বলে ডাকছিল ওকে নেবর। হাবেভাবে বুঝেছিলাম খুব ভাব ওদের দু'জনের। নাম জিজ্ঞেস করিনি। নাম দিয়ে আমার কি হবে? আসলটা পেলেই আমি খুশি। চারবার, বুঝলেন, চারটে ফিল্ম করলাম দুই দিনে। প্রত্যেকটার জন্যে পঞ্চাশ ডলার করে দিয়েছিল।' আবার সেই হাসি। 'টাকার চেয়ে মজাটাই পেয়েছি বেশি। কী বলব, এমন সব টেকনিক...'

'কি করে বুঝলেন ওদের দু'জনে খুব ভাব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের চালচলন দেখে, কথাবার্তার নমুনা দেখে। ও তো দেখলেই বোঝা যায়।'

'তবু আপনার সাথে ওর এসব কারবার ঘটতে দিল নেবর, নির্বিকার ভাবে ছবি তুলল?'

'তাতে কি? ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা। কত লোকের স্ত্রীর সাথে এই সব করেছি. ছবি হয়তো তুলছে ওর স্বামীই। ওসব কিছু না. ভায়া। টাকার বাণ্ডিলের কথা ভাবলে ওসব ভাবাবেগ আর থাকে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় স্ট্রিক্টলি বিজনেস। তাছাড়া. আমার যতদূর বিশ্বাস নেশার ঘোরে ছিল এই মেয়েটা।'

'কি রকম নেশা?'

'খুব সম্ভব এল.এস.ডি। নেশায় একেবারে টং হয়ে ছিল মেয়েটা. শরীরটা মনে হচ্ছিল যেন হট ওয়াটার ব্যাগ উহ্. যখন···'

'আপনার ধারণা এল.এস.ডি খেয়েছিল মেয়েটা?'

'আমি শিওর। নইলে এত গরম হবে কেন মেয়েমানুষের শরীর? এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠবে কেন ছুঁতে না ছুঁতেই? যখন বিছানার উপর নিয়ে ঠেসে ধরলাম, তখন···'

'হয়েছে, হয়েছে. থাক.' বাধা দিল রানা। 'ছবিটা দেখেছি আমি. কাজেই বর্ণনার দরকার নেই। যাই হোক. ওদের কথাবার্তা কিছু কানে গেছে আপনার? মনে আছে কিছু?'

'তেমন কিছুই মনে পড়ছে না,' বলল ট্র্যাচিয়া। ভ্রূকুটি করে স্মরণ করবার চেষ্টা করল। মাথা নাড়ল। 'শূটিং-এর সময়টুকু তো কাজের মধ্যেই ছিলাম. কারও কথা শোনার প্রশ্নই ওঠে না। আর শূটিং-এর পর আমাকে বিশ্রাম নিতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন.' আবার সেই কামাতুর হাসি। 'তবে দ্বিতীয় দিন আমি যখন প্রথম শূটিং শেষ করে ফোঁস ফোঁস হাঁপাচ্ছি. সেই সময় পাশের ঘরে কথা বলছিল ওরা। শুনলাম. ফিল্মগুলো প্রসেস করা হয়ে গেলেই কিছুদিনের জন্যে গারমিশখে যাবে ওরা বেড়াতে।'

'আচ্ছা. উইলিয়াম নেবর সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্র্যাচিয়া।

'টাকা পয়সার ব্যাপারে একটু কিপ্টে পেমেন্ট দিতে ওর কলজে ছিঁড়ে যায়। এত যে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করে আমার ছবি বেচে. অথচ আমার ফি সেই পঞ্চাশ ডলারই। তাও আবার দেয় তিন কিস্তিতে। এছাড়া আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন. লোক কেমন. আমি বলব ভালই। চালু লোক. দুনিয়াদারির হালচাল বোঝে তবে একটা কথা মাঝে মাঝেই মনে হয় আমার—যদিও কোন প্রমাণ নেই আমার হাতে. তবু আমার ধারণা. ওর রোজগারের একটা মোটা অংশ চলে যায় অন্য কারও পকেটে।'

'তার মানে?'

'মানে সহজ। বেআইনী কাজ করলে মানুষের কপালে যা হয় তাই। ব্ল্যাকমেইল। আমাকে একবার বলেছিল দু'লাখ ডলার হাতে পেলে পালিয়ে চলে যেত আমেরিকায়।'

ঠিক এমনি সময়ে সুইংডোর ঠেলে বারে ঢুকল জনাপাঁচেক আমেরিকান

তরুণ-তরুণী—কোনটা ছেলে আর কোনটা মেয়ে বোঝা মুশকিল: খেয়াল করে বুক না দেখলে চেনা যায় না। সবকটার কাঁধে জাপানী ক্যামেরা মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল বারের নিরিবিলি ভাবটা। একটা টেবিল দখল করে উচ্চকণ্ঠে আলাপ শুরু করল ওরা। একজন টেবিল চাপড়ে ডাকল বারম্যানকে।

'কাস্টোমার এসে গেছে, উঠতে হয় এখন,' বলল রানা। বাকি পাঁচটা নোট কাউন্টারের উপর রেখে ঠেলে এগিয়ে দিল ট্র্যাচিয়ার দিকে। ওগুলো পকেটে রেখে বিল দিল ট্র্যাচিয়া। ড্রিংকসের বিল শোধ করে নিচু গলায় বলল রানা, 'ভুলে যান যে দেখা হয়েছিল আমাদের।' বলেই নেমে পড়ল সে টুল থেকে, দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

যতদূর মনে হচ্ছে গারমিশখে যেতে হবে ওর শিখা শংকর আর ফিল্ম তিনটে উদ্ধার করতে হলে। কিন্তু তার আগে আরও কিছু তথ্য জানা দরকার। স্থির করল, জটিলেশ্বরের অফিসে ফিরে যাবে সে। ওখান থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করতে সুবিধে হবে। একটা হাত তুলতেই ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। উঠে পড়ল রানা।

সাত

অর্লি এয়ারপোর্টে নীল ইউনিফরম পরা অফিসারের হাতে পাসপোর্টটা তুলে দিয়েই হৃৎকম্প উপস্থিত হলো শংকরলালজীর। হাতের তালু ঘেমে উঠেছে। পাসপোর্ট খুলে ছবি দেখল লোকটা, শংকরজীর মুখের দিকে চাইল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সীল মেরে ফেরত দিল ওটা। বলল, 'মার্সি, মশিয়ে।'

পুলিস ব্যারিয়ার পেরিয়ে ইনডেক্স বোর্ডে দেখল শংকরলালজী দশ নম্বর গেটের দিকে এগোতে হবে এখন। ঘড়ি দেখল। হাতে সময় আছে এখনও পনেরো মিনিট। বুকের ভিতরের কাঁপুনি কমে এসেছে বেশ খানিকটা। ধীর পায়ে এগোল সে দশ নম্বর গেটের দিকে। একটা বুকস্টল দেখে থেমে দাঁড়িয়ে একটা পেপার আর গোটা দুয়েক পেপারব্যাক বই কিনল। আবার এগোতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে কানে এল ঘোষিকার ধাতব কণ্ঠস্বর। অদৃশ্য স্পীকার থেকে ঘোষণা হচ্ছে:

প্যান অ্যামের নয়াদিল্লী ফ্লাইট পি.এ. জিরো সেভেন থ্রীর প্যাসেঞ্জারদের জানানো হচ্ছে যে অনিবার্য কারণবশত এই ফ্লাইট একঘণ্টার জন্যে বিলম্বিত হবে। প্যাসেঞ্জারদেরকে রিসেপশন সেন্টারে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিক সময় মত তাঁদের দশ নম্বর গেটের দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

দাঁতে দাঁত চেপে চোখমুখ বিকৃত করল শংকরলালজী। দুরুদুরু করে উঠল বুকের ভিতরটা বিপদের আশঙ্কায়। যত বেশিক্ষণ এয়ারপোর্টে থাকা যাবে, ধরা

পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে তত্ই যেকোন সময় যেকোন লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে।

'বিরক্তিকর, তাই না?' পাশ থেকে শান্ত একটা গলা শোনা গেল। 'বিশেষ করে আপনার জন্যে '

চমকে উঠে পাশ ফিরল শংকরলালজী। মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্বশরীর। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেঁটেখাট, মোটাসোটা লোক কখন নিঃশব্দে এত কাছে চলে এসেছে খেয়ালই করেনি সে।

প্রথমেই নজরে পড়ে লোকটার অত্যন্ত দামী পোশাক পরিচ্ছদ, তারপরেই চোখ যায় দাঁতে চাপা প্রকাণ্ড চুরুটটার দিকে। একবার চাইলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড ক্ষমতা, উদ্যম আর দোর্দণ্ড প্রতাপ আটকা পড়েছে লোকটার শরীরের মধ্যে—বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে সর্বক্ষণ। অত্যন্ত ঘন একজোড়া ভুরু, তার নিচে তীব্র একজোড়া চোখ, নাকটা সামান্য বাঁকা। মাথায় কালো স্লাউচ হ্যাট, পরনে চমৎকার ছাঁটা একটা গাঢ় রঙের ইংলিশ টুইড স্যুট। বাম হাতের উপর ভাঁজ করা রয়েছে একটা হালকা ওভারকোট। বাম হাতের বেঁটে, মোটা অনামিকায় সোনার আংটি—মস্তবড় একটা হীরের টুকরো বসানো তাতে। টাইপিনের উপরও একখণ্ড সলিটেয়ার ডায়মণ্ড। ধবধবে সাদা শার্ট, কোটের পকেটে ভাঁজ করা রুমাল, পায়ে সাপের চামড়ার জুতো—সব ছিমছাম।

লোকটাকে দেখে শংকরজীর এইভাবে চমকে ওঠার কারণ এক নজরেই চিনতে পেরেছে সে লোকটাকে। এর নাম রুডলফ গুস্থার। পৃথিবীর অন্যতম ধনীদের একজন। ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে অক্টোপাসের মত এর চার হাতপায়ের বিশ আঙুল গিয়ে পৌছোয়নি। ভয়ঙ্কর এক বিষাক্ত মাকড়সার মত জাল বিছিয়ে বসে আছে সে মাঝখানে—আঙুলের ইশারায় নাচাচ্ছে বড় বড় ব্যাংক, পলিটিশিয়ান, এমন কি ছোটখাট রাজা বাদশাকেও।

এই লোকটার সাথে দেখা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শংকরলালজী। ব্লাফ দেয়ার চিন্তা মুহূর্তে বাতিল করে দিল সে। একে ব্লাফ দেয়া যাবে না। নিজে যেচে পড়ে যখন আলাপ করছে তার মানে ছদ্মবেশে ধোঁকা দিতে পারেনি সে এই লোকের চোখকে। জেনেশুনেই এসেছে আলাপ করতে। একে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য তার নেই।

'এভাবে আমাদের আলাপ করা ঠিক হচ্ছে না,' নিচু গলায় বলল শংকরজী। 'আপনাকে সবাই চেনে, আমাকেও চিনে নেবে। বিপদে…'

'কিন্তু আলাপ না করেও যে চলছে না,' বলল গুন্থার। আঙুল তুলে দেখাল একটা দরজার দিকে। 'ওই যে "এ" লেখা দরজা, ওখানে গিয়ে ঢুকুন, আমি আসছি খানিক বাদেই।'

'দেখুন, আমি দুঃখিত, আমি…'

'আমার চোখে যখন পড়ে গেছেন, তখন আর কোন উপায় নেই, শংকরলাল।'

তীব্র দৃষ্টিতে চাইল গুস্থার শংকরজীর চোখের দিকে 'নাকি আপনি ভাবছেন, আছে?'

ধমকটা ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল শংকরলালজীর। এক মুহূর্ত সামান্য একটু ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল সে, রওনা হয়ে গেল নির্দিষ্ট দরজার দিকে। পুলিস ব্যারিয়ার পেরোবার সময় যেমন হয়েছিল তারচেয়ে অনেক বেশি জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, দম আটকে আসার মত অবস্থা হয়েছে ওর, ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে হাত-পা। ভিড়ানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল সে। ভি.আই.পি-দের জন্যে দামী আসবাবপত্রে সাজানো বিশেষ ঘর।

আধমিনিটের মধ্যে আরেক দরজা দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল রুডলফ গুস্থার, দুটো দরজারই বল্টু লাগিয়ে দিয়ে ফিরল শংকরলালজীর দিকে।

'এখানে কি করছেন আপনি, শংকরলাল, জানতে পারি?' হিমশীতল নম্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল গুস্থার। 'জাল পাসপোর্ট নিয়ে, বিচ্ছিরি এক জোড়া গোঁফ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—মাথাটা খারাপ হয়েছে আপনার?'

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে দম নিল শংকরলালজী। যদিও গুস্থারের ভয়ে ভিতরটা কেঁচো হয়ে রয়েছে, তবু নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবার সংকল্প নিল সে। মনে মনে বলল, আমি ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী, এই কথাটা বেঁটে লোকটাকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার।

'এভাবে কথা বলছেন কেন, জানতে পারি? আপনি জানেন, আপনি কার সাথে কথা বলছেন?'

দেঁতো হাসি ফুটে উঠল গুস্থারের মুখে। একটা লাউঞ্জিং চেয়ারে বসে পায়ের উপর পা তুলল।

'আমি জানি, নারায়ণ দেশাইয়ের সাথে কথা বলছি না।' চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল। 'প্রশ্নের জবাব দিন।'

'আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না আমি। মাথা আমার ঠিকই আছে। ব্যক্তিগত জরুরী এক কাজে এইভাবে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে, মাঝপথে কেউ কোন গোলমাল না করলে এইভাবে ফিরে যাব নয়াদিল্লীতে কারও কোন স্বার্থহানি হবে না।' কথা ক'টা জোরের সাথে বলে ঘর্মাক্ত কপালে রুমাল বুলাল শংকরজী, বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'কাজটা এতই ব্যক্তিগত এবং এতই জরুরী যে আপনার ক্যারিয়ারের ঝুঁকি নেয়ার দরকার হয়ে পড়ল?' শান্ত গলায় জানতে চাইল গুস্থার

'সেসব নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার নেই।' একটু রাগ রাগ ভাব প্রকাশ পেল শংকরজীর কণ্ঠে। 'শুধু জেনে রাখুন, তেমন জরুরী কোন ব্যাপার না হলে এভাবে ছুটে আসতাম না আমি এখানে।'

'শুধু এইটুকুতে তো আমার মন ভরবে না, মিস্টার শংকরলাল,' থমথমে গুস্থারের মুখ। 'মনে হচ্ছে আমাদের চুক্তির কথাটা ভুলে গেছেন আপনি বেমালুম

আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার প্রধানমন্ত্রীত্বের পিছনে খরচের জন্যে সোয়াশো কোটি টাকার যে বাজেট আমরা তৈরি করেছিলাম ওয়াশিংটনে বসে, তার অর্ধেকটা দিয়েছি আমি আমার পকেট থেকে।' দপ করে জ্বলে উঠল গুস্তারের চোখ। 'সাড়ে বাষট্টি কোটি টাকা দিয়েছি আমি আপনাকে। আপনি বলতে চান এত টাকা আপনার পিছনে ইনভেস্ট করবার পর আপনি গর্দভের মত যা খুশি তাই করবেন, আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করব? কী মনে করেছেন আপনি নিজেকে? গর্দভ বললে খুব কমই বলা হয়—আমি তো বুঝেই পাচ্ছি না কি করে এই পাগলামি চাপল আপনার মাথায়! যদি কেউ চিনে ফেলে··· কোন সাংবাদিক, বা যে কেউ, আপনার কপালে কি ঘটবে কল্পনা করতে পারেন? আপনার যা মন তাই হোক, আমার টাকাগুলো সমস্ত যাবে পানিতে। আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম ভারতের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ছাড়ব আপনি কথা দিয়েছিলেন তিনটে ড্যামের কন্ট্রাক্ট দেবেন আমাকে। পাকা চুক্তি। আমি আমার দিকটা পূরণ করেছি। আর আপনি? বিচ্ছিরি এক গোঁফ লাগিয়ে জাল পাসপোর্ট নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন প্যারিসে! আলাপ করবার ইচ্ছে নেই বললেই হলো? ইয়ার্কি নাকি? স্পষ্ট জবাবদিহি করতে হবে আপনার আমার কাছে।'

গুস্তারের প্রতিটি কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো শংকরলালজী। সত্যিই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল সে এই লোকের সাথে, টাকাও নিয়েছিল এই লোকের সাহায্য ছাড়া আজকের অবস্থায় পৌঁছানো ওর পক্ষে ছিল এক কথায় অসম্ভব। যেমন পেয়েছে, তেমনি বৃষ্টির মত ঢেলেছে সে টাকা আখের গুছাবার কাজে।

উশখুশ করল শংকরলালজী, নড়েচড়ে বসল চেয়ারে, নিজের দুর্বলতার কথা বুঝতে পারল পরিষ্কার। এই লোকের সাথে তেজ দেখিয়ে একে বিগড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না। জোর করে হাসি টেনে আনল ঠোঁটে। কিন্তু বুঝতে পারল, যদিও এই হাসির জোরে অনেক অসম্ভব, কঠিন পরিস্থিতি আয়ত্তে এনেছে সে বহুবার, আজ এই ঘরে রুডলফ গুস্তারের উপর কোন মোহ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না ওর হাসি। তবু বলল, 'দেখুন, মিস্টার গুস্তার, আপনি অনর্থক উদ্বিগ্ন হচ্ছেন অত্যন্ত সাবধানে এসেছি আমি এখানে, খুবই সাবধানে বেরিয়ে যাচ্ছি আবার কেউ জানে না···আপনার সাথে দৈবাৎ এই দেখাটা হয়ে না গেলে টেরও পেতেন না আপনি যে মাঝে আমি একবার প্যারিসে এসেছিলাম।'

'বটে? দৈবাৎ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার কাছে?' গুস্তারের কর্কশ কণ্ঠস্বর শেল হয়ে বিঁধছে শংকরজীর কানে। 'যদি বলি আপনার নয়াদিল্লী ত্যাগ করার খবর জানা আছে আমার? যদি বলি আপনার প্যারিস পৌঁছানোর খবর জানা আছে? যদি বলি জটিলেশ্বর রায়ের সাথে আপনার দেখা হওয়ার খবরও জানা আছে আমার? যদি বলি আজ লণ্ডন ফ্লাইটের দুইঘণ্টা আগে আমার এয়ারপোর্টে এসে হাজির হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করা··· কেন বোকার মত এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করলেন?'

'আপনি লণ্ডন যাচ্ছেন বুঝি?' বোকার মত প্রশ্ন করল শংকরলালজী ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল গুস্থারের মুখের দিকে। একেবারে হকচকিয়ে গেছে

'যাচ্ছি চারঘণ্টা পর ফিরেও আসছি আবার।' জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে শংকরজীর চোখের উপর 'আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'আমার প্যারিসে আসার খবর আপনি জানলেন কি করে? অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে

'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবেন না, মিস্টার শংকরলাল' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত নাড়ল গুস্থার চুরুট থেকে ছাই ঝরে পড়ল কার্পেটের উপর। 'যার পেছনে টাকা ঢালি, তার ওপর নজর রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে আমার। আপনার ওপর অনেক টাকার বাজি ধরেছি আমি, ভুলেও ভাববেন না আমার অজান্তে একটিও পদক্ষেপ ফেলছেন আপনি কোনদিকে! যাই হোক, আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আপনি এখানে কেন?'

শুকনো ঠোঁট চাটল শংকরলালজী। অনুভব করল রক্ত সরে যাচ্ছে ওর মুখ থেকে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

'দেখুন, ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত। আপনার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি বাধ্য নই। দয়া করে এ নিয়ে চাপাচাপি করবেন না।'

একই ভঙ্গিতে চেয়ে রয়েছে গুস্থার শংকরজীর চোখের দিকে। চোখ না সরিয়ে গোটা দুই টান দিল চুরুটে।

'আমার কাছে না গিয়ে জটিলেশ্বরের কাছে গিয়েছিলেন কেন?'

খানিক ইতস্তত করল শংকরলালজী, মনের জোর সংগ্রহ করে নিয়ে বলল, 'ও আমার বহুকালের পুরানো বন্ধু। শেষ ভরসা হিসেবে এসেছিলাম আমি ওর কাছে সাহায্য চাইতে। সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে...'

'আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে আপনার বাধছে কোথায়?' বাঁকা হাসি হাসল গুস্থার। 'আমি কি আপনার বন্ধু নই?'

সরাসরি গুস্থারের চোখের দিকে চেয়ে রইল শংকরলালজী কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল

'না আপনাকে আমি ক্ষমতাশালী সহযোগী বলে মনে করি, বন্ধু বলে নয়

'তার মানে জটিলেশ্বর রায়ের মত নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের ওপর নির্ভর করতে বাধছে না আপনার, বাধছে আমার সাহায্য গ্রহণ করতে!' আরও দুটো টান দিল সে সিগারে। 'আপনার ব্যাপারে সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি আমি ক্রমে। আপনার যোগ্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে আমার মনে।' খানিকটা সামনে ঝুঁকে এল সে। 'আপনি কি জানেন না, জরুরী বা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে বন্ধুর কাছে যাওয়া বোকামি? সমস্যা এসে হাজির হলে আপনার যাওয়া উচিত আমার

মত হারামীলোকের কাছে, যার ক্ষমতা আছে যে কোন সমস্যা সমাধানের। এমন একজনের কাছে যাওয়া উচিত যে ইনভেস্ট করে বসে রয়েছে আপনার পেছনে, নিজের স্বার্থেই যে আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে খুশি মনে। তা সে যত বড় সমস্যাই হোক না কেন কাজেই, সময় নষ্ট না করে বলে ফেলুন। আপনার ব্যক্তিগত, জরুরী সমস্যাটা কি?'

'জটিলেশ্বর রায় নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ নয়। ওর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ফিরছি আমি দেশে। আমি জানি যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করবে সে '

'আমি জিজ্ঞেস করছি: ব্যক্তিগত এই জরুরী সমস্যাটা কি ' বিরক্ত কণ্ঠে বলল গুস্থার। 'জানার অধিকার আছে আমার জটিল রায় যদি পারে, ভাল কথা: না পারলে আমি সম্ভব করে তুলব সেই অসম্ভবকে।'

দ্রুত চিন্তা চালু হয়ে গেছে শংকরলালজীর মাথার মধ্যে। ভাবল, এভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত প্যারিসে ছুটে আসাটা বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে। জটিল রায়ের লোকের চোখে ধরা পড়ে গেছে সে, গুস্থারের লোকের চোখে ধরা পড়ে গেছে—আর কার চোখে ধরা পড়েছে সে ভগবানই জানেন। জটিলেশ্বরের কাছে এসে কতটুকু লাভ হয়েছে ওর? বাংলাদেশের এক অখ্যাত এজেন্টের উপর ভার চাপিয়ে দিয়ে দায় সেরেছে জটিল। তার চেয়ে গুস্থারের ঘাড়ে সবটা বোঝা চাপিয়ে দেয়াই বোধহয় অনেকগুণে ভাল ছিল। রুডলফ গুস্থারের কথা বলেছিল সে অনিলাকে, কিন্তু কিছুতেই রাজি হয়নি অনিলা ওর সাহায্য নিতে। এই জার্মান লোকটার প্রতি অহেতুক একটা ঘৃণা আর আতঙ্কের ভাব রয়েছে অনিলার মধ্যে। গুস্থারের সাহায্য নেবে কিনা জিজ্ঞেস করায় একবাক্যে বারণ করেছিল অনিলা। এখন ওর মনে হচ্ছে কাজটা বোধহয় ভাল করেনি। যদিও জটিল সম্পর্কে গুস্থারের মন্তব্য মেনে নিতে রাজি নয় সে, তবু হঠাৎ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওর, কারও কথা না শুনে এই ব্যাপারে সরাসরি এর সাথেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল। সত্যিই তো, নিজের স্বার্থেই সাহায্য করত এই লোকটা, নিজের সমস্ত ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাত কার্যোদ্ধারের জন্যে।

চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল শংকরলালজী।

'ঠিক আছে, বলছি,' সংক্ষেপে সব কথা ভেঙে বলল সে—নীলছবি, ভয় দেখানো চিঠি, কিছুই বাদ দিল না। একটি কথা না বলে চুপচাপ চুরুট টেনে গেল রুডলফ গুস্থার চোখ বুজে, নির্দ্বিধায় ছাই ঝাড়ল পুরু কার্পেটের উপর। সব ঘটনা বলবার পর বক্তব্য শেষ করল শংকরজী এইভাবে, 'কাজেই, বুঝতেই পারছেন, দিশে হারিয়ে যাওয়ারই কথা। জটিলের সাথে বন্ধুত্ব আমার কলেজ লাইফ থেকে। সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে ও আমাকে। এখন বুঝতে পারছি তাড়াহুড়ো করে এত বড় ঝুঁকি না নিয়ে সোজা আপনার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত ছিল আমার।'

চুরুটটা দাঁতের ফাঁক থেকে আঙুলের ফাঁকে নিল গুস্থার। চোখ মেলল।

'মাসুদ রানা এই কাজের ভার নিয়েছে তাহলে?'

নিয়েছে টেলিফোনে খবর দিয়েছে আমাকে জটিল।' চাইল গুস্থারের মুখের দিকে 'মনে হচ্ছে চেনেন আপনি মাসুদ রানাকে? কেমন লোক? পারবে?'

'পারবে কিনা জানি না। তবে ওর মত পাজি আর বেপরোয়া লোক আমি আর দেখিনি শেয়ালের মত ধূর্ত, সিংহের মত সাহসী, আর শুয়োরের মত গোঁয়ার। টাকা দিয়ে কেনা যায় না ওকে। আমার পরিচয় জানার পরেও ড্যামকেয়ার করেছিল একবার আমাকে, শায়েস্তা করতে গিয়ে নিজেরই শায়েস্তা হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল আমার, শেষকালে সব ছেড়ে পালিয়ে বাঁচি এই ধরনের একটা কাজ ও নেবে ভাবাই যায় না।'

'জটিল বলছিল, ওর টাকার খুব দরকার। পঞ্চাশ হাজার ডলার অফার করায় রাজি হয়ে গেছে আপনার কি মনে হয়, পারবে ও?'

'ও যদি চায় ঠিকই বের করে ফেলবে ফিল্ম তিনটে। আপনার মেয়েকেও খুঁজে বের করতে পারবে, সন্দেহ নেই।' কৌতুকের দৃষ্টিতে চাইল গুস্থার শংকরলালজীর মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তারপর?'

নড়েচড়ে বসল শংকরজী। ভিতরের অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার

'তারপর আর কি? ফিল্মগুলো নষ্ট করে দেব। মেয়েটাকে শাসনে রাখব।'

'তাই নাকি? কত বয়স আপনার মেয়ের?'

'বাইশ-তেইশ।'

'কিভাবে কন্ট্রোল করবেন ওকে?'

'বোঝাবার চেষ্টা করব...যুক্তি দিয়ে...'

অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে থামিয়ে দিল গুস্থার ওকে।

'আপনার মেয়ে সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি?'

চোখ সরিয়ে অন্যদিকে চাইল শংকরজী। কপালে ভ্রূকুটি নিচু গলায় বলল, 'একেবারেই বেয়াড়া হয়ে গেছে ও। সত্যি বলতে কি, ওর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না আমি প্রায় ছয় বছর দেখাই হয়নি আমাদের।'

'আমি জানি সে-কথা। ওর সম্পর্কেও রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি আমি আমার ইনভেস্টমেন্টের খাতিরে' আবার ছাই ঝাড়ল গুস্থার দামী কার্পেটের উপর 'ওর প্রতি আপনার দুর্বলতা কতখানি?

কথাটার গুরুত্ব টের পেল না শংকরলালজী কাঁধ ঝাঁকাল

'খুব একটা দুর্বলতা আছে, বলা যাবে না মেয়ের প্রতি বাপের যে টান থাকে, মায়ার বন্ধন থাকে, সেসব ছিঁড়েকেটে সাফ করে দিয়েছে ও নিজের হাতে আপনিই বলুন, পদে পদে যে মেয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করে চলেছে, আমাকে শায়েস্তা করবার জন্যে যে মেয়ে এত নিচে নেমে গেছে, তার প্রতি কতটা দুর্বলতা থাকতে পারে আমার? যদি মরে যেত, হাড় জুড়োত আমার।'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর বরফ গলা পানির মত ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল গুস্থার, 'এই ধরুন, কোন একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনায় মারা গেল

মেয়েটা…খুব খারাপ লাগবে আপনার?'

ঝট করে গুস্থারের চোখের দিকে চাইল শংকরলালজী। নিজের অজান্তেই হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

'কি বলছেন আপনি!' সামলে নিয়ে বলল সে।

'যা বলেছি ঠিকই শুনেছেন আপনি,' কড়া গলায় ধমক দিল গুস্থার। 'অযথা সময় নষ্ট করবেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছি, মেয়েকে যদি জীবনে আর কোনদিন দেখতে না পান, কতটা খারাপ লাগবে আপনার?'

খানিক ইতস্তত করে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শংকরলালজী।

'সত্যি কথা বলতে কি, খুব একটা খারাপ লাগবে না আমার জীবনধারার সাথে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারবে না শিখা নিজেকে। পারত, যদি আক্রোশ পুষে না রাখত ও মনে। আমি ভেবেছিলাম বড় হলে আমার দিকটা বুঝতে পারবে ও, কিন্তু কোথায়?—দিন দিন আরও উদ্ধত, আরও বেপরোয়া, আরও কুটিল হয়ে উঠছে। ও বেঁচে থাকলে প্রধানমন্ত্রী হয়েও সুখ হবে না আমার। ফ্র্যাংকেস্টাইন তৈরি করেছি, ওর হাতেই লেখা আছে আমার সর্বনাশ। না থাকলে ভাল হত, কিন্তু সেসব কথা তো আর আসছে-না এখন। ও বেঁচে আছে, এটাই সত্য। যত কঠিনই হোক, এই সত্য মেনে নিয়ে চলতে হবে আমার।'

'তাই কি?' গুস্থারের জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে শংকরজীর চোখের উপর। 'যতদিন বেঁচে থাকবে, একের পর এক জ্বালাতন আর সমস্যায় ফেলবে ও মেয়ে আপনাকে। মনে করুন মাসুদ রানা উদ্ধার করে দিল ফিল্মগুলো—তাতে লাভটা কি হলো? আরও ফিল্ম তৈরি করতে পারে ও যখন খুশি। আরও ভয়ঙ্কর স্ক্যাণ্ডালে জড়াতে পারে আপনাকে। আসল কথাটা বুঝবার চেষ্টা করুন। আসল ব্যাপার, আপনাকে এবং আপনার জীবনযাত্রাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে ও, ঠিক যতটা ঘৃণা করেন আপনি ওর জীবনযাত্রা। আপনি ওকে অবহেলা করে, দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ করেছেন আপনার ঘৃণা, বড় হয়ে বদ্ধপরিকর হয়েছে ও প্রতিশোধ নেবার জন্যে। মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে আর সোজা পথে আনা যাবে না। আপনার দুর্বলতম জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে, আপনার সারা জীবনের পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রমে পরিণত করবে ও সেই জায়গায় আঘাত হেনে—ঠেকাবার রাস্তা আপনার নেই।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল গুস্থার। গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'এইজন্যেই বলছিলাম, সোজা আমার কাছে আসা উচিত ছিল আপনার সমস্যা নিয়ে। আপনার মেয়ে খুব খারাপ একটা দলের খপ্পরে পড়েছে—উইলিয়াম নেবর বলে এক চরিত্রহীন ছোকরার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বাঁধা রয়েছে ভয়ঙ্কর এক ব্ল্যাকমেইলারের কাছে এ সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা জটিলেশ্বরের নেই। ও হয়তো মাসুদ রানার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারবে আপনার মেয়েকে, কিন্তু ওর বা ওর বন্ধুর মুখ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পারবে না।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে শংকরজীকে। 'কিন্তু আমি পারব,

এবং প্রয়োজন হলে করব।

চিকন ঘাম বেরিয়ে এল শংকরলালজীর কপালে।

'এসব কি বলছেন আপনি, মিস্টার গুস্থার! আপনি যা ইঙ্গিত দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি আপনি মনে করেন না...'

'বিকল্প আর একটা পথ আমাকে বাতলে দিন। আর কোন সমাধান আছে এর? বলুন? মাসুদ রানা হয়তো খুঁজে বের করবে আপনার মেয়েকে তারপর? তারপর কি?'

কোন উত্তর দিতে পারল না শংকরলালজী। মোনাজাতের ভঙ্গিতে দুই হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল কার্পেটের দিকে চেয়ে একমনে কামড়ে চলল নিচের ঠোঁট

'ভেবে দেখুন, বেয়াড়া, বখে যাওয়া এক চরিত্রহীনা মেয়ের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতে, প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে রাজি আছেন আপনি?' প্রশ্ন করল গুস্থার। 'আপনার প্রতি যে আক্রোশ পুষে রেখেছে সে মনের মধ্যে, যদি এখনই না থামান, আপনার সর্বনাশ না করে থামবে না এই মেয়ে তিনটে ফিল্ম উদ্ধার করে নষ্ট করে দেয়া কিছুই না। সহজ কাজ। আসলে ওগুলো ধ্বংস করে দিলেই আপনার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না...মূল বা উৎস খুঁজে বের করে সেটার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝে দেখুন, ছবি ধ্বংস করে কোন লাভ নেই, চিরস্থায়ী সমাধান যদি চান, ধ্বংস করতে হবে আপনার মেয়েকে'

দেয়ালের লাউডস্পীকার বাধা দিল ওদের কথোপকথনে। ঘোষিকার খনখনে গলা ভেসে এল:

প্যান অ্যামের নয়াদিল্লী ফ্লাইট পি. এ. জিরো সেভেন থ্রীর প্যাসেঞ্জারদেরকে দশ নম্বর গেটের দিকে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল শংকরলালজী।

'যেতে হবে,' ধরা গলায় বলল সে। গুস্থারের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বলল, 'যা ভাল বোঝেন করুন আপনার হাতে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি আমি।'

কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র গুস্থার নয়। মাথা নাড়ল সে এপাশ ওপাশ।

'উঁহু। আমার হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আপনি চোখ ঢেকে রাখবেন, তা চলবে না সমস্যাটা আপনার—আপনি যা ভাল বুঝবেন, সেটাই হবে। ঠিক আছে, চিন্তা করার সময় দিচ্ছি আমি আপনাকে। জর্জেস ফাইভ হোটেলে আছি আমি, লণ্ডন থেকে ফিরে আসব আপনার নয়াদিল্লী পৌঁছনোর আগেই। বাড়ি ফিরে প্রথমে জটিলেশ্বরকে ফোন করে জেনে নেবেন ও কতদূর এগিয়েছে। তারপর আমাকে ফোন করবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল শংকরলালজী।

'এক সেকেণ্ড...' চুরুটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রুডলফ

গুস্থার। 'কাজে হাত দিতে পারি? মানে, গোটাগুটি প্রস্তুতি নেব?'

ঢোক গিলল শংকরলালজী, মুখের বিভিন্ন অংশে রুমাল চেপে চেপে ঘাম মুছল।

'আমি···আমি, অনিলার সাথে আলাপ করা দরকার···তবে আপনি যদি মনে করেন কোন বিকল্প নেই···আমার, আমার মনে হচ্ছে আপনার ওপর দায়িত্ব দেয়াই ভাল। সব সময় শিখা আমার সাথে···' থেমে গেল শংকরলালজী, চরম কথাটা কিছুতেই বেরোল না মুখ দিয়ে শিউরে উঠে বলল, 'আমার যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনার সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় থাকলাম আমি। দায়িত্বটা নিতে হবে আপনাকেই। আপনি বললে তবেই কাজে নামব আমি।'

দরজা খুলে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল শংকরলালজী। ওর পিঠের দিকে চেয়ে ভ্রু কুঁচকে চোখ প্যাকাল গুস্থার।

আট

খাটের কিনারে বসে চেয়ে রয়েছে জিনা আবু হানিফের মুখের দিকে। গোল হয়ে গেছে ওর চোখ। পায়া মচকানো আর্ম চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে হানিফ, নিকোটিনের দাগওয়ালা আঙুলের ফাঁকে সস্তাদামের সিগারেট, হালকা-সবুজ সান-গ্লাসের পিছনে জ্বলছে চোখজোড়া।

প্রথমে ঠাট্টা মনে করেছিল জিনা, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা মোটেই ঠাট্টা-তামাশা নয়—সত্যিই ও পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এক স্পাই। হানিফের কথা শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত ওঠানামা শুরু করল ওর। আবু হানিফ! স্পাই! কল্পনাও করা যায় না কোন স্পাইয়ের সাথে কোন ব্যাপারে জড়িয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সে কোনদিন। জেমস বণ্ডের সব ছবি দেখেছে সে, কার্টার ব্রাউন, নিক কার্টার, লেসলি চার্টেরিস আর হ্যাডলি চেজের বেশ কয়েকটা বই পড়েছে সে হানিফের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে, দেশে থাকতে জাসুসি দুনিয়ার এক নম্বর ভক্ত ছিল সে। স্পাইদের খুবই ভাল লাগে ওর যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা পর্দায় বা পেপারব্যাক বইয়ে আটকা থাকে; কিন্তু হঠাৎ করে ওকেও স্পাইয়ের কাজ করতে হবে শুনে পিলে চমকে গেছে ওর। কথা নেই বার্তা নেই, ওকে স্পাই বানিয়ে দিলেই হলো?

'আমি পারব না! অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এসব কোন কথা শুনতে চাই না আমি। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সোজা দূর হয়ে যাও এখান থেকে। শুনতে পাচ্ছ? এই মুহূর্তে!'

'আহ, চুপ করো!' ধমক দিল হানিফ। 'যা বলছি তাই করতে হবে তোমার। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। আমাকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই, তুমি নিজেই

জড়িয়েছ এ ব্যাপারে পুরুষ দেখলেই যার মাথা ঘুরে যায়, তাকে খোদাও রক্ষা করতে পারে না মাসুদ রানাকে দেখে যদি না ভজতে, আজ আর এই অবস্থায় পড়তে হত না তোমার এখন আমাদের হয়ে কাজ না করে উপায় নেই তোমার।'

'মাসুদ রানা?' অবাক হয়ে গেল জিনা 'মাসুদ রানার সাথে এসবের কি সম্পর্ক?'

'গাধার মত কথা বলো না আমারই মত ও-ও একজন এজেন্ট বাংলাদেশের আজ রাতে ডিনার খেতে খেতে যেমন করে পারো জেনে নিতে হবে তোমার বর্তমানে কোন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে ও দরকার হলে বিছানায় যেতে হবে ওর সাথে। খবরটা জানতেই হবে আমাদের।'

'স্পাই? মাসুদ রানা? তাই যদি হয় দেখাই করব না আমি ওর সাথে ভাগ্যিস এই ঠিকানা দিইনি ওকে! আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। তুমিও জিনিস গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়ো

'আমার বস্ হুকুম দিয়েছেন আমাদের হয়ে কাজ করতে হবে তোমার।' শান্তকণ্ঠে বলল হানিফ 'উনি চান, কাজেই কাজ করতে তুমি বাধ্য, নইলে যা যা বললাম ঠিক তাই ঘটবে তোমার কপালে কারও সাধ্য নেই যে ঠেকায়।'

শিউরে উঠল জিনা হানিফের চিৎকার আর ধমকের সাথে পরিচিত সে, কিন্তু এই ঠাণ্ডা, শান্ত কণ্ঠস্বর একেবারেই অপরিচিত ওর কাছে হৃৎপিণ্ডটা বরফের মত হিম হয়ে জমে গেল ওর। সারা শরীর কাঁপছে টেনে ছেড়ে দেয়া ধনুকের ছিলার মত

কথা না শুনলে ওকে কি করা হবে বিস্তারিত বলেছে হানিফ পৃথিবীর কোনখানে পালিয়েও নাকি বাঁচতে পারবে না সে আজ হোক, কাল হোক খুঁজে বের করবে ওরা হয়তো কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল একটা লোক, হাতে অ্যাসিডের স্প্রেগান পিচকারীর মত ছুটে এল অ্যাসিড, চোখ দুটো তো অন্ধ হয়ে গেলই, মুহূর্তে দলিত মথিত দগদগে ঘায়ে পরিণত হবে সারাটা মুখ; ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে অন্ধ ভিখারী ছাড়া যেকোন পুরুষ। কিংবা আরেকটা কাজ করতে পারে: খপ করে হাত ধরে একটানে তুলে নেবে গাড়িতে, ছুটতে শুরু করবে গাড়ি, এসে থামবে কোন ভাড়া করা বাড়িতে, শুরু হবে টর্চার। ঠিক কি কি করবে পরিষ্কার জানা নেই হানিফের, কিন্তু এইরকম শাস্তি খাওয়া এক মেয়ের কাছে শুনেছে সে, এর চেয়ে নাকি অ্যাসিড মেরে মুখ পুড়িয়ে দেয়া অনেক গুণে আরামের। একনাগাড়ে তিন দিন টর্চারের পর নাকি গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় মেয়েমানুষের, ঠিকমত হাঁটতে পারে না আর জীবনে, দুই পা বেশ অনেকটা, বাঁকা করে হাঁটতে হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ওই জীবন থাকা না থাকা সমান।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জিনা হানিফের মুখের দিকে।

'আমি বিশ্বাস করি না!' ফিসফিস করে বলল সে। 'মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ তুমি আমাকে!'

উঠে দাঁড়াল আবু হানিফ। বুঝতে পেরেছে সে, ডোজটা ঠিক পরিমাণেই

পড়েছে

'ভেবে দেখো ভাল করে ভেবে নিজে সিদ্ধান্ত নাও। তোমাকে অযথা ভয় দেখাবার গরজ পড়েনি আমার বরং দুঃখই হচ্ছে তোমার জন্যে টোপ গিলে আটকে গেছ বড়শিতে। যত চেষ্টাই করো না কেন ছুটতে পারবে না আজ রাতে মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমার শেষ গ্যারিন রেস্তোরাঁয় ওর ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে জানতে হবে কথার ফাঁকে বের করতে হবে আগামী কাল, পরশু কি করবে ও। যদি সেটা বের করতে না পারো, কপালে খারাবি আছে তোমার ইচ্ছে করলে পালাতে পারো, কিন্তু ধরা তোমাকে পড়তেই হবে, কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই ভেবে দেখো ভাল করে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আবু হানিফ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে জিনা। একেবারে তিন ধাপ করে টপকে নেমে যাচ্ছে সে নিচে।

আসমা শেরির অফিসে ঢুকল রানা নিঃশব্দে। জটিলেশ্বরের কামরায় যাচ্ছিল আসমা, রানাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। বাইরের দরজাটা বন্ধ করে মিষ্টি হেসে ওর দিকে রানাকে এগোতে দেখে প্রায় উড়ে চলে গেল সে চীফের দরজার কাছে, হাতলে একটা হাত রেখে ফিরল রানার দিকে।

'আবার এসেছ!' হাসির আভাস ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'তোমাকে না দেখে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না,' বলল রানা। 'বুকের ভেতরটা কেমন জানি খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু আমাকে দেখে অত ভয় পাওয়ার কি আছে, আসমা? তুমি কি বুঝতে পারো না, সময় বয়ে যাচ্ছে, বয়সটা কারও জন্যে বসে থাকে না? নিজেকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?'

রানার বক্তব্য সবটা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না আসমা শেরি, দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে ঘোষণা করল, 'মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন, স্যার।'

'আসতে বলো।' চট করে মুখ তুলল জটিলেশ্বর ফাইল থেকে কলমটা নামিয়ে রেখে সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল ফাইল।

গ্রীবা বাঁকিয়ে রানাকে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল আসমা শেরি, বেশ খানিকটা সরে পথ দিল। ঘরে ঢুকে আবার হাসল রানা আসমার দিকে চেয়ে। 'আমার জন্যে একটা কাজ করতে পারবে, আসমা? খুব বেশি কিছু নয়, গারমিশখের আলপেনহফ হোটেলের কানেকশনটা একটু লাগিয়ে দিতে হবে '

জটিলেশ্বরের দিকে চাইল আসমা অনুমতির জন্যে। জটিল রায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই বলল, 'দিচ্ছি, স্যার, এক্ষুণি।' বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে, দরজাটা ভিড়িয়ে দিল আস্তে করে।

এগিয়ে এসে একটা চেয়ার দখল করল রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে জটিলেশ্বরের মুখের দিকে চাইল। মৃদু হাসল জটিল রায়ের চোখে তীব্র কৌতূহল দেখে।

'কিছুদূর এগিয়েছি,' বলল সে 'মনে হচ্ছে আলপেনহফ হোটেলে রয়েছে আপনার চিড়িয়া কাল সকাল সাতটা পঞ্চাশের ফ্লাইটে রওনা হচ্ছি আমি গারমিশখের উদ্দেশে। হয়তো পেয়ে যাব ওকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি পাই, কি করতে হবে আমার?'

'যেমন করে পারেন প্রথমে ওর কাছ থেকে ফিল্ম তিনটে উদ্ধার করতে হবে আপনার, তারপর ভজিয়ে ভাজিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে ওকে প্যারিসে। আমার কাছে পৌঁছে দেবেন ওকে, আমি দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

একটা ভুরু উঁচু করল রানা। 'আপনি পাঠাতে চাইলেই ও দেশে ফিরে যাবে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার সাথে এখানে আসবে কিনা তারই বা ঠিক কি? আমাকে যদি ও চুলোয় যাওয়ার উপদেশ দেয়, তাহলে আমার কর্তব্য কি? কচি খুকি নয় যে কান ধরে টেনে নিয়ে আসব।'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকাল জটিলেশ্বর। নড়ে উঠল চেয়ারে।

'কিভাবে কি করবেন সেটা আপনাকেই স্থির করতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা আপনার কাজ আপনি কেমন ভাবে করবেন, আপনি বুঝবেন ইচ্ছে করলে এক লাখ ডলার পর্যন্ত অফার করতে পারেন আপনি ওকে যদি ও সহযোগিতা করে। ফিল্ম তিনটে, আর মেয়েকে যদি ফেরত পায় তাহলে খুশি হয়েই এক লাখ ডলার দিতে রাজি হয়ে যাবে শংকরলালজী।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে আপনি কল্পনাও করতে পারেন না, এমনও কেউ থাকতে পারে যে থোড়াই কেয়ার করে টাকার। টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে ভোলানো যাবে বলে মনে হয় না আমার। আমি বাইরের লোক, আমারই সংকোচ হয় শংকরলালজীর টাকা ছুঁতে, শিখা শংকর ওর বাপকে আরও অনেক ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, সে যে ওঁর টাকা নিতে রাজি হবে না সেকথা চোখ বুজেই বলে দেয়া যায় টাকার প্রস্তাব হয়তো দেব আমি, যদি রাজি না হয় তাহলে ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসার ব্যাপারে আপনার মত আছে?'

'আপনাকে তো বলেছি, কিভাবে কি করবেন জানতে চাই না আমি, যেমন ভাবে পারেন ধরে নিয়ে আসুন।'

দরজায় দুটো টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল আসমা শেরি রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আলপেনহফ হোটেলের কানেকশন পাওয়া গেছে, স্যার।' কথাটা বলেই বেরিয়ে গেল সে।

ডেস্কের উপর রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে এগিয়ে দিল জটিলেশ্বর রানার দিকে রিসেপশন ডেস্ক চাইল রানা। কানেকশন পেয়ে বলল, 'মিস্টার উইলিয়াম নেবর কি আপনাদের ওখানে আছেন?' কয়েক সেকেণ্ড শুনল, তারপর বলল, 'না না, ধন্যবাদ তার দরকার নেই। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম উনি এখনও আছেন কিনা। আমার জন্যে কি একটা সিঙ্গেল রুম রিজার্ভ করা সম্ভব হবে?' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি 'আগামী কাল আসছি এই তিন চারদিনের

জন্যে :···মাসুদ রানা   ভেরি গুড। থ্যাংকিউ. রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল. 'নেবর রয়েছে ওখানে. আশা করা যায় শিখাকেও পাওয়া যাবে।'

'কাল যাচ্ছেন? আজ আর কোন ফ্লাইট নেই?'

'আছে. রাতের বেলা। ওতে গেলে অসুবিধে হবে।' মাথা নাড়ল রানা। 'সকাল সোয়া ন'টা নাগাদ পৌছব আমি মিউনিখে. এয়ারপোর্ট থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে গারমিশখে পৌছে যাব সাড়ে এগারোটা নাগাদ। ভাল কথা. আপনার সেক্রেটারিকে দিয়ে সাতটা পঞ্চাশের ফ্লাইটে আমার জন্যে একটা টিকেট বুক করিয়ে দিতে পারবেন না?'

'একশোবার! এয়ারপোর্টে রেডি থাকবে আপনার টিকেট।'

'ভেরি গুড.' উঠে দাঁড়াল রানা। 'একদিকের ঝামেলা চুকল. চলি এবার

'কখন কি ঘটছে জানাবেন আমাকে. আর দয়া করে সাবধান থাকবেন '

'ঠিক আছে. বড় আপা.' মুচকি হেসে বলল রানা. 'কাউকে বুকে হাত দিতে দেব না।'

হেসে ফেলল জটিলেশ্বরও. কিন্তু সাথে সাথেই গম্ভীর হয়ে গেল আবার।

'একটা কথা বোধহয় আপনার জানা নেই.' বলল সে। 'আমিও জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। তারিক আখতার এখন প্যারিসে।'

দরজার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা খবরটা শুনে।

'তাই নাকি? কেন?'

'ছয় মাসের জন্যে পাঠানো হয়েছে ওকে নতুন কিছু সিসটেম প্রবর্তন করবার জন্যে। আপনার জানা থাকা দরকার. আপনার ভয়ঙ্করতম শত্রু শংকরলালজীর প্যারিস উপস্থিতি সম্পর্কে কৌতূহলী। ওর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। চোখকান একটু খোলা রাখবেন।'

'কোন শত্রুকেই চিরস্থায়ী শত্রু মনে করি না আমি. মিস্টার রায়। সব কিছুই নির্ভর করে পরিপ্রেক্ষিতের ওপর। পট পরিবর্তনের সাথে সাথে কত শত্রু মিত্র. আর কত মিত্র শত্রু হয়ে যায়। আপনার কথাই ধরুন না. আজ থেকে সাত বছর আগে এক ছাতের নিচে এইভাবে কথা বলা সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে? কেন ছিল না? দোষটা আমার ছিল. না আপনার? আমি ভাল হয়ে গিয়েছি. না আপনি? আসলে আমরা যা ছিলাম তাই আছি. বদলে গেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আমার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা. আক্রোশ আর শত্রুতার মনোভাব ছিল একসময়ে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের, এখনও তাই আছে, তা না-ও হতে পারে। যাই হোক. খবরটা জানানোর জন্যে ধন্যবাদ। সতর্ক থাকব আমি।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল রানা। টাইপ থামিয়ে রুলারটা তুলে নিয়েছিল আসমা শেরি. রানাকে চিন্তিত মুখে ত্রস্তপদে লিফটের দিকে চলে যেতে দেখে ভ্রূকুটি করল। কি হলো লোকটার। একবার চাইল না পর্যন্ত! আবার কোনও ফ্যাসাদে ফেলল নাকি বস্ এই সিংহহৃদয় যুবককে?

রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সান্নুকি হাকাওয়াগার স্টুডিয়োর সামনে চলে এল রানা গার্ড চারজন ঠিক জায়গামত পজিশন নিয়েছে কিনা দেখে নিয়ে উঠল পার্ক করে রাখা ল্যান্সিয়ায়। কারও অনুসরণের তোয়াক্কা না রেখে ফিরে চলল সে হোটেলে। এখন সতর্কতার কোন দরকার নেই. সাবধান হতে হবে কাল সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময়। আজকের মত কাজ শেষ—হোটেলে ফিরে শেষ গ্যারিনে একটা টেবিল রিজার্ভ করবে সে ফোনে. একটা ব্যাগ গুছিয়ে রেখে স্নান করবে. পেগ দুয়েক হুইস্কি খাবে নরম বিছানায় শুয়ে. তারপর বিশ্রাম নেবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত

'ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিটে পৌঁছল রানা শেষ গ্যারিন রেস্তোরাঁয়। গেটের কাছে অভ্যর্থনা জানাল ওকে জর্জ গ্যারিন নিজে সাথে করে নিয়ে দেখিয়ে দিল ওর টেবিল। বো করে চলে গেল আর সব অতিথিদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে আসতে।

রানা টেবিলে বসতে না বসতেই চোখ পড়ল ওর জিন্নাত আযমীর উপর এগিয়ে আসছে। ওকে দেখামাত্র টের পেল রানা কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। চকচকে চোখ. আর রানার উঠে দাঁড়ানোর প্রত্যুত্তরে সংক্ষিপ্ত দেঁতো হাসি হাসতে দেখে হোঁচট খেল রানা ভিতর ভিতর. মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল সে। ব্যাপার কি! সুন্দর করে সেজেছে জিনা বাঙালী সাজে. মুগ্ধ হওয়ার কথা ছিল রানার. কিন্তু কেন জানি তেমন আকর্ষণ বোধ করছে না সে আর এই মেয়েটার প্রতি। দু'একটা কথা বলেই বুঝে নিল সে অস্বাভাবিক মানসিক চাপের মধ্যে আছে মেয়েটা। সকালের সেই সহজ. স্বাভাবিক. সাবলীল ভাবটা কোথায় গেল? হঠাৎ কি হলো ওর?

প্যাড-পেনসিল নিয়ে ওয়েটার এসে হাজির হলো. খাবার অর্ডার দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল রানা।

'কি হয়েছে?' ভুরু নাচাল সে।

'কই. কিছু না তো!' বলল জিনা

'গুরুতর ধরনের কিছু একটা হয়েছে। কি সেটা? একা একা অনর্থক মানসিক কষ্টে ভুগছেন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কুঁকড়ে আছেন ভয়ে। আমাকে বললে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি।'

'যদি বলি. আপনিই এর কারণ?' ছলছলে চোখে চাইল জিনা রানার চোখের দিকে।

'তাহলে আমি বলব. অসুবিধে যখন ঘটিয়েছি. সেটা দূর করবার অধিকার আছে আমার। ক্ষমতাও আছে। বলে ফেলুন।'

রানার হাসিতে অভয় খুঁজে পেল জিনা চট করে একবার ভেবে নিল এই লোকটাকে সব খুলে বলবে কিনা। কিন্তু সাহস হলো না যদি সব বলে. এ কি রক্ষা করতে পারবে ওকে হানিফের দলের হাত থেকে?

চুপ করে থাকতে দেখে আবার মুখ খুলল রানা।

'বুঝতে পারছি. খুব চোটপাট করেছে আপনার বয়-ফ্রেণ্ড আপনার ওপর' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল রানা।

'ও আমার বয়-ফ্রেণ্ড না.' ফুঁশে উঠল জিনা। 'ফ্যা-ফ্যা করে রাস্তায় ঘুরছিল. কদিন থাকতে দিয়েছি. মাথায় উঠে পড়েছে একেবারে '

'কিন্তু বাজে লোককে শায়েস্তা করবার তো খুব সহজ উপায় আছে ভয়ে কেঁচো হয়ে যাওয়ার তো কিছুই দেখছি না আমি যত ভয়ানক লোকই হোক না কেন. দুরস্ত করে দেয়া পানির মত সহজ।'

'যদি তার পেছনে ভয়ানক কোন দল থাকে?'

'তবু।'

'কিভাবে?'

হাসল রানা। 'কি হয়েছে না জেনে সমাধান দেব কিভাবে? আমি বুঝতে পারছি. আপনার ভয় শুধু সেই বন্ধুটি বা তার দলকে নয়. আমাকেও আমার ব্যাপারেও ভয় দেখানো হয়েছে আপনাকে অযথা সন্দেটা মাটি না করে খুলে বলুন দেখি সবটা। আশা করি সহজ সরল সমাধান দিতে পারব আমি আপনাকে আবার হাসল রানা ওর অভয়-হাসি। 'হয়তো আজই আপনার সাথে আমার শেষ দেখা. তারপর কে কোথায় চলে যাব কে জানে! এই সামান্য পরিচয়ের কয়েকটা ঘন্টা মধুর করে রাখারই চেষ্টা করব আমি পারলে কিছু উপকারই করব. ক্ষতি করব না আপনার। বলে ফেলুন।'

পনেরো সেকেণ্ড রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল জিনা আর ভাবল। রানার প্রতিটা কথা বিশ্বাস করেছে ও অকপটে। পরিষ্কার উপলব্ধি করছে সে. কোন ক্ষতি করবে না এই লোক. নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এর উপর মৃদুকণ্ঠে বলল. 'অনেক জটিল ব্যাপার। ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমার।'

'যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করব আমি।'

'আপনি বাংলাদেশের স্পাই?'

রানার কপালটা একবার কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল। বলল. 'হ্যাঁ আপনার বন্ধুটি পাকিস্তানী?'

'হ্যাঁ।'

'সানুকির ওখানে আপনি লুকিয়ে ফিল্মটা দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বন্ধুটি আপনার মুখে গল্প শুনে হঠাৎ আজ পাকিস্তানী স্পাই হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে ভয় দেখিয়েছে. আমার পেট থেকে কিছু কথা বের করতে না পারলে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবে?'

ইতিমধ্যে দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে জিনার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

খাবার দিয়ে গেল ওয়েটার। চমৎকার সুগন্ধ আসছে। জিভে পানি এসে গেল রানার।

'নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে নিন,' বলল সে। 'এই সমস্যার খুবই সহজ সমাধান আছে। কোন ভাবনা নেই আজ রাতে যেন আপনার ওপর কোন অত্যাচার না হয় সেজন্যে ওরা জানতে চায় এমন কিছু পেটের কথা বলব আমি আপনাকে। ওদের হাত থেকে স্থায়ী নিষ্কৃতি পেতে হলে কি করতে হবে তাও শিখিয়ে দেব। ভবিষ্যতে ওরা আর সাহস পাবে না আপনাকে ঘাঁটাতে। নিন, শুরু করুন।'

হিমালয় পর্বত নেমে গেল জিনার কাঁধ থেকে। কি করে বুঝে নিল লোকটা সব! সব জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া তো দূরে থাকুক হাসিটা পর্যন্ত মলিন হলো না একফোঁটা! লোকটার ভিতর প্রচণ্ড অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস পেয়ে আশ্চর্য এক কাঁপন উঠে গেল বুকের মধ্যে। এত দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী লোকের এত কাছে আসেনি সে কোনদিন। হঠাৎ ওর মনের ভিতর কেমন যেন উল্টোপাল্টা হাওয়া বইতে শুরু করে দিল, এমনটা আর হয়নি কোনদিন, কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেন এমন হচ্ছে। গল্প করছে, হাসছে, খাচ্ছে ওরা। মনের উপর থেকে মেঘের কালো ছায়াটা সরে যেতেই সহজ, স্বচ্ছন্দ, উচ্ছল হয়ে উঠেছে জিনা। ধীরে সুস্থে একের পর এক আসছে বিভিন্ন খাবার, বার্গাণ্ডি, শ্যাম্পেন। স্বপ্নের রাজ্যে চলে গেছে যেন ওরা দুজন।

খাওয়া শেষ করে স্থির দৃষ্টি রাখল জিনা রানার চোখে।

'ভাস্কর্য দেখার প্রোগ্রামটা...'

'ওটা বাদ,' বলল রানা 'সুন্দর একটা সন্ধ্যার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি গিয়ে তোমার বন্ধুটিকে বলবে শরীরটা ভাল লাগছিল না দেখে বাড়ি ফিরে এসেছ। বলবে আমার কাছে জানতে পেরেছ কাল সকাল সাতটা পঞ্চাশের ফ্লাইটে আমি জার্মেনীর গারমিশখে যাচ্ছি।'

'সত্যিই যাচ্ছ, না কি...'

'সত্যিই যাচ্ছি'

'তাহলে মিথ্যে করে বানিয়ে ওদের আরেকটা শহরের নাম বলে দিই?'

'আসল শহরের নামটা ওরা জানলে আমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি জানে যে তুমি মিথ্যে নাম বলেছ, তাহলে তোমার ক্ষতি হতে পারে।'

মিনিট পনেরো গল্প-গুজব করে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা শেয গ্যারিন থেকে। ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। জিনাকে ওতে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিল রানা। সোজা এসে উঠল লাল ল্যান্সিয়ায়।

ঘরে পৌঁছানোর সাথে সাথেই বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল জিনা।

দড়াম করে দু'পাট খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল আবু হানিফ, তার পিছনে

তার চেয়েও লম্বা কঠোর চেহারার এক লোক। বিছানার উপর বসবার নির্দেশ দিল পিছনের লোকটা জিনাকে. নিজে দখল করল একমাত্র চেয়ারটা, হানিফ দাঁড়িয়ে রইল চেয়ারের পিছনে।

'ইনি আমার বস্,' বলল হানিফ।

'সিকান্দার বিল্লাহ।' কথাটা সম্পূর্ণ করল নিষ্ঠুর চেহারার লোকটা। 'খুব চমৎকার অভিনয় করেছ তুমি, মিস জিনা। কিন্তু মাসুদ রানা দারুণ ধূর্ত লোক··· টের পেয়ে যায়নি তো কিছু?'

'আমার কাছে কিন্তু ওভার অ্যাকটিং বলে মনে হয়েছে,' বলল হানিফ। 'শেষের দিকে ও যেভাবে হাসছিল···'

'তুমি চুপ করো!' থামিয়ে দিল ওকে সিকান্দার বিল্লাহ। 'নাও, শুরু করো, মিস। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা কথা হয়েছে বলে যাও।'

'অত কথা বলতে গেলে পুরো একঘন্টা সময় লাগবে,' বলল জিনা। ওর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দেখে কপাল কুঁচকে উঠল হানিফের, কিন্তু সেটা কেয়ার না করে বলে চলল জিনা, 'অত সময়ও নেই, মুডও নেই। ক্লান্ত বোধ করছি, বিশ্রাম নেব আমি এখন। আপনাদের জন্যে খবর আছে—কাল সকাল সাতটা পঞ্চাশের ফ্লাইটে গারমিশখে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

'গারমিশখ? তুমি শিওর?' জিজ্ঞেস করল সিকান্দার বিল্লাহ।

'আমি কি করে শিওর হব, বলুন? যাবে আরেকজন, ও যা বলেছে, আমি তাই বলছি।'

'বড় ট্যাড়া ভঙ্গিতে কথা বলছ···' ধমক মারতে যাচ্ছিল হানিফ, একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল ওকে সিকান্দার বিল্লাহ।

'তুমি চুপ করো!' কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'কাল সকালে মাসুদ রানার সঙ্গে একই ফ্লাইটে হানিফ যাবে। পিছু লেগে থাকবে ওর। গারমিশখে গিয়ে ও কোথায় ওঠে জানতে হবে তোমার। কিন্তু খুব সাবধান! লোকটা ভয়ঙ্কর। দুটোর ফ্লাইটে আমিও আসছি। আমাকে চেনে ও, সেজন্যেই ওর সাথে এক ফ্লাইটে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। তোমার জন্যে আমি গারমিশখ রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করব, ও কোথায় ওঠে জেনে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে ওখানে।' জিনার দিকে ফিরল বিল্লাহ। 'তুমি যাবে আমার সাথে। তোমাকে দরকার হতে পারে। কাল ঠিক দেড়টার মধ্যে পৌঁছে যাবে তুমি অর্লি এয়ারপোর্টে। তোমার টিকেটের···'

'আমি যাচ্ছি না,' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ঘোষণা করল জিনা। 'মাসুদ রানা যা বলেছে, জানিয়ে দিয়েছি আমি আপনাদের। ব্যস, এই পর্যন্তই। আপনারা যত খুশি চোরপুলিস খেলা খেলুন গিয়ে, আমি আর এর মধ্যে নেই।'

'কী! এতবড় আস্পর্ধা! তবে রে···'

'তুমি চুপ করো।' তেড়ে উঠতে যাচ্ছিল হানিফ, সামনে এগিয়েও গিয়েছিল

এক পা, ধমক মেরে থামিয়ে দিল সিকান্দার বিল্লাহ। জিনার দিকে ফিরল। 'এই কথার অর্থ?'

'অর্থ খুবই সহজ,' বলল জিনা 'ভেবে দেখেছি আমি, এসবের মধ্যে আমার মনের কোন সায় নেই আপনারা যদি জোর জুলুম করতে চেষ্টা করেন, সোজা পুলিসে রিপোর্ট করব আমি তখন আর আমার দোষ দিতে পারবেন না। এবার আপনারা যেতে পারেন '

ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল হানিফ জিনার উপর, বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ, খপ করে ওর লম্বা চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এল দুই পা পিছনে।

'যা বলছ, বুঝে বলছ?' গর্জন করে উঠল সিকান্দার বিল্লাহ। জিনার মুখের উপর স্থির হয়ে আছে ওর খুনী দৃষ্টি, ধক্ ধক্ জ্বলছে চোখজোড়া 'তুমি জানো, ইচ্ছে করলে আমরা তোমাকে···'

'জুজুর ভয় বাড়ি ফিরে নিজের বাচ্চা মেয়েকে দেখান গিয়ে। এক মিনিটের মধ্যে এই ঘর ছেড়ে চলে না গেলে চিৎকার করে লোক জড়ো করব আমি, অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন আপনারা দুজনেই ' হানিফের দিকে চাইল সে। 'এক্ষুণি তোমার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে দূর হয়ে যাও তুমি এখান থেকে। আর কোনদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি। গেট আউট!'

চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় হয়েছে আবু হানিফের। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ফোঁশ ফোঁশ নিঃশ্বাস ছাড়ছে নাকের পাতা ফুলিয়ে। এগোতে পারছে না সিকান্দার বিল্লাহ ইস্পাৎদৃঢ় হাতে চুলের মুঠি ধরে রয়েছে বলে।

রেগে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ফণা নামিয়ে নিতে দেরি করল না সিকান্দার বিল্লাহ। এখন কোনরকম গোলমাল করলে যে বিপদে পড়বে বুঝতে পেরে মেজাজ সামলে নিল সে চট করে। চুল ছেড়ে দিয়ে আদেশ করল হানিফকে, 'যা বলছে তাই করো। সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

'কোথায় যাব।' অসহায় দৃষ্টিতে চাইল হানিফ বিল্লার মুখের দিকে।

'আমি কি জানি তার? যাবার যদি জায়গা না থাকে তাহলে একে ত্যক্ত-বিরক্ত করলে তুমি কোন্ সাহসে? কেন বিষিয়ে দিলে ওর মনটা? নিজের ক্ষমতা বুঝে মাত্রামত প্রয়োগ করতে হত। নাও, গুছিয়ে নাও সুটকেস, বেরোও এখান থেকে।' জিনার দিকে ফিরল বিল্লাহ। 'যাচ্ছি আমরা। তার আগে শুধু একটা প্রশ্ন: গারমিশখে যাওয়ার ব্যাপারটা বানিয়ে বলোনি তো?'

'না। ও যা বলেছে, আমি তাই বলেছি। সত্যি কি মিথ্যা, জানি না।'

মাথা ঝাঁকাল সিকান্দার বিল্লাহ। আর একটি কথাও বলল না সে। হানিফের ট্যাপ খাওয়া তোবড়ানো সুটকেস গুছানো হয়ে যেতেই ওকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, শেষ ধমক বা চোখ রাঙানির সুযোগ না দিয়ে।

উঠে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এল জিনা। দাঁড়াল আয়নার সামনে। মৃদু হাসি

ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

ঠিকই তো বলেছিল রানা! এত দাপট সব হাওয়ায় উড়ে গেল পুলিসের নাম করতেই। একা হানিফ হলে অবশ্য বেশ কিছুটা গোলযোগ না করে হাল ছাড়ত না, ওই লোকটা সাথে থাকায় সুবিধে হয়েছে। ভালই হয়েছে। ভালয় ভালয় চুকে গেছে ঝামেলা।

জামাকাপড় খুলে বিছানায় উঠল জিনা। চোখটা বুজতেই পরিষ্কার দেখতে পেল সে রানার ছবি।

নয়

অপূর্ব সুন্দরী বলে একসময় রীতিমত খ্যাতি ছিল অনিলা শংকরের। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আজও সে রূপে ভাটা তো পড়েইনি, বরং আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে দিন দিন। শংকরলালজীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনেক সময় অনেক কাজে দিয়েছে অনিলা শংকরের রূপ।

অত্যন্ত সচেতন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। সর্বদা সতর্ক। ফটোগ্রাফারদের দুঃখ, অসতর্ক অবস্থায় আজ পর্যন্ত একটি ছবিও তুলতে পারেনি ওরা অনিলা শংকরের ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে একটুকরো হাসি ফুটে উঠবেই ওর মুখে। মহিলা অত্যন্ত বিচক্ষণও। স্বামীর ইমেজ আরও মজবুতভাবে গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করেছে নিজেকে, সর্বক্ষণ পরোপকারের জন্যে কাজ করে চলেছে সে—যেন নিজের কোন স্বার্থ নেই, মানুষের মঙ্গলের জন্যে এক নিবেদিতপ্রাণ কল্যাণময়ী দেবী।

রাইটিং ডেস্কে বসে একটা চিঠি ড্রাফটের কাজে ব্যস্ত ছিল অনিলা শংকর, ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল শংকরলালজী। গোঁফ জোড়া ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, গাঢ় সানগ্লাসটাও খুলে রেখেছে পকেটে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অনিলা, দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল স্বামীর কাছে। চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ।

'কি ব্যাপার? কোন গোলমাল হয়নি তো? চোখের কোণে কালি পড়েছে কেন?'

'চলো। ড্রইংরুমে চলো। বলছি সব।' গোপন বৈঠকের জন্যে নির্দিষ্ট দোতলার ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াল শংকরলালজী। ত্রস্তপদে পিছু নিল অনিলা ড্রইংরুমের দরজা লাগিয়ে দিয়ে বসল দু'জন দুটো সোফায়।

'পেয়েছ ওকে?' কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করল অনিলা

'না, এখনও পাওয়া যায়নি।' জটিলেশ্বরের সাথে দেখা এবং কথাবার্তা ভেঙে বলল শংকরলালজী। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না অনিলা।

'বাংলাদেশের একটা এজেন্ট, যে তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, শুধুমাত্র টাকার লোভে রাজি হয়েছে কাজটা করতে—তাকে দিয়ে কতটুকু লাভ হবে আমাদের শুনি? এতদূর গিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার জলে ফেলার ব্যবস্থা করে ফিরেছ, বুঝতে পারছি। জটিলেশ্বর কোন সাহায্য করতে পারল না, ওর নিজস্ব বিশ্বস্ত কোন লোক নেই?'

'ওর অফিসের কাউকে কাজে লাগাতে গেলেই ব্যাপারটা অফিশিয়াল হয়ে যায়। সেটা সম্ভব নয়। ও যেটা ভাল বুঝেছে তাই করেছে। ওর বিশ্বাস, রাজি হয়েছে যখন, যেমন করে হোক ফিল্ম তিনটে আর শিখাকে খুঁজে বের করে আনবে মাসুদ রানা।'

মাথা নাড়ল অনিলা। অর্থাৎ, জটিলেশ্বরের বক্তব্যের সাথে একমত নয় সে। কিন্তু এই ব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ধরো, লোকটা খুঁজে পেল শিখাকে। তারপর কি?'

'ওকে হয়তো বুঝিয়ে শুঝিয়ে...'

'ভগবান! কোন্ স্বর্গে আছ তুমি! ওই লোক বোঝাবে? শিখাকে? নাহ্! খামোকা ঘুরে এসেছ তুমি প্যারিস থেকে। লাভটা হয়েছে কচু। আচ্ছা মেয়েই জন্ম দিয়েছিলে যাহোক। পিণ্ডি চটকে ছেড়ে দেবে তোমার। অনেক ভেবে দেখেছি আমি—রাজনীতি ছেড়ে দিয়েও নিস্তার নেই তোমার ওর হাত থেকে। যেকোন ছুতোয় বাকি ছবিগুলো ও পাঠাবেই। নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেবে আমাদের। তার চেয়ে আমি বলি, এখনও সময় আছে সব ছেড়ে দিয়ে বিদেশে কোথাও সরে পড়ার ব্যবস্থা দেখো। এদেশে আর থাকা চলবে না আমাদের।'

অবসন্ন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল শংকরলালজী। কোণের টেবিলে রাখা টেলিফোনের দিকে এগোল। পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট বই বের করে জটিল রায়ের বাড়ির নম্বর দেখে নিয়ে ট্রাংকল বুক করল প্যারিসে।

ঘাড় বাঁকিয়ে এদিকে চেয়েছিল অনিলা, অপারেটারের সাথে শংকরলালজীর নিচু গলার কথাবার্তা শুনতে পেল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকে ফোন করছ এখন?'

'কল বুক করলাম জটিলের নাম্বারে। আমাদের জন্যে কোন খবর থাকতে পারে।'

নিজের সোফায় ফিরে এসে দুই হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে রইল শংকরলালজী। কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল। শংকরজীর এই ভেঙে পড়া ভাব দেখে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছে অনিলা, সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল ঘরময়। খানিক হাঁটাহাঁটি করে কাছে এসে দাঁড়াল।

'গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দেয়া উচিত ছিল তোমার ওর পেছনে। ঠিক যেমনি করে তোমার বিরুদ্ধে কেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তাকে খতম করে দেয়ার জন্যে...'

টেলিফোন বেজে উঠতেই ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল সে কানে। 'হ্যালো?' দুই সেকেণ্ড শুনেই মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল সে শংকরজীকে। 'ট্রাংকল। প্যারিস।'

'জটিল বলছ?' উঠে এসে রিসিভার কানে তুলে জিজ্ঞেস করল শংকরলালজী।

'হ্যাঁ। ঠিকমত পৌছেছেন তো?'

'পৌছেছি। কোনও খবর আছে?'

'আছে। কিছু ভাল, কিছু মন্দ। খোলা লাইনে কথা বলছি আমরা, কাজেই সাবধানে কথা বলা ভাল।' দুই সেকেণ্ড বিরতি, 'আলী চাচাকে মনে পড়ে আপনার?'

রিসিভার ধরা হাতটা আড়ষ্ট হয়ে গেল শংকরলালজীর।

'মনে পড়ে। কেন? কি হয়েছে তার?'

'তার ভাতিজারা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এ ব্যাপারে। ওরাও চিনে ফেলেছিল নারায়ণজীকে এয়ারপোর্টে। আলী চাচার ভাতিজারা জানে যে নারায়ণজী দেখা করেছিলেন আমার সাথে।'

চুনের মত সাদা হয়ে গেল শংকরলালজীর মুখটা। তাই দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল অনিলার চোখ। ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল সে। 'কী হয়েছে! কোন খারাপ খবর?'

হাত নেড়ে চুপ করবার ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করল শংকরজী, 'ওরা কি ছায়াছবি সম্পর্কে কিছু জানে?'

'সেটা নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। তবে প্রজেক্টর দেখেছে ওরা, খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমার লোককে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।'

'ঠিক আছে, বলে যাও, আর কি খবর।'

'আমার লোক কাল সকালে গারমিশখে চলেছে। ও খোঁজ নিয়ে জেনেছে আপনার পার্টি ওখানে আছে বর্তমানে।'

'জার্মেনীর গারমিশখ? কোথায়?'

'আলপেনহফ হোটেল। ওর এক পুরুষ বন্ধুর সাথে।'

'তোমার কি মনে হয় তোমার লোক ঠিকমত কাজ উদ্ধার করতে পারবে?'

'ও যদি না পারে তাহলে পারার মত আর কাউকে দেখি না।'

'দেখা যাক, কতদূর কি হয়। কাজটা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আমি খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারছি না, জটিল। যাই হোক, তোমার সাধ্যমত যা ভাল বোঝো করো। আর, যা হয় জানিয়ো আমাকে। আর কিছু বলবে?'

'না, রাখলাম।' কানেকশন কেটে দিল জটিলেশ্বর।

'আর শোনো, একটা কথা...' কানেকশন কেটে গেছে টের পেয়ে থেমে গেল শংকরলালজী। আস্তে করে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

সোফার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, আস্তিন ধরে টানল অনিলা।

'কি হয়েছে!'

'একজন পাকিস্তানী এজেন্ট চিনে ফেলেছে আমাকে। অর্লি এয়ারপোর্টে। ব্যাপার কি বোঝার জন্যে হন্যে হয়ে খোঁজ খবর করছে ওরা। ভয়ানক কৌতূহলী

হয়ে উঠেছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।'

আঁৎকে উঠল অনিলা খবরটা শুনে। রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখটা।

'নোংরা ছবিগুলোর কথা জেনে গেছে ওরা?'

'এখনও হয়তো জেনে ফেলেনি, কিন্তু জানতে খুব বেশি দেরি হবে বলেও মনে হয় না। খোঁজ নিচ্ছে। ওদিকে মাসুদ রানা লোকটা খোঁজ পেয়েছে, গারমিশখের আলপেনহফ হোটেলে রয়েছে এখন শিখা এক পুরুষ সঙ্গী নিয়ে।'

'গারমিশখ! ওখানে কি করছে ও?'

'আমি কি করে জানব, বলো?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল শংকরজী। 'মাসুদ রানা কাল সকালে যাচ্ছে ওখানে, কাল দুপুর নাগাদ হয়তো জানা যাবে।'

'কিন্তু আমি তো বুঝি না ওই লোক ওখানে গিয়েই বা কি করবে! কোন লাভ নেই, বুঝলে? পাকিস্তানীরা যখন আদা-জল খেয়ে লেগেছে, আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক তিনদিনের মধ্যে যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত পত্রিকায় তোমার এই খবর হেডলাইন হয়ে না বেরোয় আমার নাম পাল্টে রাখব!' দাঁতে দাঁত চেপে চোখমুখ বিকৃত করল অনিলা শংকর, 'ইশ্‌শ্‌! এর চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক ভাল ছিল!'

খানিক ইতস্তত করল শংকরলালজী। গুস্তারের কথাটা অনিলাকে বলবে কি বলবে না ভাবল দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে। তারপর বলেই ফেলল, 'রুডলফ গুস্তারের সাথে দেখা হয়ে গেল প্যারিসে। এক নজরেই চিনে ফেলল আমাকে। ফেরার পথে, এয়ারপোর্টে।'

'চিনে ফেলল!' পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে অনিলা। 'কি বলল?'

'বিচ্ছিরি করে ধমক মারল। এ রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত প্যারিসে গিয়ে হাজির হওয়ায় কৈফিয়ৎ দাবি করল। সব খুলে বলতে হলো ওকে।'

'সব বলতে হলো মানে? নোংরা ছবিগুলোর কথাও বলে দিয়েছ ওকে?'

'না বলে উপায় ছিল না।'

ধপ করে বসে পড়ল অনিলা একটা ডিভানের উপর।

'নিজের স্বার্থ ছাড়া দুনিয়ার কিচ্ছু বোঝে না গুস্তার। এ কী বেআক্কেলে কাজ করলে তুমি! ওকে বলতে গেলে কেন? ও তো ব্ল্যাকমেইল করবে তোমাকে।'

'বোকার মত কথা বলছ, অনিলা। আরও আগেই ওর কাছে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের। প্লেনে আসতে আসতে অনেক ভেবে দেখেছি আমি। আমি প্রধানমন্ত্রী না হলে স্বার্থরক্ষাও হচ্ছে না, কন্ট্রাক্টও পাচ্ছে না ও। নিজের স্বার্থেই সাহায্য করতে চায় ও আমাকে।' ককটেল ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শংকরলালজী, একটা গ্লাসে খানিকটা নির্জলা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে ফিরে এসে বসল অনিলার পাশে।

'গুস্তার? গুস্তার তোমাকে সাহায্য করবে?' তীক্ষ্ণ অনিলার কণ্ঠস্বর। 'কি করে বিশ্বাস করলে তুমি ওর মত একটা পাজি লোক সাহায্য করবে তোমাকে?' ভ্রূজোড়া কুঁচকে আছে হিংস্র ভঙ্গিতে। 'বরং যদি ওকে লেলিয়ে দিতে পারতে শিখার পেছনে, যদি একেবারে শেষ করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে আসতে

পারতে...'

'গুন্থারও এই কথাই বলছিল।' মাথাটা ঝুঁকে পড়ল শংকরলালজীর। চেয়ে আছে কাঁপা হাতে ধরা গ্লাসটার দিকে। 'শিখাকে খুন করার অনুমতি চাইছিল ও আমার কাছে। ও বলছিল, ওকে পথে আনার আর কোন উপায় নেই, সর্বনাশ না করে ছাড়বে না ও কিছুতেই। একমাত্র রাস্তা হচ্ছে একেবারে শেষ করে দেয়া।'

'তুমি কি বললে?' অনিলার চোখের দুই তারায় অদম্য আগ্রহ।

'পরিষ্কার কিছু চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না তখন আমার। আমি বলেছিলাম ও যা ভাল বোঝে করুক। কিন্তু দায়িত্ব নিতে চাইল না ও, কনফার্মেশন না পেলে হাত দেবে না কাজে। সন্তান হত্যার সিদ্ধান্ত এবং আদেশের ভার আমার ওপর চাপাতে চায়, যাতে পরে কোনদিন কোনকথা না বলতে পারি।'

'তুমি কি সিদ্ধান্ত নিলে?'

উত্তর দিতে গিয়ে গাল দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল শংকরলালজীর। লাল হয়ে উঠল চোখ দুটো। খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'আমি বুঝতে পারছি, এছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের, অনিলা।'

'বাপ হয়ে...পারবে তুমি সহ্য করতে...সেই ভয়ে বলিনি আমি কোনদিন। সৎ মায়ের মুখে মানায় না একথা। কিন্তু তুমি নিজে যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, আমি সাহায্য করতে পারি তোমাকে—নিজের মুখে আর কাউকে কিছু বলতে হবে না তোমার। কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে গুন্থারের সাথে?'

মুখ দিয়ে ফোঁপানির মত একটা শব্দ বেরোল শংকরলালজীর।

'প্যারিসের জর্জেস ফাইভ হোটেলে আছে ও। শিখা কোথায় আছে, কি করছে, সব জানে ও। তবু যদি ওকে বলা হয় গারমিশখের আলপেনহফ হোটেলে আছে শিখা, ও বুঝে নেবে এটাই আমাদের গ্রীন সিগনাল।'

'ঠিক আছে, তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে। যা করার আমি করছি।'

'কিন্তু...অনিলা, ও আমার মেয়ে, নিজের...'

'মেয়ে হলে বাপের বিরুদ্ধে এমন একটা কাজ করতে পারত না,' বলল অনিলা। 'মনে করো, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলে। ও তোমার মেয়ে নয়।' শংকরলালজীর হাত ধরল সে। ওঠো। শোবে চলো। নিজের শরীরের কোন অংশে টিউমার হলে কেটে বাদ দিতে হয় সেটা, মায়া করলে চলে না। আমাদের এতদিনের কষ্ট, তিল তিল করে গড়ে তোলা রাজনৈতিক ক্যারিয়ার, মান সম্মান, প্রতিপত্তি—সব ভেস্তে যেতে দিতে পারো না তুমি একটা বিষাক্ত, ঘৃণিত, নরকের কীটের জন্যে। ওঠো। শেষ মুহূর্তে আর দ্বিধা কোরো না, লক্ষ্মী—ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ তুমি। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, এখন সব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো।'

গ্লাসটা শেষ করে টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল শংকরলালজী স্ত্রীর আকর্ষণে। স্খলিত পদে এগোল বেডরুমের দিকে। বিছানার ধারে বসে করুণ

চোখে চাইল অনিলার মুখের দিকে।

'আমার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে, অনিলা। তুমি বলো, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? মাসুদ রানা কতটা কি করতে পারে দেখলে হত না? যদি ও মেয়েটাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে...মানে, ক'টা দিন অপেক্ষা করলে হয় না?'

'বৃথা।' এক কথায় জবাব দিল অনিলা। 'গত ছয় বছর ধরে দেখছ ওকে, আর ক'টা দিনে নতুন করে কি দেখবে? কাপড়টা ছেড়ে শুয়ে পড়ো। সব চিন্তা দূর করে দাও মাথা থেকে। যা করবার করছি আমি।'

আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল অনিলা ঘর থেকে।

মিনিট পাঁচেক পাথরের মূর্তির মত বসে রইল শংকরলালজী ড্রইংরুম থেকে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ ভেসে আসতেই দাঁতে দাঁত চেপে ধরল সে। তীব্র এক যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল চোখ-মুখ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে বালিশের উপর। ফোঁপাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে পিঠটা।

জর্জেস ফাইভ হোটেলের গাড়ি বারান্দায় থেমে দাঁড়াল একটা কালো থাণ্ডারবার্ড। গাড়ির দরজা খুলে দেয়ার জন্যে এগিয়ে এল ঝলমলে ইউনিফরম পরা দারোয়ান।

নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল জ্যাক ডজ।

'গাড়িটা পার্ক করে রাখো,' বলল সে গম্ভীর গলায়। 'আমি আসছি এখুনি।'

দ্রুতপায়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ডিঙিয়ে হোটেল লবিতে উঠে গেল সে। সোজা গিয়ে দাঁড়াল কনশিয়ার্যের ডেস্কের সামনে।

'মিস্টার রুডলফ গুস্থার,' বলল ডজ।

বার কয়েক দেখেছে কনশিয়ার্য এই লোকটাকে। একটা পয়সাও বখশিস পাওয়া যায় না এই লোকের কাছে। হোটেল স্টাফের কেউ দেখতে পারে না ওকে দুচোখে, কিন্তু লোকটার চালচলনে এমনি কিছু আছে, যে একটি কথাও বলতে পারে না কেউ ভয়ে। নির্বিকার মুখে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল সে, সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার পর নামিয়ে রাখল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'পাঁচতলায় চলে যান, মশিয়ে। চারশো সাতান্ন নম্বর স্যুইট।' হাসল মাপা হাসি। 'উনি অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

জ্যাক ডজ হচ্ছে রুডলফ গুস্থারের প্রফেশনাল কিলার। মশা বা মাছি মারার মত মানুষ মারে সে। বিন্দুমাত্র বিকার নেই। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোন বছর। বাম চোখটা কাঁচ দিয়ে বাঁধানো। বাম গালে একটা লম্বা চেরা ক্ষতচিহ্ন চোখের কোণ থেকে প্রায় চিবুক পর্যন্ত টানা। বাম হাতের অনামিকা আর কড়ে আঙুল নেই। মুখের আকৃতি লম্বাটে—অনেকটা কুঠারের মত, কোন রকম ভাবের পরিবর্তন নেই সেখানে। মাথার চুল খুব হালকা, তার উপর ক্রুকাট দেয়ায় খুস্কিভরা মাথার খুলি দেখা যায় পরিষ্কার। রেডিমেড দোকান থেকে কেনা একটা কালো ফ্ল্যানেলের স্যুট ঢলঢল করছে ওর চিকন শরীরে, হাতে একটা স্লাউচ হ্যাট।

পৃথিবীর কোথাও কাউকে শেষ করে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে একে ডেকে পাঠায় রুডলফ গুন্থার। প্রতিটি খুনের জন্যে ওর ফি হচ্ছে পনেরো হাজার ডলার। তাছাড়া কাজ থাকুক আর নাই থাকুক বছরে ত্রিশ হাজার ডলার রয়েছে ওর বাঁধা বেতন। মোটকথা ভালই আছে সে।

লিফটে করে উঠে এল ডজ পাঁচতলায়, চারশো সাতান্ন নম্বর স্যুইটের দরজায় বসানো কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল মৃদু। দরজা খুলল গুন্থারের মালয়েশিয়ান বডিগার্ড, কারাতে বুদোকা ইন্টারন্যাশনালের প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর নোবুরু সিনোমাকি।

'হেল্লো!' বলল জ্যাক ডজ। 'কি খবর? বস্ কোথায়?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ওকে নোবুরু সিনোমাকি, তারপর হাত বাড়াল সামনে।

'উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিস্তলটা জমা দিয়ে ঢুকে পড়ুন ঘরে।' বাম হাতে একটা ভারি পর্দা টাঙানো দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে দিল জ্যাক ডজ। পানসে হাসি হাসল। 'আজকাল আর আমাদের বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না বস্?'

যেন হাজার মাইল দূর থেকে বলছে, এমন একাকী, নিঃসঙ্গ ভঙ্গিতে বলল সিনোমাকি, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। নতুন নিয়ম। যান, ঢুকে পড়ুন ভেতরে।'

সুন্দরী এক সেক্রেটারিকে ডিকটেশন দিচ্ছিল গুন্থার, ডজকে দেখে থেমে গেল, হাত নেড়ে বিদায় করে দিল মেয়েটাকে। মেয়েটা বেরিয়ে যেতেই বলল, 'বসো, জ্যাক, তোমার জন্যে কাজ আছে একটা।'

পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল জ্যাক ডজ। কোন রকম সম্ভ্রম না দেখিয়ে পায়ের উপর পা তুলে সিগারেট বের করল পকেট থেকে। একটা ভুরু উঁচু করে বলল, 'সেটা অনুমানেই বুঝে নিয়েছি।' ফস করে ম্যাচ জ্বালল। 'এবার কাকে?'

'একটু দূরে যেতে হবে এবার। প্রস্তুতির জন্যে কতটা সময় দরকার তোমার?'

'সময় লাগবে না। এই মুহূর্তে তৈরি আমি। একটা ট্র্যাভেল ব্যাগ সব সময় গুছানো থাকে আমার গাড়িতে। কোথায় যেতে হবে?'

'মিউনিখ।' কথাটা বলেই ব্রিফকেস থেকে একটা পুরু এনভেলাপ বের করল গুন্থার। 'এর মধ্যে সবকিছু পাবে—তোমার ইন্সট্রাকশন, প্লেনের টিকেট, ট্রাভেলার্স চেক—সব। এবার একসাথে দুজনকে শেষ করতে হবে তোমার। একটা মেয়ে: শিখা শংকর, একটা পুরুষ: উইলিয়াম নেবর। মেয়েটার একখানা ফটোগ্রাফ রয়েছে এর মধ্যে, কিন্তু লোকটার কোন ছবি সংগ্রহ করা যায়নি তবে একসাথে পাবে ওদের দুজনকে। কাজটা খুবই জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। যেই মুহূর্তে জানতে পারব মারা পড়েছে ওরা, তোমার অ্যাকাউন্টে জমা দেয়া হবে ত্রিশ হাজার ডলার।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নিল জ্যাক ডজ। ভিতরের জিনিসপত্র বের করে রাখল সামনে কফি টেবিলের উপর। শিখা শংকরের ছবিটা দেখল সে কয়েক

সকেণ্ড, সেটা নামিয়ে রেখে টাইপ করা একখানা শীট তুলে নিয়ে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পড়ল মন দিয়ে, তারপর চোখ তুলল।

'এখানে বলছেন ফিল্মগুলো উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত যেন ওদের গায়ে হাত না দিই। কি করে বুঝব কখন উদ্ধার হলো ওগুলো?'

'মাসুদ রানা উদ্ধার করবে ওগুলো। ওর ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখবে আমার লোক। ওর ব্যাপারে আপাতত তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তুমি গিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকবে, ঠিক সময় মত সিগনাল দেয়া হবে তোমাকে। খুব দ্রুত কাজ সেরে ফিরে আসবে তুমি প্যারিসে।'

'ব্যাপারটা কেমন ভাবে ঘটাতে চান? কি রকমের প্রস্তুতি নেব?'

কয়েক সেকেণ্ড চুরুট টানল গুন্থার, তারপর বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট। শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ গুলি লেগে যেতে পারে।'

'উঁহুঁ'! মাথা নাড়ল ডজ। 'এইভাবে দুজনকে মারা যায় না। না। একজন ভুল করে গুলি খেতে পারে—একই ভাবে দুটো অ্যাকসিডেন্ট হয় না। জার্মান পুলিস গোবর খায় না।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত নাড়ল গুন্থার। সমস্যার খুঁটিনাটি দিকগুলো সবসময় বিরক্তি উৎপাদন করে ওর।

'কিভাবে কি করবে সেটা তুমি ঠিক করো। আমি চাই, অ্যাকসিডেন্টের মত কিছু একটা ঘটুক—কেউ যেন খুন বলে মনে না করে ব্যাপারটা। ওবেরামারগোতে আমার একটা এস্টেট মত আছে। ওখানকার ইন-চার্জকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সব রকমের সাহায্য পাবে তুমি ওর কাছ থেকে। ওর নাম হচ্ছে কাউন্ট হ্যানস ফন কীসলার। মিউনিখ এয়ারপোর্টে তোমাকে রিসিভ করে ওর ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে ও। ওর কাছেই পরিস্থিতির অগ্রগতি সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারবে তুমি।'

'আর অস্ত্র?' ভুরু নাচাল ডজ। 'কি অস্ত্র নেব সাথে?'

'কিছু না। ওখানেই তোমার যা দরকার সব পাবে তুমি। জনা তিরিশেক কর্মচারী আছে আমার ওখানে, ইচ্ছে করলে ওদেরকেও ব্যবহার করতে পারবে যেমন খুশি।'

সবকিছু এনভেলাপে ভরে এনভেলাপটা পকেটে পুরল জ্যাক ডজ, তারপর উঠে দাঁড়াল।

'দুটোর প্লেন ধরতে হলে এখুনি বেরিয়ে পড়া ভাল।'

'যাও। শুধু একটা ব্যাপারে সাবধান করব আমি তোমাকে। আর দুজন কোন সমস্যাই নয়, কিন্তু মাসুদ রানার ব্যাপারে খুব সাবধান! লোকটা ভয়ঙ্কর।'

পিশাচের হাসি ফুটে উঠল জ্যাক ডজের কুড়োল-মার্কা মুখে।

'ভাল কথা। সাবধান থাকব।'

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না ডজ। সিনোমাকির কাছ থেকে পিস্তলটা ফেরত

নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। থাণ্ডারবার্ডটা অর্লি এয়ারপোর্টের দিকে হাঁকিয়ে দিয়ে মুচকি হাসল সে আপন মনে।

শিখার ব্যাপারে যে পাকিস্তানীরাও তৎপর হয়ে উঠেছে, এই সংবাদটা গুস্থারকে জানাতে ভুলে গিয়েছিল অনিলা শংকর। জ্যাক ডজ যদি জানত শুধু মাসুদ রানা নয়, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের বিরুদ্ধেও ওকে দাঁড়াতে হতে পারে, তাহলে এই আত্মবিশ্বাসের হাসি হয়তো মুছে যেত ওর ঠোঁট থেকে।

চারপাশ থেকে কালো মেঘ এসে জমছে এখন গারমিশখের আকাশে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার।

যে-কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত

নীল ছবি-২

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

দশ

মিউনিখ এয়ারপোর্টের কাস্টম্‌স্‌ ব্যারিয়ার পেরিয়ে বিশাল হলরুমে চলে এল মাসুদ রানা. খুশি মনে এগোল হার্য রেন্টাল কার সার্ভিসের সাইনবোর্ড টাঙানো কাউন্টারের দিকে।

আবু হানিফ অনুসরণ করছিল ওকে. থেমে দাঁড়াল। গাড়ি ভাড়া নেয়ার মত টাকা ওর কাছে নেই, যথেচ্ছ খরচ করবার অনুমতি পায়নি সে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে—অথচ রানাকে হারিয়ে ফেললে চলবে না। রাগ হলো ওর সিকান্দার বিল্লার উপর। যেমন খুশি খরচ করবার ব্যবস্থাও নেই, ওদিকে আবার কাজটাও চাই পুরোপুরি! কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটার সাথে মাসুদ রানার কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল সে কান খাড়া করে।

পকেট থেকে হার্য ক্রেডিট কার্ড বের করে দেখাল রানা মেয়েটাকে. মিষ্টি করে হাসল. বলল একটা মার্সিডিস টু থার্টি চায় সে। রানার হাসি সংক্রামিত হলো সুন্দরী মেয়েটির চোখে।

'নিশ্চয়ই, স্যার,' বলল মেয়েটা। 'কতদিনের জন্যে লাগবে মনে করেন?'

'সেটা ঠিক করিনি এখনও,' বলল রানা। মেয়েটাকে দেখল আবক্ষমস্তক। 'সেটা নির্ভর করে আপনার দেশটা আমার কতখানি ভাল লাগে তার ওপর। দেশটা যদি আপনার মত এত অপূর্ব সুন্দর হয়, বলা যায় না, বাকি জীবন হয়তো এখানেই কাটিয়ে দিতে পারি।'

হেসে উঠল মেয়েটা, লজ্জাও পেয়েছে খানিকটা।

'কি লিখব…সপ্তাহখানেক?'

'খোলা রাখুন—কিছুই ঠিক করিনি এখনও, তারিখ বসানোর দরকার নেই।' কাউন্টারে কনুই রেখে একটু ঝুঁকে এল রানা। দ্রুত হাতে ফরম পূরণ করছে মেয়েটা, লেখা শেষ করে এগিয়ে দিল কাগজটা, সই করে ফিরিয়ে দিল ওটা রানা, বলল, 'ধন্যবাদ।'

'গাড়িটা এখানে আনানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, স্যার,' বলে টেলিফোনে কয়েকটা কথা বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'পাঁচ মিনিটে এসে যাবে, স্যার। ওই যে, আপনার ডানদিকে বেরোবার দরজা।' হাসল ঝকঝকে হাসি। 'ওয়েলকাম টু আওয়ার লাভলি কান্ট্রি।'

'থ্যাংকিউ।'

নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরের ম্লান রোদে। দূরে একটা মার্সিডিস দেখে বুঝতে পারল ওর জন্যেই আসছে ওটা।

'কিছু মনে করবেন না,' পিছন থেকে শোনা গেল একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর। 'আপনি কি গারমিশখের দিকে যাচ্ছেন?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। সরু, লম্বা, হিপ্পি চেহারার এক ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে হালকা সবুজ রঙের সানগ্লাস। পিঠে একটা রাকস্যাক বাঁধা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'লিফট চান?'

'পেলে ভাল হত,' বলল হানিফ, 'আপনার অসুবিধে থাকলে অবশ্য...'

ঠিক এমনি সময়ে একটা কালো মার্সিডিস এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। সাদা ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার বেরিয়ে এসে স্যালিউট করল রানাকে।

'এই গাড়ির সবকিছু জানা আছে আপনার, স্যার?'

'আছে,' বলল রানা। সুটকেসটা পিছনের সীটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বখশীশ দিল ড্রাইভারকে, পিছন ফিরে ডাকল হানিফকে, 'আসুন, উঠে পড়ুন।'

সামনের সীটে উঠে পড়ল হানিফ, রাকস্যাক খুলে মেঝেতে নামিয়ে রাখল দুই পায়ের ফাঁকে। রানা উঠল ড্রাইভিং সীটে, ছেড়ে দিল গাড়ি।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল হানিফ। 'লিফট না দিলে মহা অসুবিধেয় পড়ে যেতাম আমি।' একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বাংলাদেশের লোক?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার মুখ না দেখে কেবল কথা শুনলে কেউ বলতে পারবে না যে আপনি ফ্রেঞ্চ নন।'

'চলেবৃল্,' বলল রানা, 'মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে সামান্য বিদ্যেতেই পার পাওয়া যায়। আপনি কোন্ দেশের?' মিউনিখের পথে হাইওয়ে ধরে তুফানবেগে ছুটছে মার্সিডিস।

'আমি আলজিরিয়ান। মুসলিম। প্যারিসেই জন্ম, ওখানেই মানুষ। নাম—আবু হানিফ। ছুটিতে আছি। ইসার ভ্যালে থেকে বাড টল্য্ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছে আছে আমার।'

অর্লি এয়ারপোর্টে কেনা একটা জার্মান গাইড বুক ঘেঁটেছে সে প্লেনে সারা পথ, মনে রেখেছে নামগুলো। গড়গড় করে আরও কিছু তথ্য বলে গেল সে ইসার ভ্যালে সম্পর্কে, টেরও পেল না, ওর নামটা শোনার সাথে সাথে রানার ঠোঁটে সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। গতরাতে জিনার কাছে শুনেছিল সে এই নাম।

'হাঁটার জন্যে আবহাওয়াটা চমৎকার,' বলল রানা।

কথাটার মধ্যে অন্য ধরনের কোন বক্তব্য আছে কিনা বোঝার জন্যে রানার মুখের দিকে চাইল হানিফ। নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে ছুটিতে, না কাজে?'

'কিছু কিছু করে দুটোই। আপনি গারমিশখ থেকে হাঁটা শুরু করছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তবে দিন কয়েক ওখানে থেকে তারপর রওনা হওয়ার ইচ্ছে আছে। অবশ্য যদি ওখানে সস্তা হোটেল পাওয়া যায় তাহলেই।'

'সেজন্যে চিন্তা নেই,' বলল রানা। 'প্রচুর সস্তা হোটেল আছে গারমিশখে। শহরে ঢোকার মুখেই আছে কয়েকটা। ঠিক জায়গামতই নামিয়ে দেব আপনাকে।'

সিকান্দার বিল্লাহ আর ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের সাবধানবাণী স্মরণ করে আর কোন প্রশ্ন না করাই স্থির করল হানিফ। ওরা দুজনেই বার বার করে সাবধান করেছে ওকে এই লোকটার ব্যাপারে। নেহায়েত কপালগুণে এরই গাড়িতে করে চলেছে সে এরই উপর নজর রাখতে, কোন্ হোটেলে উঠছে জিজ্ঞেস করাটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। চুপচাপ বসে রইল সে বাইরের দিকে চেয়ে। এর কাছে লিফট চাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেই সে যার পর-নাই খুশি হয়ে উঠেছে নিজের উপর।

মিউনিখে পৌঁছে ই-সিক্স হাইওয়ে ধরে ছুটল রানা গারমিশখের পথে। সত্তর-পঁচাত্তর মাইল যেতে হবে—কাজেই স্পীড বাড়িয়ে দিল। ঘণ্টা না পুরতেই পৌঁছে গেল ওরা। স্কয়্যারের কাছে গাড়ি থামিয়ে বামদিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা।

'ওইদিকটায় তিন-চারটে হোটেল পাবেন, যেটার ভাড়া পোষায় উঠে পড়ুন সেটাতে।'

'আপনি এগুলোর কোনটায় উঠছেন না?' নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল হানিফ।

'আমার হোটেল আরও কিছুদূর আগে,' হানিফের বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা। 'উইশ ইউ হ্যাপি ভ্যাকেশন।'

'থ্যাংকস ফর দ্য রাইড,' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল হানিফ, রানা মাথা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

মার্সিডিসের পিছু পিছু হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে শুরু করল হানিফ। অসুবিধে হলো না তেমন। সরু রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড় রয়েছে বলে বেশি জোরে চালাতে পারছে না রানা। আধমাইল রাস্তা খানিক দৌড়ে, খানিক হেঁটে দেখতে পেল সে আলপেনহফ হোটেলের ড্রাইভওয়েতে ঢুকছে মার্সিডিস। রানা কোথায় উঠছে দেখে নিয়ে খুশিমনে নিজের জন্যে কাছেপিঠেই একটা সস্তা হোটেল খোঁজার কাজে মন দিল সে।

আলপেনহফ হোটেলের লবিতে ঢুকতে যাচ্ছে রানা, এমনি সময়ে কাঁচের দরজা ঠেলে মোটাসোটা বেঁটে এক লোক বেরিয়ে এল বাইরে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স, কিন্তু হাবভাবে মনে হয় পঞ্চান্ন। পরনে সাদা স্ল্যাকস আর নীল পোলো নেক সোয়েটার। লোকটার কয়েক হাত পিছন পিছন যে মেয়েটা আসছে তাকে এক নজর দেখেই চিনতে পারল রানা—শিখা শংকর। লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি হবে, ভারতীয় হিসেবে বেশ লম্বাই বলতে হয়। কাঁধ পর্যন্ত ববচুল। কালো একটা স্ট্রেচ-প্যান্ট আর সাদা স্কয়্যার-নেক সোয়েটার পরেছে—এতই আঁটো, যে শরীরে

কোথায় কি আছে বুঝতে অসুবিধে হবে না ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধেরও। দারুণ ফিগার!—মনে মনে স্বীকার না করে পারল না রানা।

ঢুকতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মহিলা দেখে থেমে দাঁড়িয়ে আগে যাবার সুযোগ দিল। তিন সেকেণ্ড রানার মুখের ওপর স্থির থাকল শিখার অনুসন্ধানী দৃষ্টি, তারপর সামান্য একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল ওর লিপস্টিকচর্চিত লাল ঠোঁটে। নিচু গলায় বলল, 'মার্সি মশিয়ে।'

'চলে এসো, শিখা!' পুরুষ লোকটার অসহিষ্ণু কণ্ঠ শোনা গেল। 'জলদি! এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটল শিখা শংকর, গাঢ় লাল একটা ছাদখোলা, টু-সীটার হোন্ডা স্পোর্টস কারে উঠে বসল দুজন, বিকট আওয়াজ তুলে স্টার্ট নিল গাড়িটা, বাঘের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গিয়ে বড় রাস্তায়, বিপজ্জনক বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল রানার চোখের সামনে থেকে।

রিসেপশন ডেস্কের সামনে এসে সুটকেসটা নামিয়ে রাখল রানা।

'আমি মাসুদ রানা। একটা কামরা বুক করা আছে আমার জন্যে. দেখুন তো নম্বরটা কত?'

চশমা আঁটা বৃদ্ধা রেজিস্টার না দেখেই উত্তর দিল, 'দোতলা। একশো আট।' আগে থেকেই বেশির ভাগ পূরণ করে রাখা একটা ফর্ম এগিয়ে দিল সে রানার দিকে।

'থ্যাংকস ম্যাডাম,' বলপেন দিয়ে ফরমের বাকি অংশ পূরণ করতে করতে চোখ তুলল রানা। 'একটু আগে বেরিয়ে গেলেন…মিস্টার নেবর না? চেহারাটা চেনা চেনা লাগল।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার। উনি মিস্টার উইলিয়াম নেবর।'

'হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন?'

'না, স্যার। আরও এক সপ্তাহ থাকছেন উনি আমাদের হোটেলে।'

খুশিমনে ফর্ম ফিলাপ করে দিয়ে পোর্টারের সাথে নিজের কামরায় চলে এল রানা। ঘড়ি দেখল। এগারোটা বাজে। পোর্টারকে আশাতিরিক্ত বখশিস দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার নেবর কি এই ফ্লোরেই উঠেছেন, নাকি ওপরের কোথাও?'

'এই ফ্লোরেই, স্যার।' একগাল হাসল পোর্টার। 'আপনার ঠিক সামনের কামরাটাতেই। কিন্তু উনি এখন বাইরে।'

সারাটা দিন কি করবে ভাবল রানা। নেবর আর শিখা খুব সম্ভব সারাদিনের জন্যে কোথাও আউটিঙে গেছে। খামোকা হোটেল কামরায় বসে না থেকে চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখে এলে মন্দ হয় না স্থির করে কাপড় বদলাল সে। দরজায় চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রানাকে মার্সিডিস নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল হানিফ। কাঁধ ঝাঁকাল। করবার কিছুই নেই ওর এখন। ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার আর সিকান্দার বিল্লাহ এসে না

পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু করবার হুকুমও নেই। লোকটা কোথায় ওঠে সেটা জানবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ওর উপর, চমৎকার ভাবে দায়িত্ব পালন করেছে সে। ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত ধেয়ে আসছে যখন, নিশ্চয়ই বিরাট কিছু ঘটবে এই গারমিশখে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু। কেন জটিলেশ্বর রায় গিয়েছিল হোটেল লিরিকে মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা করতে, কেনই বা গারমিশখে ছুটে এসেছে মাসুদ রানা—সব রহস্য উদঘাটিত হবে ধীরে ধীরে। রানার বিরুদ্ধে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে রীতিমত গর্ব বোধ করছে সে। এই চোর-পুলিস খেলা বেশ ভালও লাগছে—কিন্তু থেকে থেকে মনটা কালো হয়ে যাচ্ছে গতরাতে জিনার ব্যবহারের কথা ভেবে। হঠাৎ এত সাহস পেল কোত্থেকে ও? মিথ্যে কথা বলেনি বোঝা যাচ্ছে মাসুদ রানার গারমিশখে আসা দেখে, কিন্তু··· কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে জিনা লোকটার সাথে ডিনার খেয়ে ফিরে এসে। এই রহস্যও উদঘাটন করতে হবে ওর। ওকে উচিতমত শায়েস্তা করতে না পারলে অর্থহীন হয়ে যাবে ওর জীবনটা। প্যারিসে ফিরে কিভাবে কি করবে সেই প্ল্যান তৈরিতে মন দিল সে।

ওয়াইজের রোকোকো চার্চ দেখে লাঞ্চ খেতে ফিরে এল রানা হোটেলে। অপূর্ব সুন্দর, বিশাল গির্জার অভ্যন্তরীণ কারুকার্য দেখতেই গিয়েছিল, কিন্তু হালকাভাবে এক চক্কোর ঘুরে বেরিয়ে এসেছে সে, আজকে ঠিক এসব দেখার মুড নেই ওর, তার চেয়ে রাস্তার দুপাশের পাহাড়, জঙ্গল আর সবুজ মাঠ দেখতেই ভাল লাগছে। ধীরেসুস্থে এইসব দেখতে দেখতে ফিরছিল রানা হোটেলের দিকে, এমনি সময়ে সরু একটা রাস্তার পাশে গাঢ় লাল দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোড় নিল সেদিকে। রাস্তার দুধারে রাশি রাশি জংলী ফুলের গাছ, বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লাল হোন্ডা স্পোর্টস কার, ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে আছে শিখা শংকর। গতি আরও কমাল রানা। বনেট খুলে এঞ্জিন পরীক্ষা করছে নেবর। থেমে দাঁড়াল রানা পাশে।

'আটকে গেছেন বুঝি? সাহায্য দরকার?' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করল রানা।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানাকে পরীক্ষা করল উইলিয়াম নেবর। সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে ঠোঁট বন্ধ রেখেই মৃদু হাসল। পেশীবহুল সবল হাতে হতাশার মুদ্রা দেখাল। 'চলতে চলতে থেমে দাঁড়াল। কোথায় যে কি হয়েছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। জানেন কিছু? এঞ্জিন সম্পর্কে?'

মার্সিডিসটা একটু সামনে বাড়িয়ে সাইড করে রেখে নেমে এল রানা। ইচ্ছে করেই একবারও চাইল না শিখা শংকরের দিকে। হোন্ডার এঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে নেবরকে গাড়ির ভেতর যাওয়ার ইঙ্গিত করল।

'স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করুন দেখি। গাড়ির বক্তব্য শোনা যাক একটু।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে চাবি ঘোরাল নেবর। সেলফ স্টার্টার 'কুঁইকুঁই' করছে ঠিকই, কিন্তু এঞ্জিন চালু হচ্ছে না। হাঁক ছাড়ল রানা, 'ঠিক আছে, বন্ধ করুন এবার। ফুয়েল আছে তো ট্যাংকে?'

'চারভাগের তিনভাগ ভর্তি।'

'তাহলে মনে হয় পেট্রল ফীডে ময়লা আছে।' হাত বাড়াল রানা। 'টুল্‌স্‌-কিট আছে না গাড়িতে?'

'ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ এগিয়ে দিল নেবর, নেমে এসে দাঁড়াল পাশে। দশ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল গাড়ি। ইগনিশন কী ঘোরাতেই স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। শ্যাময়-লেদারে হাত মুছে স্মিত হাসি হাসল রানা। 'জানলে পরে আসলে সব সোজা।'

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে নেবর বলল, 'থ্যাংকিউ ভেরি মাচ। মস্ত বাঁচা বাঁচালেন।'

'ও কিছু না। নিজের বিদ্যাটা প্রয়োগ করতে পেরে খুশি হয়েছি আমি।' কথাটা বলে শিখা শংকরের দিকে চাইল রানা এতক্ষণে। প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে শিখা রানার দিকে, মুখে উজ্জ্বল হাসি।

'দারুণ লোক আপনি! যেমন চেহারায়, তেমনি কাজে!'

'যদি অনুমতি দেন, প্রশংসার শেষটুকু আমি নিয়ে প্রথমটুকু আপনাকে ফেরত দিতে চাই। ওটা আপনার প্রাপ্য।' ভুবনভোলানো হাসি হাসল রানা শিখার দিকে চেয়ে, তারপর নিজের গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেল হোটেলের পথে।

এগারো

ফার্স্ট-ক্লাস একপেট লাঞ্চ খেয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল রানা। জামাকাপড় ছেড়ে ড্রেসিংগাউনটা গায়ে চড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খামোকা উদ্বেগে না ভুগে সেঁটে ঘুম দেয়াই পছন্দ করে সে বেশি। মনে মনে ঠিক করে নিল ঠিক ছ'টার সময় উঠব। ব্যস, তিন মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল সে।

ঠিক ছ'টা বাজতে এক মিনিটে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ভিজল মিনিট পাঁচেক, তারপর একটা মিডনাইট-ব্লু স্যুট পরে নিল, পায়ে দিল কালো সোয়েড শু। টাই বাঁধতে বাঁধতে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নায় নিজের চেহারাটা বেশ পছন্দই লাগল ওর কাছে। সন্তুষ্টচিত্তে একটা আর্ম চেয়ার নিয়ে রাখল দরজার পাশে। দরজাটা সামান্য এক চিলতে ফাঁক করে বসল অপেক্ষায়।

ঠিক সাড়ে সাতটায় দরজা খোলার শব্দে সচকিত হলো রানা। সামনে ঝুঁকে এক চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে নেবর। দরজায় চাবি লাগাচ্ছে এখন। চেয়ারটা যথাস্থানে রেখে আনমনে বেরিয়ে এল রানা নিজের কামরা থেকে। যেন নেবরকে খেয়ালই করেনি এমনি ভঙ্গিতে দরজায় চাবি লাগিয়ে এলিভেটরের দিকে রওনা হতে গেল।

ওকে চিনতে পেরে হাসি ফুটে উঠল নেবরের ঠোঁটে। হাত বাড়াল সামনে।

'আরে! এখানেও আপনি! ঘুরতে ঘুরতে বার বার দেখা হয়ে যাচ্ছে। এতেই প্রমাণ হয় যে দুনিয়াটা গোল।'

হ্যান্ডশেক করল রানা।

'তাই তো!' বলল সে। 'আপনারা এই হোটেলে উঠেছেন জানতাম না। আর কোন গোলমাল করেনি তো গাড়ি?'

'না। একেবারে পক্ষীরাজ হয়ে গেছে ওর পর থেকে। ভাগ্যিস আপনি সময়মত গিয়ে হাজির হয়েছিলেন! খুব ব্যস্ত আছেন নাকি? আসুন না, একসাথে কিছু ড্রিংক করা যাক। দুপুর বেলা এতই কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম যে তখনই মনে মনে ঠিক করেছি সুযোগ পেলে অন্তত একগ্লাস হুইস্কি না খাইয়ে ছাড়ব না।'

'আরে না, না। কৃতজ্ঞতার কি আছে? সামান্য ব্যাপার।' নেবরের সাথে সাথে হাঁটতে শুরু করল রানা। নিজের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করল। 'কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছি আমি এখানে। প্যারিসে কাজের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম একেবারে। বেরোতে না পারলে মারাই পড়তাম। এখানে ভাল কোন রেস্তোরাঁ জানা আছে আপনার? হোটেলের খাবার রোজ রোজ খেতে ভাল লাগে না আমার। কাছেপিঠে ভাল কোন...'

এলিভেটরে করে নামছে ওরা দুজন। অবাক হয়ে চাইল নেবর রানার মুখের দিকে।

'আরে! আপনি একা নাকি? তাহলে তো আমাদের সাথে ডিনারটা আপনার খেতেই হবে। খুব খুশি হব।'

'কিন্তু আপনার স্ত্রী...' কথাটা সম্পূর্ণ করল না রানা।

হেসে উঠল নেবর। এলিভেটর থেমে দাঁড়াতেই বেরিয়ে এল ওরা বাইরে।

'ও আমার স্ত্রী তা কে বললো আপনাকে? এমনি আছি ক'দিন একসাথে আপনার সঙ্গ পেলে খুবই খুশি হবে ও। ইতিমধ্যেই আপনার প্রশংসায় ভারি করে ফেলেছে আমার কান।'

হাসল রানাও।

'সত্যিই। আপনার পছন্দ আছে বলতে হবে।'

কোণের ছোট্ট বারে গিয়ে ঢুকল দু'জন। একটা টেবিল দখল করে দু'জনের জন্যেই অর্ডার দিল নেবর ডাবল স্কচ অন রক্স্।

'আমি ফটোগ্রাফিক লাইনে আছি,' পরিচয়ের সূত্রপাত করল নেবর। 'আপনি কিসে?'

'টুকিটাকি অনেক কিছুই করি আমি,' বলল রানা। 'কোন একটা ব্যাপার নির্দিষ্ট নেই। যখন যেটা খুশি করি, যখন খুশি বাদ দেই। সৌভাগ্যবানদের একজন বলতে পারেন আমাকে। মোটা অঙ্কের টাকা রেখে মারা গেছে বাপ—সেগুলোই দেখাশুনা করি; কিছু বাড়াই, কিছু উড়াই—চলে যায় দিন।'

কি পরিমাণ টাকা রেখে গেছে রানার বাবা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল নেবর রানার কাপড়চোপড়ের উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে। ছাঁটকাট দেখে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠল নেবরের চোখে। বলল, 'ভাগ্যবানদের দেখলে রীতিমত হিংসেই হয় আমার। আমি ভাই খেটে খাই।'

'আপনাকে দেখলে খুব একটা খাটতে হয় বলে তো মনে হয় না। মনে হয় যথেষ্ট ভাল আছেন। অন্তত আমাকে হিংসে করবার কোন কারণ নেই আপনার।'

'না তা ঠিক নেই, তবে তেমন কিছু আবার নয়—মোটামুটি চলে যায় আর কি।'

দুটো গ্লাস নামিয়ে রাখল ওয়েটার দু'জনের সামনে। এমনি সময়ে বারে এসে ঢুকল শিখা শংকর। উজ্জ্বল লাল রঙের একটা নাইলন আর উল মেশানো ককটেল স্যুট পরেছে শিখা, ক্ষীণ কটিতে চিকচিক করছে একটা সোনার চেন। দারুণ লাগছে ওকে দেখতে। রানা ও নেবর দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

'ইনি শিখা শংকর,' বলেই চোখ মিটমিট করল নেবর, রানার দিকে ফিরে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ছি ছি, এখন পর্যন্ত নিজের পরিচয়ই দিইনি! আমার নাম উইলিয়াম নেবর।'

অসংকোচে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিখা শংকর। হাতটা নিজের হাতে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল রানা। বলল, 'মাসুদ রানা।' অনুভব করল, শিখার হাতের চাপে আর চোখের চাহনিতে নষ্টামি। দৈহিক আবেদন। হাসিমুখে বলল, 'পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আমার ছুটিটা সার্থক হলো।'

'পরিচয়টা সংক্ষিপ্তই থাকবে তার কি মানে?' বসে পড়ল শিখা। নেবরের দিকে ফিরে বলল, 'উইলি, একটা সিনযানো বিটার দিতে বলো, প্লীজ।' আবার ফিরল রানার দিকে। 'দেশোয়ালী ভাই মনে হচ্ছে?'

'আপনি বাঙালী হলে আপন ভাই, ভারতীয় হলে মামাত ভাই—প্রতিবেশী।'

'ভাগ্যিস আপনি ভাই হয়ে যাননি,' হেসে উঠে বলল শিখা। 'তাহলে অনেক কিছুই নিষিদ্ধ হয়ে যেত।'

'তার মানে আপনি ভারতীয়।'

'এবং আপনি বাঙালী।'

শিখার ড্রিংক এসে যেতেই গ্লাস ঠোকাঠুকি করে নিয়ে সবাই চুমুক দিল যে-যারটায়।

এমনিতে গম্ভীর মানুষ রানা, কিন্তু সময় বিশেষে ইচ্ছা করলে হালকা রসিকতা আর চটুল কথাবার্তায় আসর জমিয়ে তুলতে পারে সে অনায়াসে। হাসাতে হাসাতে খিল ধরিয়ে দিতে পারে মানুষের পেটে। এর মস্তবড় সুবিধে এই যে, দশ মিনিট আলাপের পরই সদ্য-পরিচিত আর ভাবতে পারে না কেউ রানাকে, মনে করে আশৈশব বুজুম ফ্রেন্ড। এখানেও সেই একই কৌশল প্রয়োগ করল রানা। দশ মিনিট পর দেখা গেল কথা বলছে একা সে, হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে শিখা আর নেবর।

তিনজনে যখন বেশ জমে উঠেছে, এমনি সময়ে একহারা লম্বা এক লোক এসে ঢুকল বারে। বয়স পঞ্চাশের দু'এক বছর কম বা বেশি, ব্যাকব্রাশ করা চুল ঘাড়ের কাছে এক-ঢেউ কোঁকড়া। মুখটা লম্বাটে, নীল চোখদুটো তীক্ষ্ণ, সজাগ। পরনে বুকের কাছে কুঁচি দেয়া সাদা শার্ট, বটল-গ্রীন ভেলভেটের স্মোকিং জ্যাকেট, সবুজ স্ট্রিং টাই, কালো ট্রাউজার। বাম হাতে চওড়া কব্জিতে জড়ানো প্ল্যাটিনামের পুরু একটা চেন, ডান হাতের কব্জিতে প্ল্যাটিনামের ওমেগা ঘড়ি। লোকটার ভাব ভঙ্গিতে কোটিপতির আত্মবিশ্বাস আর একটু যেন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে। নেহায়েত কৃপাবশে একবার নজর বুলাল সে গল্পগুজবরত তিনজনের উপর, তারপর দীর্ঘ পা ফেলে বার কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে উঠে বসল।

'গুড ইভনিং, কাউন্ট ফন কীসলার,' মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল বারম্যান। 'কি দেব আপনাকে, ইয়োর এক্সেলেন্সি?'

'বরাবর যা দাও, তাই···শ্যাম্পেন।' কথাটা বলেই একটা সোনার সিগারেট কেস বের করল লোকটা পকেট থেকে, বেছে পছন্দ করে একটা সিগারেট লাগাল ঠোঁটে, চট করে আগুন ধরিয়ে দিল তাতে বারম্যান।

'আরিব্বাপ!' মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠল শিখা। ফিসফিস করে বলল, 'বিরাট কেউকেটা লোক মনে হচ্ছে!'

রানা বুঝল ওর প্রতি শিখার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। লোকটার চাকচিক্য চোখ ঝলসে দিয়েছে ওর। বিস্মিত দৃষ্টিতে বার বার চাইছে ঘাড় ফিরিয়ে।

শিখার একটা হাত স্পর্শ করল নেবর।

'চোখদুটো দয়া করে একটু আমাদের দিকে ফেরাবে, চেরি?' নেবরের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা।

'ওকে ডাকো না উইলি···ভদ্রলোক এক কথায় গর্জিয়াস।' ইচ্ছে করেই গলার স্বরটা উঁচু করে বলল শিখা কথাটা, যাতে লোকটার কানে যায়।

কথাটা শুনেই পিছন ফিরল লোকটা। মুখে ফুটে উঠল সহজ, সাবলীল, মিষ্টি হাসি।

'আপনার ফ্রেঞ্চ শুনে বুঝতে পারছি আপনি ইণ্ডিয়ান, ম্যাডামোয়াজেল। ইণ্ডিয়ানদের আমার খুব ভাল লাগে।' টুল থেকে নেমে ছোট্ট একটু বো করল লোকটা শিখার দিকে, তারপর নেবরের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি বোধহয় অসুবিধে করছি আপনাদের। তাই যদি হয়, আমি না হয় লাউঞ্জে চলে যাই।'

নেবর ও রানা দু'জনেই উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'অসুবিধে? মোটেও না,' আকাশ থেকে পড়ল নেবর। 'অসুবিধে তো নেই-ই, বরং আপনি এই টেবিলে যোগ দিলে আমরা আন্তরিক খুশি হব।'

আবার ছোট্ট করে নড করল জমকাল লোকটা।

'নিশ্চয়ই। সানন্দে আসব। তবে কয়েক মিনিটের জন্যে।' এগিয়ে এল লোকটা। নিজের পরিচয় দিল, 'কাউন্ট হ্যানস ফন কীসলার।' আবার একটা ছোট্ট

বো করল।

নিজের এবং বাকি দু'জনের পরিচয় দিল নেবর, সবাই চেয়ারে না বসা পর্যন্ত হাঁ করে চেয়ে রইল শিখা কাউন্টের দিকে। বসতেই রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই আপনি একজন কাউন্ট? বইয়ে পড়েছি, কিন্তু জীবনে কোনদিন কোন কাউন্টকে দেখিনি আমি!'

হেসে উঠল ফন কীসলার।

'জেনে সুখী হলাম যে আমিই প্রথম,' রানার দিকে ফিরল। 'আপনিও কি ভারতীয়?'

'আমার উচ্চারণ শুনে কি মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'মনে হয় মারসেইর লোক!' মাথা নাড়ল। 'কিন্তু রঙটা আলাদা।'

'আমি বাঙালী। কয়েকদিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।'

'বাঙালী?' চোখ কপালে তুলল কাউন্ট। 'জীবনে কোনদিন বাঙালী দেখিনি আমি। আপনাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা পড়েছি কাগজে। বীর জাতি। বেড়াতে এসেছেন?' অমায়িক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'আনন্দে ছুটি কাটাবার মতই এক অপূর্ব দেশ এটা। সারা দুনিয়ায় এর তুলনা পাবেন না আপনি।' এরপর গারমিশখ এবং এর আশেপাশের এলাকার রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলল সে, নতুন এবং বিচিত্র বেশ কিছু তথ্য শোনাল। সাধারণ বিষয় নিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ চলল গল্পগুজব। কাউন্টের শ্যাম্পেন শেষ হয়ে যাওয়ায় আরেক গ্লাসের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল নেবর, একগাল হেসে মাথা নাড়ল ফন কীসলার।

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখনি উঠতে হবে আমাকে। প্রত্যাখ্যান ঠিক করছি না, আরও খানিক বসতে পারলে চমৎকার হত, কিন্তু একটা ডিনারে যেতে হবে আমার।' শিখার দিকে চাইল ফন কীসলার। 'যদি ইচ্ছে হয়, ক'দিনের জন্যে আমার এস্টেটে বেড়িয়ে যেতে পারেন আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে। ওটা না দেখলে আপনাদের ছুটি উপভোগ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার বিশ্বাস ভাল লাগবে আপনাদের কাছে। হরেক রকম মজা আছে ওখানে—গরম পানির সুইমিং পুল আছে, অপূর্ব সুন্দর জঙ্গল আছে বারোশো একর জুড়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু ছিমছাম রাস্তা আছে, ইচ্ছে করলে শিকারও করতে পারেন। এই সিজনে অবশ্য জংলী কবুতর আর খরগোশ ছাড়া তেমন কিছুই পাবেন না, তবে আপনাদের ঘোড়ায় চড়ার শখ থাকলে ইচ্ছেমত শখ মিটিয়ে নিতে পারবেন, ভাল ঘোড়া আছে এক ডজন। আপনারা এলে খুবই খুশি হব আমি।'

খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল শিখা, জ্বলজ্বল করছে দু'চোখ।

'দারুণ মজা হবে! যাব না কেন? আপনি ডাকলে খুশি হয়েই যাব আপনার ওখানে।'

'দুর্গটা বিশাল, কিন্তু একেবারে নিরিবিলি থাকে বেশির ভাগ সময়,' কাঁধ ঝাঁকাল ফন কীসলার। 'আমি একা থাকি। আপনারা সবাই যদি পাঁচ-ছয়দিনের

জন্যে আসেন তো খুব চমৎকার হয়। একঘেয়ে যে লাগবে না সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি। আসছেন আপনারা?'

নেবরের দিকে ফিরল শিখা।

'ওহ্, দারুণ মজা হবে! রাজি হয়ে যাও, উইলি। চলো যাই।'

'আমন্ত্রণের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল নেবর। 'আপনি যদি মনে করেন আমাদের উপস্থিতি বোঝা বলে মনে হবে না, ঠিক আছে; যাব।'

হাসিমুখে রানার দিকে ফিরল ফন কীসলার।

'আর আপনি? আপনি আসছেন?'

দ্রুত চিন্তা করল রানা। আজ মুহুর্মুহু কৃপা বর্ষণ শুরু করেছে ভাগ্যদেবী। ওখানে গেলে শিখার সাথে আলাপ করবার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। রাজি হয়ে গেল সে।

'ধন্যবাদ। আপনাকে বলেছি, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি আমি। মনে হচ্ছে, এবারের ছুটি সুন্দর কাটবে আপনার ওখানে। আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ।' সরাসরি চাইল কাউন্টের চোখে। 'সত্যিই কোন অসুবিধে নেই তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল কাউন্ট।

'অসুবিধে কিসের? আপনারা এলে খুশি হব। উঠে দাঁড়াল সে। 'কাল এগারোটার দিকে লোক পাঠিয়ে দেব। ও আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমার কেল্লায়। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। ফাঁকা রাস্তা, জোরে চালালে পৌঁছে যাবেন এক ঘণ্টায়ই। লাঞ্চ খাবেন আপনারা আমার সাথে ওখানে।' শিখার হাত তুলে নিয়ে ঠোঁট বুলাল কাউন্ট, এক পা পিছিয়ে নড করল, তারপর রানা ও নেবরের হাত ঝাঁকিয়ে দিল আন্তরিকতার সাথে। 'চলি এখন, কাল দেখা হচ্ছে... গুডনাইট।' এই বলে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল সে বার থেকে।

'সব্বোনাশ।' কাউন্ট বেশ কিছুটা দূরে চলে যেতে ফিসফিস করে বলল শিখা। 'সত্যিকার জ্যান্ত এক কাউন্ট! কল্পনা করা যায়? দুর্গও আছে আবার!'

নেবরও যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে এই হঠাৎ আমন্ত্রণে। রানার দিকে ফিরল।

'জার্মানরা যে আবার এত অতিথিপরায়ণ হয় জানা ছিল না আমার। আপনি শুনেছেন কোথাও কোনদিন?'

হাসল রানা।

'শুধু আপনি আর আমি থাকলে আমন্ত্রণ আসত কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় ম্যাডামোয়াজেলের ঝকঝকে লাল পোশাক চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে কাউন্টের।'

'তাহলে আপনাদের দু'জনেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার কাছে,' হাসতে হাসতে বলল শিখা। 'যাই হোক, আর হোটেল ভাড়া টানার কি দরকার? এক হপ্তা যদি ওখানে থাকি তাহলে কামরাগুলো ছেড়ে দেয়াই তো ভাল। কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল নেবর। 'এক্ষুণি জানিয়ে দেয়া যাক। তারপর ডিনার। ভয়ানক খিদে লেগেছে।'

রিসিপশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল তিনজন।

'কদিন বেড়িয়ে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদের কাউন্ট হ্যান্স ফন কীসলার,' বলল নেবর। 'কাল এগারোটা নাগাদ রওনা হয়ে যাব আমরা। তার আগে আমাদের বিলটা যদি তৈরি করে দেন, খুব ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই, মশিয়ে,' বলল বৃদ্ধা ক্লার্ক। চশমা ঠিক করল। বোঝা গেল রীতিমত অবাক হয়েছে সে। 'আমার ধারণা, ওখানে চমৎকার কাটবে আপনাদের সময়। ন'টার মধ্যেই বিল তৈরি করে দেব আমি, মশিয়ে।'

'আমারটাও,' বলল রানা।

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধা। 'আপনারা সত্যিই ভাগ্যবান। যাকে-তাকে দুর্গে ডাকেন না কাউন্ট ফন কীসলার।'

হোটেলের পিছনে সারি সারি পার্ক করা রয়েছে নানান দেশের নানান জাতের গাড়ি—সেইদিকেই এগোল ওরা তিনজন।

'আমারটায় চলে আসুন,' ডাকল রানা। 'যথেষ্ট জায়গা আছে, একসাথে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

ভদ্রতার খাতিরে রানার পাশে উঠল শিখা শংকর। যদিও এটা বিদেশী ভদ্রতা, বিদেশে এসে ওদের আচার-ব্যবহার মেনে চলাই নিয়ম। নেবর উঠল পিছনের সীটে।

'কোনদিকে যাব?' এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হোটেল থেকে বেরিয়েই ডাইনে মোড় নিন। রেস্তোরাঁটা মাইল ছয়েক দূরে। যেতে যেতে পথ বলে দেব আমি। খাবারটা খুবই ভাল।'

ছোট্ট একটা গর্জন তুলে এগোলো মার্সিডিস।

তারিক আখতার আর সিকান্দার বিল্লার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল কালো মার্সিডিসটা হোটেল থেকে। রাস্তার অপর পারে একটা কাফেতে বসে পরস্পরের চোখের দিকে চাইল ওরা। মাথা নেড়ে সামান্য একটু অস্পষ্ট ইঙ্গিত করল তারিক আখতার, সাথে সাথেই একলাফে উঠে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ। দ্রুতপায়ে এগিয়ে রাস্তার ধারে পার্ক করা একটা ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেডে উঠে বসল। মার্সিডিসের পিছু পিছু চলল ওটা মাঝে একশো গজ ব্যবধান রেখে।

এয়ারপোর্টের হার্য রেন্টাল সার্ভিস থেকে গাড়িটা ভাড়া নিয়েছে তারিক আখতার। গারমিশখ রেল স্টেশনে পৌঁছে অপেক্ষারত হানিফের কাছে জেনেছে কোথায় কোন্ হোটেলে উঠেছে রানা। হানিফকে সোজা প্যারিসে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সিকান্দার বিল্লাহ আর সে এসে উঠেছে আলপেনহফের কাছাকাছি

একটা কমদামী হোটেলে। সুটকেস দুটো জমা দিয়ে এই কাফেতে এসে বসে আছে।

হেডঅফিসের সাথে যোগাযোগ করে শংকরলালজীর ব্যাপারে কিছু করতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করায় তারা জানিয়েছে যেন কোন রকম অসুবিধেয় ফেলা না হয় তাকে। তবে সম্ভব হলে কেন লোকটা প্যারিস গিয়েছিল সেটা জানা দরকার। বলা যায় না, শংকরলালজীর রাশটা আরও শক্ত করে ধরবার মত কোন তথ্য হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে। সিকান্দার বিল্লার উপর রানা এবং জটিল রায়কে চোখে চোখে রাখবার ভার দিয়েছিল তারিক আখতার: ওরা কোথায় যায়, কি করে, সমস্ত খবর সংগ্রহ করবার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু রানা গারমিশখে যাচ্ছে শুনে, আর আসমা শেরি বলে এক মহিলা রানার মিউনিখের টিকেট কেটেছে জেনে স্থির করেছে নিজেও যাবে সে ওখানে।

প্লেনে উঠেই নিজেকে বাহবা দিল তারিক আখতার সিকান্দারের ওপর সব ভার না চাপিয়ে নিজেও সাথে আসবার সিদ্ধান্ত নেয়ায়। একটা মুখ পরিচিত মনে হয়েছে ওর কাছে। একই প্লেনে মিউনিখ চলেছে একটা লোক—মুখের আদল অনেকটা কুড়োলের মত, একটা চোখ কানা, কাঁচের চোখ বসানো সেখানে। একহারা, লম্বা এই লোকটাকে কোথায় দেখেছে, কি এর পরিচয় স্মরণ করতে পারল না সে, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে পারল, শয়তানের প্রতিমূর্তি এই লোক চলেছে রানার ব্যাপারেই। এ লোক যখন মিউনিখে চলেছে, কিছু একটা পাকিয়ে উঠছে ওখানে।

মিউনিখ এয়ারপোর্টে যখন ভাড়া করা ফোক্সওয়াগেনের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে, লোকটা এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। সাদা একটা মার্সিডিস এল, হাতের ইশারায় ডাকল ড্রাইভার. ছোট্ট একটা ব্যাগ হাতে লোকটা গিয়ে উঠল পিছন সীটে. ছেড়ে দিল গাড়ি। পাগলের মত এলোপাতাড়ি স্মৃতির পাতা উল্টাল তারিক আখতার, কিন্তু স্মরণে এল না কিছুই।

এই কাফেতে বসে বসে শিখা শংকর আর উইলিয়াম নেবরকে স্পোর্টস কারে করে ফিরে আসতে দেখেছে ওরা, এই খানিক আগে কাউন্ট ফন কীসলারকে সিলভার-গ্রে রোলসরয়েসে করে চলে যেতে দেখেছে—কিন্তু এসব ঘটনা কোন দাগ কাটেনি তারিক আখতার বা বিল্লার মনে। এইবার রানার পাশে বসে সেই মেয়েটাকেই আবার বেরিয়ে যেতে দেখে চালু হয়ে গেল ব্রিগেডিয়ারের উর্বর মস্তিষ্ক।

কে মেয়েটা? সাব-কন্টিনেন্টেরই মেয়ে···কোথাকার? পাকিস্তান, বাংলাদেশ···না ভারত? এখানে এই মেয়েটার সাথে কি করছে মাসুদ রানা? পিছনে বসা ছোকরাটাই বা কে? আর কোন উপায় নেই, জানতে হলে কিছু একটা ছুতো ধরে যেতে হবে আলপেনহফ হোটেলে।

ছুতো বের করে নিতে বেশি দেরি হলো না তারিক আখতারের। গলা থেকে

সোনার চেনটা খুলে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রানারা হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই রিসিপশন ডেস্কের সামনে হাজির হলো তারিক আখতার।

'বলুন, স্যার, কি সাহায্য করতে পারি?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধা মহিলা।

'কয়েক মিনিট আগে অল্পবয়সী এক মহিলা বেরিয়ে গেলেন এই হোটেল থেকে,' বলল তারিক। 'পরনে টকটকে লাল কাপড় ছিল। গাড়িতে ওঠার সময় ওঁর গলা থেকে সোনার এই চেনটা পড়ে গেছে মাটিতে,' মুঠো খুলে চেনটা দেখাল সে বৃদ্ধাকে। 'এটা ফেরত দিতে চাই তাঁকে।'

'থ্যাংকিউ, স্যার।' হাসল বৃদ্ধা। 'খুব খুশি হবেন উনি। রেখে যান, ফিরে এলে দিয়ে দেব আমি।'

মুচকি হাসল তারিক আখতার। হাসিটা অর্থপূর্ণ।

'আমি নিজে ফেরত দিতে চাই এটা। কি নাম ওঁর?'

'মিস শিখা। ডিনার খেতে বাইরে কোথাও গেছেন দুইজন বন্ধুর সাথে, কখন ফেরেন ঠিক নেই। অনেক রাতও হতে পারে।'

'তাহলে আগামী কাল আসব আমি এটা ফেরত দিতে। আমি যে এটা পেয়েছি, কথাটা দয়া করে জানাবেন ওঁকে।'

'নিশ্চয়ই,' বলল বৃদ্ধা। ভেবে নিল, হয়তো পুরস্কার আশা করছে এই লোকটা শিখা শংকরের কাছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই চট করে বলল, 'কিন্তু দশটার আগে আসবেন। হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন উনি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল তারিক আখতার।

'যদি বাই চান্স ঠিক সময় মত আসতে না পারি···কোথায় যাচ্ছেন জানেন আপনি?'

'ওবারমিটেন দুর্গে,' বলল বৃদ্ধা। 'কাউন্ট ফন কীসলারের এস্টেটে। মিস্টার উইলিয়াম নেবর, মিস্টার মাসুদ রানা আর মিস শিখা—তিনজনকেই দাওয়াত করেছে কাউন্ট।'

'ওহ্-হো, তাহলে তো যেমন করে পারি দশটার আগেই পৌঁছতে হবে আমার।'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সে, আলপেনহফ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল নিজের হোটেলে। সেখান থেকে টেলিফোন করল পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মিউনিখ শাখায়। সেখানকার এজেন্ট সোবহানের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল, ওবারমিটেন দুর্গ হচ্ছে রুডল্ফ্ গুন্থারের সম্পত্তি। গুন্থার সম্পর্কে সবকিছুই জানা আছে তার, গোটা কয়েক অজানা তথ্য প্যারিসে কিংবা হেড অফিসে যোগাযোগ করে জেনে নিয়ে তাকে জানাবার অনুরোধ করল সে সোবহানকে। হোটেলের টেলিফোন নাম্বার দিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে

টেলিফোন অপারেটারকে জানিয়ে রাখল যে একটা কল আসবে, হোটেল লাউঞ্জেই পাওয়া যাবে ওকে, যেন ডেকে দেয়া হয়।

একঘণ্টা অপেক্ষার পর ডাক এল। তিনমিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে একটানা শোনার পর ধন্যবাদ জানিয়ে রেখে দিল সে রিসিভার।

বারো

রাত সাড়ে বারোটায় ফিরে এল রানা নিজের হোটেল কামরায়। চমৎকার কেটেছে সন্ধেটা। নেবরের পরিচিত রেস্তোরাঁর খাবারটা একটু গুরুপাক হলেও সত্যিই অপূর্ব। হাসি গল্পে বেশ কেটেছে সময়টা নেবর আর শিখার সঙ্গে।

নেবর লোকটাকে ভালই লেগেছে রানার। নোংরাছবির কারবার করুক আর যাই করুক, মানুষ হিসেবে খারাপ নয় লোকটা। এসব ব্যাপারে মনটা খোলা রাখারই পক্ষপাতি রানা। রোজগারের খাতিরে কেউ এটা করে, কেউ ওটা করে—আসল পরিচয় ভিতরের মানুষটা কে কেমন।

মাঝে মাঝে কাজের চিন্তা এসে আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাবার চেষ্টা করেছে রানার। ফিল্ম তিনটে কি করে উদ্ধার করা যায় সে চিন্তার ভার অবচেতন মনের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমোদ-ফূর্তিতে গা ভাসাতে চেয়েছে সে, কাউন্টের দুর্গে গিয়ে প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে শিখার কাছে কথাটা পাড়বার ভেবে তাকে তুলে রাখতে চেষ্টা করছে সে আপাতত সমস্যাটাকে, কিন্তু খানিক পর পরই একলাফে সামনে এসে হাজির হয়েছে সেটা। অর্ধেকের বেশি টাকা দিয়ে দিয়েছে জটিলেশ্বর, পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেছে ওর উপর, সফল হতে না পারলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে যাবে সে জটিল রায়ের চোখে।

জামাকাপড় ছেড়ে ড্রেসিংগাউনটা গায়ে চাপিয়ে আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা পা দুটো বিছানায় তুলে দিয়ে। সিগারেট ধরাল একটা। শিখাকে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে, ভাবল সে। মেয়েটাকে ভাল লেগেছে রানার, কিন্তু শিখার তরফ থেকে এত বেশি আগ্রহ আর উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যে একটু যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে নেবর। মেয়েটা শুধু সুন্দরী বা আকর্ষণীয়াই নয়, হাসিখুশি প্রাণখোলা একটা ভাব আছে ওর মধ্যে, যেটা দেখলে ভাবাও যায় না যে এই মেয়ে শংকরলালজীর মত কুটিল এক লোকের মেয়ে, বা কোনদিন নোংরা ছবিতে অভিনয় করতে পারে।

দুটো দিন পার হয়ে গেছে, ভাবল রানা। খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি সে এখন পর্যন্ত। আর তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরতে না পারলে এতসব পরিশ্রম বৃথাই যাবে ওর। কিন্তু অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই। আজ আর করবার

কিছুই নেই ওর। সিগারেটটা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়বে সে। কাল থেকে খাটিয়ে মারতে হবে মাথাটাকে।

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে অ্যাশট্রেতে টিপে মারতে গিয়ে চমকে উঠল রানা খাটের পাশে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতেই। এত রাতে কে ফোন করছে আবার!

রিসিভারটা কানে তুলে নিল রানা। 'বলুন?'

'আমি বলছি।'

শিখার চাপা কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রানা। মুহূর্তে সজাগ, সতর্ক হয়ে গেল সে।

'হ্যাল্লো... কি ব্যাপার?'

'একা লাগছে।' ফিসফিসে শিখার কণ্ঠ।

'আশ্চর্য!' বলল রানা। 'আমারও একা লাগছে।'

'আমরা দু'জনে একা হতে পারি না?'

'সেটা কি করে সম্ভব বলুন?' কাষ্ঠ হাসি হাসল রানা। 'দু'জন এক সাথে কি কখনও একা হওয়া যায়?'

'এক তো হওয়া যায়।'

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ঝুঁকি না নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল সে। বলা যায় না হয়তো নেবরের বুকের উপর লেপটে শুয়ে রানার মন পরীক্ষা করছে শিখা, নিজেদের মধ্যে হেসে খুন হয়ে যাওয়ার খোরাক সঞ্চয় করছে।

'দুশো বাষট্টি নম্বর কামরায় আছি আমি,' আবার বলল শিখা। 'আপনার করিডর ধরে ডান দিকে চলে এলে শেষ ঘরটা।'

'করিডরের শেষ মাথার ঘর আপনার খুব পছন্দ বুঝি?'

খিল খিল করে হেসে উঠল শিখা।

'এটা একটা আমন্ত্রণ, গর্দভ, ভূগোলের পাঠ নয়।'

শিখার ঘরে গিয়ে নেবরের সামনাসামনি পড়ে যাওয়ার ইচ্ছে রানার মোটেই নেই, তাছাড়া বর্তমানে শিখা নেবরের সম্পত্তি, অনধিকার চর্চায় মন সায় দেয় না ওর কখনও—কাজেই না-সূচক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'ঘরটা বহুদূর,' বলল রানা। 'ঘুমিয়ে পড়ুন।' বলেই নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

শীতশীত লাগছে, বিছানায় উঠে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল রানা। গাটা একটু গরম হয়ে আসতেই বেডসুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিতে যাচ্ছিল, এমনি সময় ঘরে ঢুকল শিখা। ওর দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আস্তে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

নাইট ড্রেসের উপর সাদা একটা রোব পরেছে শিখা, পায়ে নীল স্লিপার। রাগের মাথায় কোমরের দড়িটা কষে বাঁধায় দারুণ দেখাচ্ছে ওকে এই পোশাকে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল কাছে।

'আরে! আপনি!' মৃদু হেসে বলল রানা, 'এতই একা লাগছিল?'

খাটের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল শিখা, দুই চোখে আগুন।

'তুমি একটা জানোয়ার!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শিখা। 'আমার ডাকে সাড়া দেয়া উচিত ছিল তোমার!'

'ঘুম এল না বুঝি?' সহজ কণ্ঠে বলল রানা। 'ঠিক আছে, আমারও ঘুম আসছিল না, উঠে পড়ো, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

বিছানার উপর থেকে কম্বল সরিয়ে শিখার জন্যে জায়গা করে দিল রানা একটু সরে।

'যদি মনে করে থাকো তোমার সাথে শুতে এসেছি, তাহলে মস্ত ভুল করছ। আমি এসেছি তোমাকে জানাতে যে আমার ধারণা, তুমি একটা জানোয়ার।'

কম্বলটা যথাস্থানে সমান করে দিল রানা।

'অতি উত্তম। বুঝতে পেরেছি যে আমি একটা জানোয়ার। গুড নাইট,' হাত বাড়িয়ে বেডসুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে দিল রানা। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

'বাতি জ্বালো!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল শিখা। 'অন্ধকারে এখান থেকে বেরোব কেমন করে?'

'এখানে ওখানে দুয়েকটা ঠোকর খেলে খুব ক্ষতি হবে না। আমি ঘুমাব এখন। গুড নাইট··· দেখা হবে কাল সকালে।'

রানা টের পেল, খাট ধরে ধরে এগিয়ে আসছে শিখা। মুচকি হেসে কম্বলটা আবার সরিয়ে দিল সে। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি, তারপর খশখশ শব্দ পাওয়া গেল ওর কাপড় মেঝেতে খসে পড়ার।

'তোমাকে ঘৃণা করি আমি,' বলল শিখা। 'বেহায়া মনে করো আর যাই করো, এসে যখন পড়েছি, থেকে যাচ্ছি।'

'থাকতে তো কেউ বারণ করেনি তোমাকে,' বলল রানা। করিডরের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে ফিরে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নাকি?' হাত বাড়িয়ে শিখার একটা হাত ধরে ফেলল সে, হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল বুকের উপর।

শিখার শরীরের স্পর্শে চমকে উঠল রানা। জ্বর নাকি মেয়েটার? মনে হচ্ছে উনুন থেকে বেরিয়ে এসেছে এইমাত্র। গাটা শুষ্ক, মসৃণ, উত্তপ্ত। রানার স্পর্শে শিউরে উঠল শিখা, জাপটে ধরে ওর বুকে মুখ ঘষল, তারপর খুঁজে পেল ঠোঁট।

নিকোলো ট্র্যাচিয়ার কথা মনে পড়ল রানার: মনে হচ্ছিল যেন হট ওয়াটার ব্যাগ।···এল.এস. ডি।···নইলে এত গরম হবে কেন মেয়েমানুষের শরীর? এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠবে কেন ছুঁতে না ছুঁতেই···।

কম্বল চাপা দিল রানা ওকে। কয়েক মিনিটের জন্যে সত্যিই জানোয়ার হয়ে গেল সে। ক্ষুধার্ত শার্দুল। ককিয়ে উঠল শিখা। রানার কানের কাছে বিড়বিড় করে আবোলতাবোল কী সব বলল। শিউরে শিউরে উঠল রানা। তারপর অসাড় হয়ে পড়ল দু'জনই।

শাটারের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে নকশা তৈরি করছে কার্পেটের উপর। গাড়ির শব্দ কানে আসছে—দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার অপর দিকের কাফে থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছে সুইং মিউজিক। ধীরে ধীরে কমে এল নিঃশ্বাসের বেগ। রানার বুকে একটা হাত রাখল শিখা, সম্পূর্ণ অন্য সুরে, অন্য অর্থে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জানোয়ার!' আর একটু ঘেঁষে এল। 'আমি কল্পনাও করতে পারিনি···'

'চুপ। ঘুমাও তো এখন?'

রানার দিকে পিছন ফিরে 'দ' হয়ে শুলো শিখা, রানা তার চেয়ে এক সাইজ বড় 'দ' হয়ে শুলো ওর পিঠে বুক ঠেকিয়ে—গায়ে গায়ে সাজানো চামচের মত। রানার ডান হাতটা বুকে চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল শিখা, রানাও ঢলে পড়ল গভীর তৃপ্তিকর ঘুমে।

শাটারের ফাঁক গলে সূর্যের আলো এসে চোখে পড়তেই ঘুম ছুটে গেল রানার। আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরে নতুন রূপে দেখল সে শিখাকে। ঘুমের ঘোরে সরিয়ে দিয়েছে কম্বল নাভীর কাছে, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে উঠছে নামছে বুক, চুলগুলো আগুনের শিখার মত ছড়িয়ে আছে বালিশময়। নিষ্পাপ, সুন্দর, হাসিহাসি মুখ। ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখল রানা, ঠাণ্ডা। গায়ে হাত দিতেই চোখ মেলল শিখা, দুই হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে টেনে আনল কাছে। ঘুমঘুম চোখে চেয়ে আছে রানার চোখে, ঠোঁটে দুষ্টামি হাসি। বিপজ্জনক আদর শুরু করল শিখা। সাড়া দিতে হলো রানাকেও। ধীরে ধীরে ডুবে গেল ওরা সুখের সাগরে, সুখের তরঙ্গ জাগল বুকে, বইল সুখের ঝড়, তারপর সব শান্ত হয়ে এলে আবার ঢলে পড়ল সুখকর ঘুমে।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের পাশে খুলে রাখা রিস্টওয়াচটা চোখের সামনে নিয়ে এল রানা। চমকে উঠল সময় দেখে। মৃদু ঠেলা দিল শিখার গায়ে।

'উঠে পড়ো, ঘরে ফেরা দরকার তোমার! সোয়া ন'টা বেজে গেছে।'

'বাজুক। কোনদিন যাব না আমি এঘর থেকে।' হাত পা টান করে আড়মোড়া ভাঙল শিখা। 'কিস মি রানা, প্লীজ!'

একলাফে নেমে পড়ল রানা। প্রতিমুহূর্তে ঝুঁকি বাড়ছে এখন। নেবর যে কখন ঘুম থেকে ওঠে জানা নেই রানার। ও গিয়ে যদি শিখার ঘর খালি দেখে তাহলে বিপদ। সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকল সে। শাওয়ার খোলার আগে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়বার ইঙ্গিত করল শিখাকে। 'ভাগো এখন। একঘন্টা পর দেখা হবে, নিচে'

শেভ, স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল চলে গেছে শিখা 'টেলিফোনে টোস্ট, মারমালেড আর কফি অর্ডার দিয়ে কাপড় পরে নিল সে। সজীব লাগছে শরীর-মন। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোটা খুলে বুক ভরে বাইরের খোলা বাতাস টানল সে কয়েক মিনিট, ব্যস্ত সড়ক দেখল আনমনে।

আলপেনহফ হোটেলের উল্টোদিকের কাফেতে বসে আছে ব্রিগেডিয়ার তারিক

আখতার। সবুজ, সতর্ক চোখ দুটো রাস্তার উপর চঞ্চল। সিকান্দার বিল্লাহ ঢুকল, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে বসল সামনের চেয়ারে।

'বিল চুকিয়ে হোটেল কামরা ছেড়ে দিয়েছ?'

'ইয়েস, বস্। সুটকেস গাড়িতে। আমরা কি ফিরে যাচ্ছি? কেন এলাম, কেন ফিরে যাচ্ছি কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার কাছে।'

সবুজ চোখদুটো এসে স্থির হলো বিল্লার চোখে।

'ওবারমিটেন দুর্গে চলেছে ওরা তিনজন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হবে। ফিরে যাচ্ছি না...ওদের অনুসরণ করছি আমরা।' বেশ সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল তারিক আখতার। 'ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে আমার কাছে সবকিছু। কঠিন ধাঁধার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে এক এক করে। এখন আমরা জানি, শিখা শংকর মেয়েটা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী শংকরলালজীর একমাত্র কন্যা। জানি, বাপ-মেয়েতে গোলমাল আছে। সাথের লোকটার নাম উইলিয়াম নেবর—ব্লু ফিল্মের কারবার করে। খুব সহজেই ধরে নেয়া যায়, শংকরলালের নীতিজ্ঞানবিবর্জিত বখে যাওয়া মেয়ে নেবরের সাহায্যে নীলছবি তৈরি করেছে একটা। ধরে নিতে পারি...'

'এত ধরাধরি করছি আমরা কিসের ভিত্তিতে?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল সিকান্দার বিল্লাহ।

'আন্দাজ। আমরা জানি, শংকরলালজীর কাছে একটা মুভি প্রোজেকটর ছিল, জটিল রায়কে দিয়েছিল সে ওটা, জটিল রায় ওটা নিয়ে গিয়েছিল মাসুদ রানার কাছে। ফিল্ম ছাড়া মুভি প্রোজেকটর টানাহেঁচড়া করবার কোন কারণ দেখি না। নিশ্চয়ই সাথে একটা ফিল্মও ছিল। জটিল রায় ফিরে গেল নিজের অফিসে। কিন্তু রানা কি করল? জিনার কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, সানুকি হাকাওয়াগার ওখানে গিয়ে একটা নীলছবি দেখাচ্ছে ওকে মাসুদ রানা, জানবার চেষ্টা করছে কে তুলেছে ছবিটা, কে অভিনয় করেছে নায়কের রোলে। নায়িকার কথা জিজ্ঞেস করছে না, কারণ তাকে চেনে সে। আমার চিন্তার ধারাটা বুঝতে পারছ এবার? আমার ধারণা, ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করছে মেয়েটা তার বাপকে। তার বাপ জটিলেশ্বরের মাধ্যমে সাহায্য নিচ্ছে মাসুদ রানার। মাসুদ রানা এসে হাজির হচ্ছে গারমিশখে। এমনি সময়ে দেখা যাচ্ছে মঞ্চে প্রবেশ করছে রুডল্ফ গুস্থারের লম্পট ভাগনে, দাওয়াত করছে ওদের ওবারমিটের দুর্গে। আমরা জানি গুস্থার আর শংকর হচ্ছে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। ওদের মধ্যে পাকাপোক্ত চুক্তি রয়েছে। শংকরলাল প্রধানমন্ত্রী হলে বিরাট কয়েকটা কন্ট্রাক্ট পাবে গুস্থার, ওর পিছনে যে টাকা ঢেলেছে তার পঞ্চাশ গুণ তুলে নেবে সেসব কন্ট্রাক্ট থেকে। কাজেই নিজ স্বার্থেই চেষ্টা করবে গুস্থার, এই ব্ল্যাকমেইল বন্ধ করতে। সর্বশেষ কি দেখা যাচ্ছে? শিখা, নেবর, রানা—তিনজনকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে গুস্থারের দুর্গে। যদি জিজ্ঞেস করো... কেন?—আমি বলব, কতোল করবার জন্যে। মৃত্যুগুহায় ঢুকছে ওরা নিজের অজান্তে।'

'তাতে আমাদের কি? আমাদের কিছু এসে যায়?'

'যায়। ওদের একজনের জন্যে আমার কিছুটা এসে যায়। কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব না, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।'

সিকান্দার বিল্লাহ জানে মাসুদ রানার হাতে মারা গিয়েছিল তারিক আখতারের বড়ভাই জেনারেল এহতেশাম। বুঝে নিল, নিজ হাতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় ব্রিগেডিয়ার, রানা আর কারও হাতে জবাই হয়ে যাক সেটা চায় না। এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না সে। গতবার লাহোরে হাতের মুঠোয় পেয়েছিল ওরা রানাকে, রানা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে হাত ফস্কে সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারায় সিকান্দার বিল্লাহ নিজেই মনে মনে লজ্জিত। মুচকি হেসে সিগারেট ধরাল সে একটা। সুযোগ পেলেই যে ব্রিগেডিয়ার রানার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটিয়ে নেবে, সে ব্যাপারে তার কোনই সন্দেহ নেই। চুপচাপ মিনিট দুয়েক সিগারেট টানল সে, তারপর হঠাৎ তারিক আখতারের চোখের দিকে চেয়েই তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝট করে পিছন ফিরল।

সাদা একটা মার্সিডিস এসে থামল আলপেনহফ হোটেলের সামনে। বেঁটেখাটো একজন ইউনিফরম পরা বডি-বিল্ডার বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে, মার্চের ভঙ্গিতে কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল হোটেলের লবিতে।

ব্রিগেডিয়ারের দিকে চাইল বিল্লাহ। মাথা ঝাঁকাল ব্রিগেডিয়ার।

'তুমি যাও, গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বসে থাকো। ওরা রওনা হয়ে গেলেই নিয়ে আসবে ওটা এই কাফের সামনে।'

বেরিয়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নীল ইউনিফরম পরা বডি-বিল্ডার বেরিয়ে এল হোটেল থেকে, ওর পিছনে শিখা, নেবর ও রানা। তার পিছনে সুটকেস হাতে দু'জন পোর্টার।

সাদা মার্সিডিসের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল ইউনিফরম পরা লোকটা, রানার দিকে চেয়ে বলল, 'এই গাড়িতে উঠবেন, না আপনাদের গাড়ি আছে?'

'আমরা আমাদের গাড়িতে করে আসছি, তুমি এগোও।'

'অলরাইট, স্যার। আমি সামনে পথ দেখাচ্ছি। বেশি না, স্যার। ঘন্টাখানেকের পথ।' গাড়িতে উঠে বসে ঝটাং করে দরজা লাগাল সে।

এদিকে শিখা নিচু গলায় নেবরকে বলছে, 'আমি মাসুদ রানার মার্সিডিসটায় যাই, তুমি হোণ্ডা নিয়ে এসো। ঠিক আছে?'

'না!' চাপা গলায় ধমক দিল নেবর। 'আমার গাড়িতে উঠবে তুমি!'

কথাগুলো কানে গেল রানার। লম্বা পা ফেলে এগোল সে নিজের ভাড়া করা মার্সিডিসের দিকে। তর্কে কে জিতল, শিখা কোন্ গাড়িতে যেতে চায়, ইত্যাদির তোয়াক্কা না রেখে ছেড়ে দিল গাড়ি, সাদা মার্সিডিসের পিছু পিছু রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

রানাকে বেরিয়ে যেতে দেখে সেদিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল শিখা, তর্ক ছেড়ে

উঠে বসল হোণ্ডায়।

'ওই লোকটার প্রতি তোমার দুর্বলতা এসে গেছে মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল নেবর।

তির্যক দৃষ্টিতে দেখল শিখা নেবরকে। মাথা নেড়ে বলল, 'পড়তেই যদি হয়, আজেবাজে লোক কেন, কাউন্টের প্রেমে পড়াই ভাল বেচারা একা অতবড় দুর্গে থাকে...'

এঞ্জিন স্টার্ট দিল নেবর।

'পুরুষ দেখলেই যদি জিভ দিয়ে পানি ঝরে, পাগল হয়ে ওঠো, তাহলে তোমার ব্যাপারে অনাগ্রহ এসে যেতে পারে আমার।'

বাঁকা করে হাসল শিখা।

'তাহলে আমার খুব একটা ক্ষতি হয়ে যাবে ভাবছ কেন?'

ভ্রূ কুঁচকে শিখার মুখের দিকে চাইল একবার নেবর কিছু না বলে রওনা হয়ে গেল, বড় রাস্তায় পড়ে পিছু নিল রানার।

কাউন্ট হ্যান্স ফন কীসলার জানালার ধারে চামড়ার গদি আঁটা চেয়ারে বসে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। সুন্দর করে সাজানো পার্ক দেখা যাচ্ছে সামনে। সমান করে ছাঁটা সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারি, এক-আধটা বিশাল ওক, দূরে লাইন দেয়া পাম গাছের সারি, জায়গায় জায়গায় বেঞ্চ পাতা। পার্কের শেষ সীমা থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল।

কাউন্ট হ্যান্স ফন কীসলার হচ্ছে রুডলফ গুন্থারের ভাগনে আপন অবশ্য নয়—খালাত বোনের ছেলে, তবু ভাগনে। ঠিক সময়মত এই মামার সাহায্য না পেলে আজ খুন ও ধর্ষণের দায়ে জেলের আলু খেতে হত ওকে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে হ্যামবুর্গের পুবে স্যাক্সন ফরেস্টের কাছে ছিল ওদের এস্টেট। তখন কতই বা বয়স হবে ওর?—বড়জোর ষোলো কি সতেরো। জঙ্গলে জঙ্গলে পাখি শিকার করছিল, এমনি সময়ে ফুটফুটে সুন্দর এক অস্ট্রিয়ান মেয়ে রাস্তা জিজ্ঞেস করল। গরমের ছুটিতে বান্ধবীদের সাথে এক্সকার্শনে বেরিয়েছিল মেয়েটা, পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল ফন কীসলারদের এস্টেটের ভিতর, ওকে জিজ্ঞেস করছিল হ্যামবুর্গে যাওয়ার হাইওয়েটা কোন দিকে। একেবারে নির্জন এক জঙ্গলে সমবয়সী এক মেয়েকে একা পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর। মৌখিক প্রস্তাব মেয়েটি যখন প্রত্যাখ্যান করল, তখন বন্দুক ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে তার উপর। মেয়েটা যথেষ্ট পরিমাণে ধস্তাধস্তি করল, চিৎকারও করল, কিন্তু অসুরের শক্তি এসে গেছে কামোন্মত্ত ফন কীসলারের গায়ে, কিছুতেই ঠেকাতে পারল না। ধর্ষণের পর এল আতঙ্ক। এবার কি ঘটবে তার কাল্পনিক ভয়ে গলা টিপে হত্যা করল সে মেয়েটিকে। একটা ঝোপের ধারে লাশটা লুকিয়ে রেখে ঘণ্টা দুয়েক চমকে চমকে বেড়াল এদিক ওদিক, ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ—শেষ পর্যন্ত মানসিক চাপ আর

সহ্য করতে না পেরে সোজা গিয়ে বাপের কাছে স্বীকার করল সব। এদিকে একজন জঙ্গল-প্রহরী চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়েছিল ফন কীসলার ওখান থেকে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই। লাশটা, আর তার পাশে ফন কীসলারের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া ঘড়িটা পেয়ে যার-পর-নাই খুশি হলো সে। দু'চোখে দেখতে পারত না সে দাম্ভিক ছোকরাকে। গোপনে খবর দিল থানায়।

সেইসময় ওদের ওখানে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিল রুডল্‌ফ গুস্থার। ছেলের কথা শুনে ভড়কে গিয়ে বুড়ো কীসলার সব জানাল তার শালাকে। সব শুনে গুস্থার পরামর্শ দিয়েছিল কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে। আজই মেয়েটার লাশ খুঁজে পাবে কেউ না কেউ, তদন্ত এলে ওরা সবাই এক বাক্যে জানাবে যে সারাদিন ওদের সাথেই ছিল ছোকরা ফন কীসলার।

অবশ্য গুস্থার তখন জঙ্গল-প্রহরীর ব্যাপারটা জানত না। পুলিস ডাকিয়ে ঘড়িটা যে সে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে সেকথা জানা গেল, যখন বাড়িতে এসে অ্যারেস্ট করল ইন্সপেক্টর হ্যান্স ফন কীসলারকে। সারাদিন বাড়িতেই ছিল বলেও পার পাওয়া গেল না, কারণ ছোকরার হাতে, বুকে, গলায় আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেল।

এবার গুস্থার নামল তার আসল ভূমিকায়। প্রহরীর সাথে কথা বলল সে গোপনে। কি কথা হলো, টাকা কত খরচ হলো কেউ জানল না, তবে জঙ্গল-প্রহরী থানায় গিয়ে কসম খেয়ে বলল, ছোকরা ফন কীসলারকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না বলে সাজানো কাহিনী বলেছিল সে ওদের; আসলে ঘড়িটা পেয়েছিল সে অন্য জায়গায়, মেয়েটার পাশে নয়। এবার পুলিসের সবচেয়ে বড়কর্তার সাথে গোপনে বিশ মিনিট কথা বলল গুস্থার। কি কথা হলো কেউ জানে না, বিনিময়ে কি সুবিধে আদায় করে নিল সে গুস্থারের কাছ থেকে কেউ জানে না; দেখা গেল খুনের চার্জ তুলে নিয়েছে চীফ অফ পুলিস, খালাস পেয়েছে ছোকরা বেকসুর। আর একটু হলেই গিয়েছিল ছোকরা, মামার দৌলতে বেঁচে গিয়ে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইল সে। এর দু'বছর পরেই বোমা পড়ে ছারখার হয়ে গেল ফন কীসলারদের এস্টেট, বাপ-মা দু'জনেই মারা পড়ল ছাত ধসে। যুদ্ধে যোগ দিল সর্বহারা ফন কীসলার, ধরা পড়ল মিত্রবাহিনীর হাতে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে। যখন খালাস পেল, সর্বস্ব খুইয়ে এখন কি করা যায় ভাবছে, এমনি সময়ে ডেকে পাঠাল রুডল্‌ফ গুস্থার। মোটা বেতনে এই এস্টেটের দায়িত্ব দিতে চাইল ওকে। কাজটা ম্যানেজমেন্টের, কিন্তু ঠিক চাকরি নয়, আত্মীয়র মত দেখাশোনা করবে সে এই বিশাল এস্টেট, নিজেকে প্রস্তুত রাখবে গুস্থারকে যেকোন কাজে সাহায্য করবার জন্যে।

সুযোগটা লুফে নিয়েছে ফন কীসলার। ঠিক কর্মচারীর মত ব্যবহার করে না গুস্থার ওর সাথে, একজন কাউন্ট হিসেবে ওর সম্মান যেন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে ওর যতটা মনোযোগ তার চেয়ে অনেক বেশি সজাগ দৃষ্টি রয়েছে গুস্থারের। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হয়, কাজকর্ম সব ঠিকমত চলছে কিনা দেখে ঘুরেফিরে, ঘোড়া দাবড়িয়ে কিছু শিকারটিকার করে তারপর চলে যায়। মাঝে

মাঝে গুন্থারের চিঠি নিয়ে বিচিত্র সব লোক থাকতে আসে এখানে কয়েক দিনের জন্যে, মাঝে মাঝে তার আদেশে পার্টির ব্যবস্থা করতে হয়। এছাড়া এখানে আর তেমন কোন কাজ নেই। ভয় আসলে পায় সে বিদঘুটে কাজগুলোকে। হঠাৎ হঠাৎ হুকুম আসে এখানে-ওখানে যাওয়ার। হয়তো ঈস্ট বার্লিনে গিয়ে দেখা করতে হবে সাদামাঠা পোশাক পরা কোন লোকের সাথে, তার দেয়া একটা চিঠি বা প্যাকেট পৌছে দিতে হবে গুন্থারের কাছে। একবার পিকিং পর্যন্ত যেতে হয়েছে তাকে এই রকম একটা রহস্যময় প্যাকেট আনতে। তবে এই ধরনের কাজ খুব কমই আসে নেহায়েত কালেভদ্রে; বছরে বড়জোর একবার কি দু'বার। অন্যান্য সময়ে অত্যন্ত আনন্দেই দিন কাটে তার—রাজার হালে আছে সে এই দুর্গে, যখন খুশি শিকার করছে জঙ্গলে, বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করছে এখানে, পার্টি হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সুন্দরীরা চারপাশ থেকে উড়ে আসছে ওর কাছে কীট-পতঙ্গের মত, সময় কাটিয়ে যাচ্ছে কয়েকদিন। কাল্পনিক জগতে বেশ আছে সে—ভাব দেখাচ্ছে এই দুর্গ, এই এস্টেট ওর নিজের। উপাধিটা ছাড়া আর কিছুই যে ওর নিজের না সেটা রুডল্ফ গুন্থার আর সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

গতকাল একটা বিশেষ নির্দেশ এসেছে তার কাছে। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম একটা নির্দেশ পেল সে যেটাতে ওর মামার সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেয়েছে কিছুটা। আন্দাজ করেছিল সে আগেই, কিন্তু ওর মামা যে এতটা ভয়ঙ্কর লোক টের পায়নি সে কখনও। পকেট থেকে বের করে চিঠির শেষ অংশটুকু আবার একবার পড়ল ফন কীসলার।

'ফিল্ম তিনটে এই মেয়েটার কাছ থেকে উদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরী,' লিখেছে গুন্থার। 'এজন্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারো তুমি, যতটা শক্ত হওয়া দরকার হতে পারো। যেমন করে হোক ওর কাছ থেকে ওগুলো উদ্ধার করতেই হবে। জ্যাক ডজকে পাঠাচ্ছি, উদ্ধারের পরে যা করবার সে-ই করবে। খুন খারাবীর ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। ডজ প্রফেশনাল কিলার, এফিশিয়েন্ট এবং আমার কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পেয়ে থাকে। তোমার কাজ শুধু ফিল্মগুলো উদ্ধার করা। তোমার কাজ শেষ না হলে ডজের কাজ শুরু হবে না।'

চিঠিটা পকেটে ভরে রেখে গ্লাসে চুমুক দিল ফন কীসলার। এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল জ্যাক ডজ। এগিয়ে এসে বসল একটা চেয়ারে। হাসল। ঢোলা কোটের পকেট থেকে সিগারেট বের করল।

'আপনার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছি আমি,' বলল ফন কীসলার। আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিল গ্লাসে। 'আর খানিক বাদেই এসে যাবে ওরা। একবার এসে ঢুকলে আর বেরোতে দেয়া হবে না ওদের। আশা করছি, মেয়েটার কাছ থেকে ফিল্ম আদায় করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। ওটা হয়ে গেলেই খতম করে দিতে পারেন আপনি ওদের।'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল জ্যাক ডজ।

'যতক্ষণ না আপনি ওগুলো উদ্ধার করছেন, আমি আড়ালে থাকব।' ডান চোখটা সামান্য একটু ছোট করে চিন্তা করল সে কয়েক সেকেণ্ড। 'গন্ধ শুঁকে কিন্তু এই পর্যন্ত চলে আসবে পুলিস। বুঝছেন? হোটেলের ক্লার্ক জানে যে ওরা এখানে আসছে বেড়াতে। তিন-তিনটে মানুষ তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফন কীসলার। ওর দৃষ্টিতে উদ্বেগ।

'দেখুন···কিভাবে কি করবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। আমি ফিল্ম উদ্ধার করে দিয়েই খালাস। খুন-খারাবির সাথে তো আর আপনি আমাকে জড়াতে পারেন না।'

আবার হাসল জ্যাক ডজ।

'ঘাবড়াবার কিছুই নেই। চমৎকার চিন্তার খোরাক পাওয়া গেছে।' উঠে দাঁড়াল। 'একটা কিছু বের করে ফেলব দেখবেন। আমি যাই, ওদের চোখে পড়ে গেলে অসুবিধে হতে পারে, আমার আড়ালে থাকাই ভাল। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করা দরকার বলে বোধ করছি। আর দু'জন কিছুই না, কিন্তু মাসুদ রানা হচ্ছে ভয়ানক লোক।'

'হ্যাঁ। এ ব্যাপারে মামা সতর্ক করছে আমাকে।'

উঁচু ছাতের উপর প্রকাণ্ড ঘরটা ছেড়ে হলরুমের দিকে পা বাড়াল জ্যাক ডজ। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে উঠে গেল তেতালায়। লম্বা করিডর ধরে অনেকদূর হেঁটে ডাইনে মোড় নিল সে। করিডরের দুপাশের দেয়ালে মধ্যযুগীয় সমরাস্ত্র টাঙানো রয়েছে সারি সারি। একের পর এক অনেক দরজা ছেড়ে নিজের সুইটে পৌঁছল সে। বিশাল এক সিটিং রুম, তার পাশে তেমনি বিশাল শোবার ঘর। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার চাবি লাগিয়ে দিল সে দরজায়। জানালার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে, সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়ে ফেলে দিল নিচে। তারপর চেয়ে রইল সামনের আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে।

ওই পথেই এসে ঢুকবে ওর শিকার।

তেরো

বিশফুট উঁচু বিশাল দেয়াল দেখা গেল প্রথম। দেয়ালের মাথায় আর কয়েক ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। এঁকেবেঁকে দেয়ালের গা ঘেঁষে পৌনে এক মাইল এগিয়ে তারপর দেখতে পেল রানা প্রকাণ্ড লোহার গেট। সামনের সাদা মার্সিডিস গতি কমাল, রানা দেখতে পেল ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে গেটটা, ভিতরে ঢুকে গেল সামনের গাড়ি। রানাও ঢুকল পিছন পিছন। গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে লক্ষ করল সে

গেটের দুই কপাটে বিশাল শীল্ডের মত দুটো ধাতব খণ্ড, তার উপর লতাপাতা আঁকা ইংরেজি দুটো সোনালী অক্ষর—'আর. জি'। অবাক হলো রানা। 'আর. জি'? অক্ষর দুটো যদি নামের আদ্যাক্ষর হয় 'আর. জি' কেন? কেন 'এইচ. বি. কে' নয়? সাদা মার্সিডিসের পিছু পিছু গজ ত্রিশেক গিয়েই গভীর এক লার্চবনের মধ্যে ঢুকল ওর গাড়িটা। জঙ্গলটা এতই গভীর যে এই দিনদুপুরেও আবছা আঁধার হয়ে রয়েছে আঁকাবাঁকা পথটা। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করল সে ভিতর ভিতর। অস্বস্তিবোধের কারণটা ঠিক পরিষ্কার হলো না ওর কাছে. উঁচু দেয়ালের উপর কাঁটাতারের বেড়া, নামের আদ্যাক্ষর, নাকি গভীর বনের গা ছমছমানি—ঠিক কোন্‌টা বুঝতে পারল না সে. কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেও পারল না সে. কেমন খচখচ করতেই থাকল মনটা। মনে হচ্ছে. অজান্তে মরণ ফাঁদে ঢুকে পড়েছে সে।

রিয়ার ভিউ মিররের দিকে চেয়ে হোণ্ডা স্পোর্টস কারটা দেখতে পেল রানা। সাইড লাইট জ্বেলে আসছে পঞ্চাশ গজ পিছনে। মাইল চারেক এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে হঠাৎ খোলা জায়গায় পড়ল রানা। মুহূর্তে গভীর জঙ্গলের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল রৌদ্রোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ সবুজের সমারোহে। অপূর্ব সুন্দর ফুলের কেয়ারি দিয়ে সাজানো বিশাল লন. এখানে-ওখানে ঝিরঝির পানি ছিটাচ্ছে সুদৃশ্য ঝর্না. মৃদু বাতাসে দুলছে টিউলিপ আর ড্যাফোডিলের ঝাড়, দিগন্তে নীল আকাশ, অলস মেঘ সাদা পাল তুলে দিয়েছে সেখানে। এই নিসর্গের এক পাশে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গটা। প্রাচীন দুর্গ. কিন্তু ছিমছাম. পরিচ্ছন্ন। অসংখ্য ছোট বড় গম্বুজ আর সমতল ছাদের সমন্বয়। এখানে ওখানে দুর্গের গায়ে মার্বেলের মূর্তি। বিশাল খিলানের নিচে গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল পাশাপাশি তিনটে গাড়ি।

তড়াক করে লাফিয়ে নামল শিখা গাড়ি থেকে এক ছুটে চলে এল রানার পাশে।

'আরিব্বাপ্‌স্‌!' মুগ্ধকণ্ঠে বলল সে. 'এমনটি দেখিনি জীবনে। রাজপ্রাসাদকেও হার মানায়!'

নেবর এসে যোগ দিল ওদের সাথে। চারপাশে চেয়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে ওরও দু'চোখ।

মস্ত এক কাঠের দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে এগিয়ে এল ফন কীসলার।

'আসুন, আসুন। স্বাগতম। উঠে আসুন।'

মার্বেল পাথরে তৈরি সিঁড়ির কয়েক ধাপ বেয়ে উঠে এল ওরা।

'দারুণ!' বলল শিখা। 'এক কথায় অপূর্ব! এই বিরাট দৈত্যের মত বাড়িতে আপনি সত্যিই একা থাকেন? কম করে হলেও অন্তত পঞ্চাশটা ঘর আছে…'

হেসে উঠল ফন কীসলার। শিখার বিস্ময় দেখে খুশি হয়েছে সে।

'সত্যি কথা বলতে কি, একা ঠিক থাকি না আমি এখানে। দশ বারোজন চাকর-বাকরও থাকে ওই ওপাশে ওদের কোয়ার্টারে। আরও জনা বিশেক কর্মচারী

রয়েছে কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে। দুর্গের পেছনে ওদের কোয়ার্টার। আর ঘরের সঠিক সংখ্যা পঞ্চাশ নয়, একশো পঞ্চাশ।' মৃদু হাসল সে। 'বাড়াবাড়ি বলতে পারেন। আমার নিজের কাছেও মাঝেমধ্যে বাড়াবাড়িই মনে হয়। কিন্তু কি জানেন? পঁচিশ-ত্রিশ বছর এই বাড়িতে বাস করবার পর অন্য কোথাও বাস করবার কথা ভাবতেও পারি না আমি। অভ্যাস হয়ে গেছে।'

অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দুই হাতের ইশারায় এগোবার ইঙ্গিত করল সে সবাইকে। দুপাশে দুই দু'গুণে চারটে ঘর ছেড়ে একটা বিশাল ঘরে চলে এল ওরা। রানা লক্ষ করল প্রত্যেকটা আসবাবের গায়ে ছোট্ট একটা করে শীল্ড আঁটা, তার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা রয়েছে 'আর. জি'। দেয়ালের দুপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছয় দু'গুণে বারোজন ইউনিফর্ম পরা ভৃত্য। এক আঙুলে কাছে ডাকল ফন কীসলার ওদের একজনকে।

'ফ্রিজ আপনাদের ঘর চিনিয়ে দেবে। হাত-মুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে নিন। আধঘন্টা পর লাঞ্চ দিতে বলি, কেমন?' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল, 'দোতলায় কাছাকাছি তিনটে ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করেছি আপনাদের।' হাসল গর্বের হাসি। 'এই দুর্গে পথ হারিয়ে গেলে নিজের ঘর খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে।'

ফ্রিজের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে গেল ওরা তিনজন।

মিনিট বিশেক পর রানার ঘরে এসে ঢুকল শিখা। আনন্দে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সে। বিরাট ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল পার্ক আর দূরের জঙ্গল। চোখ বড় করে চাইল রানার দিকে।

'এলাহি কারবার! মানুষের এত টাকা থাকতে পারে কল্পনা করা যায়?'

লাল শাড়ি পরেছে শিখা। গলায় পরেছে নীল পাথরের মালা। খোলা জানালার কাছ থেকে সরে এল রানার কাছে। বলল, 'বিছানাটায় শুয়ে দেখেছ? দারুণ জমবে আজ রাতে।'

'তারমানে?'

'মানে, আসছি।' আর একটু নিচু করল শিখা গলাটা। 'তোমার ঠিক পাশের ঘরটাই দিয়েছে আমাকে। আজ রাতে আসছি আমি তোমার ঘরে।'

ভুরুজোড়া কপালে তুলল রানা।

'তোমাকে দাওয়াত করেছি বলে তো মনে পড়ছে না?'

'এজন্যে দাওয়াত লাগে না। কাল রাতে কে কাকে দাওয়াত দিয়েছিল, ক্যাসানোভা? তোমার চোখ বলছে আমাকে তোমার দরকার। আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। নারীর মন সব বুঝতে পারে। যাই হোক, আসছি আমি আজ।'

'নারীর মন নেবরের চোখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে?'

হাসল শিখা। বলল, 'বোঝে, লোকটা স্বার্থপর, নীচ প্রকৃতির।'

'তাই নাকি? আমার তো তা মনে হয়নি! কোথায় ও?'

'ওর ঘরে। চলো, নিচে যাওয়া যাক। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে।'

দরজার দিকে এগোলো ওরা। ভিড়ানো দরজার কাছে এসে থেমে দাঁড়াল শিখা, হাত ধরে রানাকে ফিরাল ওর দিকে। বুকের কাছে সেঁটে এসে স্থির দৃষ্টিতে চাইল রানার চোখে। ফিসফিস করে বলল, 'একটা চুমো।'

দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে রানা, কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াবার আগেই টোকা পড়ল দরজায়। সাঁৎ করে সরে গেল দু'জন দু'পাশে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি বুলাতে বুলাতে হাঁক ছাড়ল রানা, 'কাম ইন!'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল নেবর, রানাকে দেখে কিছু আঁচ করবার চেষ্টা করল, বিফল হয়ে ফিরল শিখার দিকে। বলল, 'আমি ভাবলাম হারিয়ে গেছ বুঝি। তাই খোঁজ করতে এলাম।'

কথার তির্যক দিকটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল শিখা। সহজ কণ্ঠে বলল, 'এই তো এখানে আছি। এঁর ঘরটা দেখতে এসেছিলাম··· দারুণ না?'

ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল নেবর।

'ফ্যান্টাস্টিক! তাজ্জব কারবার। প্রত্যেকটা ঘরই যদি এই রকম ডেকোরেটেড হয় তাহলে পুরোটা দুর্গের কি দাম হবে, পুরো এস্টেট চালাবার জন্যে প্রতি মাসে কত লাখ টাকা খরচ হয়, ভাবতে গিয়ে গরম হয়ে উঠেছে আমার মাথাটা। বড়লোক হলে এই রকমই হতে হয়!'

পিছনে খুক খুক বিনীত ভদ্র কাশির শব্দ পাওয়া গেল। করিডরে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রিজ।

'লাঞ্চ লাগানো হয়েছে, স্যার,' বলল সে, 'আপনারা তৈরি হয়ে থাকলে আসুন আমার সাথে। এই দিকে···'

দুশো লোক খেতে বসতে পারে, এই রকম একটা প্রকাণ্ড, উঁচু-ছাদ ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকল ওরা। একটা চেয়ারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল কাউন্ট হ্যান্স ফন কীসলার, আদর-আপ্যায়ন করে বসাল ওদের তিনজনকে। কার কি লাগবে দেখবার জন্যে ছয়জন ফুটম্যান সদা-প্রস্তুত। প্রথমে হোয়াইট ক্যাভিয়ার এল, সেই সাথে চিল্‌ড্‌ ভোদকা, তারপর এল বুনো হাঁসের চপ। সবশেষে শ্যাম্পেন শরবতে হট-হাউস স্ট্রবেরী, সেই সাথে রেড ওয়াইন।

অপূর্ব স্বাদ আর নিখুঁত পরিবেশনার সাথে ফন কীসলারের অমায়িক রসালাপ চমৎকার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল খাবার সময়। সমস্ত আলাপের কেন্দ্রবিন্দু যদিও শিখা, রানা ও নেবরকেও আলোচনার বাইরে রাখল না সে।

রানা লক্ষ করল, প্রত্যেকটা বাসন, পেয়ালা, গ্লাস, তস্তরী, এমন কি চামচ, কাঁটাতেও রয়েছে 'আর. জি' মোনোগ্রাম। আবার সেই অস্বস্তিটা খোঁচাল ওকে কিছুক্ষণ। খাওয়া শেষ করে কফির জন্যে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জের দিকে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল সে কাউন্টকে, 'আচ্ছা, আর. জি. কে?'

ঝট করে ঘাড় ফিরাল ফন কীসলার, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। কিন্তু মুহূর্তে

সামলে নিয়ে হাসল।

'মোনোগ্রামগুলো লক্ষ করছেন বুঝি? এই সবকিছু আসলে আমার নয়, আমার মামার।'

'চমৎকার খাইয়েছেন, কাউন্ট,' একটা আর্মচেয়ারে আরাম করে বসে বলল নেবর। 'অপূর্ব রান্না। আপনার বাবুর্চি কিন্তু আমার দেশের বাবুর্চির চেয়ে কোন অংশে কম যায় না। সত্যিই চমৎকার।'

'ধন্যবাদ,' বলল ফন কীসলার। 'আমার বাবুর্চিটা আপনার দেশেরই।'

শিখার পাশে একটা আর্মচেয়ারে বসল সে। বলিষ্ঠ চেহারার এক উর্দিধারী কফি আর কনিয়াক দিয়ে গেল। ততক্ষণ চুপ করে রইল ফন কীসলার। লোকটা বেরিয়ে যেতেই সরাসরি চাইল সে রানার চোখে।

'আমার মামা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন আপনি, তাই না?' তীব্র হয়ে উঠল ওর চোখ। 'আমার যতদূর বিশ্বাস, তার সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার।'

সিগারেট ধরাল রানা। ফন কীসলারের চেহারায় সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে সে। অমায়িক ভদ্রতার ভাবটা খসে গেছে। ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না ওর কাছে। যদিও মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না, মনে মনে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠল সে। মৃদু হেসে সহজ কণ্ঠে বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তার নাম রুডল্ফ গুস্থার।' জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ দুটো। 'চিনতে পারছেন?'

রানার হাসিটা মলিন হলো না একটুও। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ছাতের দিকে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এবার, বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছে সে ভুল করে। বলল, 'নিশ্চয়ই। কিছুদিন আগে অস্ট্রিয়ায় পরিচয় হয়েছিল ওঁর সাথে। বড় অমায়িক ভদ্রলোক। কেমন আছেন উনি?'

'খুব ভাল আছেন।'

'উনি কি এখানে আসবেন দু'একদিনের মধ্যে?'

'না।' পায়ের উপর পা তুলল ফন কীসলার। চুমুক দিল কফির কাপে। কাপটা নামিয়ে রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে চাইল রানার দিকে। 'খাওয়াদাওয়া, আতিথেয়তা যথেষ্ট হয়েছে··· আর বাজে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, কি বলেন, মিস্টার মাসুদ রানা? এখন বুঝতে পারছেন, আটকে গেছেন ফাঁদে?'

কফির কাপ নামিয়ে রেখে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা তুলে নিল রানা।

'আপনার নিমন্ত্রণের পেছনে যদি গুস্থারের হাত থাকে, আশ্চর্যের কি আছে?' কণ্ঠস্বরের হালকা ভাবটা বজায় রাখল রানা।

আনমনে হলেও কথাবার্তা শুনছিল শিখা, পরিবেশটা পাল্টে গেছে টের পেয়ে হতচকিত দৃষ্টিতে চাইল রানার মুখের দিকে। চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত।

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল সে। 'রসিকতায় আমরা অংশ নিতে পারি না?'

'একশোবার,' বলল রানা। পা দুটো লম্বা করে বাড়িয়ে দিল সামনে। 'তুমিও

এখন একটা পার্টি. জানবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে তোমার। রসালাপটা হচ্ছিল কাউন্টের মামা সম্পর্কে। লোকটা পৃথিবীর সেরা ধনী. ক্ষমতাশালী আর ভয়ানক পাজি বলে দুনিয়াজোড়া দুর্নাম অর্জন করেছে। টাকার জোর না থাকলে আজ সে জেলে আটকা থাকত। বলা যায় না. হয়তো বিচারে ফাঁসি হয়ে গিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রে পরিণত হত। তার আসল নাম হেনরিখ শোয়ার্য। নাতসী আর জাপানীদের সাবান, ফার্টিলাইযার আর গান পাউডার সাপ্লাই দিয়ে কোটি কোটি টাকা করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। শুনে মনে হচ্ছে. তাতে দোষের কি আছে. তাই না? কিন্তু কন্ট্রাক্টে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ ছিল. এসব জিনিস তৈরির ব্যাপারে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করবে সে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিহত লক্ষ লক্ষ ইহুদীর হাড়. দাঁত, চুল আর চর্বি। হেনরিখ শোয়ার্যের কোটি কোটি টাকার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুর লাশের উপর। টাকার জোরে নাম পরিচয় পাল্টে টিকে গেছে কাউন্টের মামা. কাটিয়ে উঠেছে সমস্ত ঝড়-ঝাপটা. আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে. এখানে ওখানে ফেলছে তার অশুভ প্রভাব।' ফন কীসলারের দিকে চেয়ে হাসল রানা। 'এবার তার নজর পড়েছে আমাদের ওপর। যা বলেছি, মিথ্যা বলেছি? বলুন?'

'না, মিথ্যে নয়,' হাসি আসছে না. তবু দেঁতো হাসি হাসল ফন কীসলার রানার অনুকরণে। 'প্রায় ঠিকই বলেছেন। তবে ওসব পুরানো কাসুন্দি। ঐতিহাসিক তথ্য।' জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। 'এ তথ্য খুব বেশি লোকের জানা নেই। দু'চারজন যারা জানে, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার নোংরা নাক গলিয়েছেন আপনি এমন এক বিষয়ে, যেটা প্রমাণ করবার সাধ্য আপনার কেন, পৃথিবীর কারও নেই। বেশি বাড় বেড়ে গিয়েছিলেন আপনি, মাসুদ রানা, এবার জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা হবে আপনাকে।'

ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এমন হুমকি আমি জীবনে বহুবার শুনেছি, ফন কীসলার···আপনার মামার মুখেও শুনেছি আগে; আজকাল আর এসব কথা মনের মধ্যে কোন দাগ কাটতে পারে না. এক কান দিয়ে শুনি, বেরিয়ে যায় আর এক কান দিয়ে।'

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল শিখা, 'এসব কী হচ্ছে··· কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফন কীসলার। 'তুমি তোমার বাপকে ব্ল্যাকমেইল করছ। তোমার কাছে তিনটে ফিল্ম আছে···রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ না করলে সেগুলো অপজিশন পার্টির কাছে পাঠাবে বলে ভয় দেখিয়েছ। সেই ফিল্ম তিনটে চাই আমি।' স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে শিখার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ আগের অমায়িক ভাবটা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। 'শুধু চাই বললে ভুল বলা হবে. আদায় করে নেব আমি ওগুলো।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শিখা। লাল হয়ে উঠল ওর মুখটা, তারপর রক্তশূন্য

ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রাগ দেখা দিল ওর চোখে।

'ও! এই ব্যাপার!' ফুঁসে উঠল সে। 'ওগুলো তোমার পেতে হচ্ছে না! উইলি! এক্ষুণি চলে যাব আমরা এখান থেকে। চলো, উঠে পড়ো! কাঠের পুতুলের মত বসে থেকো না। চলো, চলে যাই।'

ফন কীসলারের নির্বিকার মুখটা পরীক্ষা করছে নেবর। মৃদুহাসি ঠোঁটে নিয়ে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা নাড়াচাড়া করছে সে শান্ত ভঙ্গিতে—কোনরকম উত্তেজনার প্রকাশ নেই ওর ব্যবহারে। শিরশির করে একটা ভয়ের স্রোত বইল নেবরের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে। শিখার দিকে চাইল সে। ভয়টা দমন করতে গিয়ে অস্বাভাবিক চড়া হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। বলল, 'চুপচাপ বসে পড়ো! টের পাচ্ছ না, আটকা পড়েছি আমরা?'

'আটকা পড়েছি মানে?' আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল শিখা। 'আমাদের আটকে রাখার কোন অধিকার নেই ওর? দেখি কে থামায় আমাকে! তুমি না গেলে আমি একাই যাচ্ছি!'

কলে পড়া ইঁদুরের মত ছুটাছুটি শুরু করল শিখা। দৌড়ে গিয়ে এক ঝটকায় দরজাটা খুলে চলে গেল হলরুমে, বাইরে বেরোবার দরজার হাতল ধরে টানাটানি করল। অনড় রইল দরজাটা। তালা মারা। বারোজন ইউনিফরম পরা বডিবিল্ডার পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল, মুখের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই, যেন মুখোশ এঁটে নিয়েছে সবাই। দরজা খুলতে না পেরে চিৎকার করে উঠল শিখা, আবার ছুটে এসে ঢুকল লাউঞ্জে, দৌড়ে গিয়ে একটা জানালা টপকে পড়ল সামনের বারান্দায়। সামনে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে গেলেই ছোট্ট লাল গাড়িটা। বিজয়গর্বে একবার পিছন ফিরে চেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে, হঠাৎ আঁতকে উঠে থেমে দাঁড়াল। বিকট চেহারার বিশাল দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির নিচে। হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁত বের করে গরর্ ডাক ছাড়ল। সাদা ভয়াল দাঁত দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল শিখার। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে কুকুরগুলোর দিকে সম্মোহিতের মত। নিচু হয়ে তেমনি রাগী, চাপা গর্জন করতে করতে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল কুকুর দুটো। শিউরে উঠে দিশেহারার মত পিছন ফিরেই দৌড় দিল সে। গলা ছেড়ে একসাথে গর্জন করে উঠল কুকুরগুলো। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল শিখা, পড়েই আবার উঠে পড়িমরি করে ছুটে এল লাউঞ্জে।

'কুকুর···কুকুরগুলো···' ফন কীসলারকে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতে দেখে থেমে গেল শিখা।

'পালাবার রাস্তা নেই, ম্যাডাম। বসো ওই চেয়ারটায়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে তোমাকে কুকুরগুলো। বলে ফেলো, ফিল্মগুলো কোথায়?'

দুইচোখে আবার রাগের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল শিখার।

'ওগুলো কিছুতেই পাবেন না আপনি!' ঝট করে ফিরল নেবরের দিকে।

'দোহাই তোমার, কিছু একটা করো! হাঁ করে বসে রয়েছ কেন? করো কিছু একটা!'

'কি করব?' ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছে নেবর। 'কি করার আছে এখন? তোমার জন্যে আজ সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থার। তুমিই করো যা খুশি, আমি এর মধ্যে নেই।'

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। শুনছে ওদের কথাবার্তা।

'ওগুলো কিছুতেই দেয়া যাবে না ওকে!' একহাত মুঠো করে আরেক হাতের তালুতে কিল দিল শিখা। 'জোর করে কিভাবে আদায় করবে ও? কিছুতেই দেব না। অসম্ভব!'

'সম্ভব,' বলল ফন কীসলার। যেন একঘেয়েমিতে ভুগছে, এমনি কণ্ঠস্বর। 'আমি যা চাই, তা আদায় করে নেয়ার ক্ষমতা আমার আছে। কিভাবে আমি মানুষকে রাজি করাই তার কিছু নমুনা দেখতে চাও?'

'চুলোয় যাও তুমি, হারামজাদা কোথাকার!' জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেষ্টা করল শিখা ফন কীসলারকে। 'কিছুতেই পাবে না তুমি ওই ছবি। এক্ষুণি যদি আমাদের এখান থেকে চলে যেতে না দাও, আমি···আমি পুলিসে খবর দেব।'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফন কীসলার শিখার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'এখনও কচি খুকিই রয়ে গেছ তুমি···অপরিণত, অপরিপক্ক। পুলিস ডাকবে বলছ, ঠিক আছে, শোনা যাক, কিভাবে ডাকবে ওদের?'

মরিয়া হয়ে রানার দিকে ফিরল শিখা।

'তুমিও কি হাঁ করে তামাশা দেখবে? করবে না কিছুই?' দুই পা এগিয়ে এল ওর দিকে। 'তোমরা পুরুষ মানুষ, না কি! মুরগির বাচ্চার মত ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে! আমাকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছ না কেন?'

'চারটে টেক্কাই কাউন্টের হাতে,' শান্তগলায় বলল রানা। 'দেয়ালে মাথা ঠুকে লাভ নেই, শিখা। ফিল্মগুলো দিয়ে দাও ওকে।'

বিতৃষ্ণার সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিল শিখা, চাইল সোজা ফন কীসলারের চোখে।

'কিছুতেই পাবে না তুমি ওগুলো। বুঝতে পেরেছ? কিছুতেই দেব না!'

যেন মাছি তাড়াচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে হাত নাড়াল ফন কীসলার শিখার উদ্দেশে। নেবরের দিকে ফিরল সে এবার। কপাল কুঁচকে আছে বিরক্তিতে।

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই? তোমাদের পথে আনা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ। কাজেই অযথা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না করে বলে ফেলো: ফিল্মগুলো কোথায়?'

শুকনো ঠোঁট চাটল নেবর, বাম গালটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ওর নিজেরই অজান্তে।

'যদি বলে দাও, খুন করব আমি তোমাকে!' তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করে উঠল

শিখা। 'জোর করে কিছুতেই আদায়...'

বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল ফন কীসলার। চটাশ করে এক চড় কষাল শিখার গালে। এতই জোরে মারল যে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ছোট একটা টেবিল উল্টে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে মোজাইক করা মেঝেতে।

নিজের হাত দুটোর দিকে চাইল রানা। যেমন ছিল তেমনি বসে রইল চুপচাপ। সময় হয়নি। এখন কিছু করতে গেলে চোখের পলকে ঘর ভর্তি হয়ে যাবে ইউনিফরম পরা বডি বিল্ডারে। মারধোর খাওয়া ছাড়া লাভ হবে না কিছু। ব্যথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে শিখা মেঝেতে, খাক। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে, ফোঁপাক।

শিখাকে ধরবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল নেবর, কি ভেবে বসে পড়ল আবার।

'আমি দুঃখিত,' বলল ফন কীসলার শান্ত গলায়। 'কোন রকম অপ্রীতিকর কিছু ঘটুক তা চাইনি আমি, কিন্তু এই বেয়াড়া মেয়েছেলেটা যা আরম্ভ করেছে...গর্দভ...অবস্থার গুরুত্ব বুঝবার ক্ষমতা নেই।' দুই সেকেণ্ড শিখার দিকে চেয়ে থেকে বসে পড়ল আবার। ফিরল সে নেবরের দিকে। 'কোথায় ফিল্মগুলো।'

'প্যারিসে, আমার ব্যাংকে।'

'কাপুরুষ!' ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল শিখা। 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি...' দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে আসছিল শিখা নেবরের দিকে, কিন্তু দুই পা ফেলার আগেই পৌঁছে গেল রানা ওর কাছে, ঘুসিটা এড়িয়ে ধরে ফেলল ওকে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো,' কানে কানে বলল রানা। 'এখন উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই। জিততে হলে কিছুটা হারতেও হয়।'

দুই সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল শিখা। তারপর রানার হাত ছাড়িয়ে টলতে টলতে এসে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। আঁচল দিয়ে মুছছে চোখ।

নিজের চেয়ারের কাছে ফিরে এল রানা, একটা হাতার উপর বসে সিগারেট ধরাল আবার।

'আপনার একটা চিঠি লিখতে হবে ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে,' বলল ফন কীসলার। ঘরের কোণে রাখা একটা ডেস্কের দিকে দেখাল আঙুল তুলে। 'কাগজ-কলম-খাম সবই পাবেন ওখানে। পত্রবাহকের হাতে ফিল্ম তিনটে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেবেন আপনি চিঠিতে। আমার লোক ফিল্ম নিয়ে প্যারিস থেকে ফিরে আসার পর ছাড়া পাবেন আপনারা তিনজন।' মাথা ঝাঁকাল সে টেবিলের দিকে। 'যান, লিখে ফেলুন।'

সামান্য একটু ইতস্তত করে উঠে পড়ল নেবর চেয়ার ছেড়ে। ডেস্কে গিয়ে বসল। দ্রুতহাতে লিখল চিঠিটা, এনভেলাপের উপর ঠিকানা লিখল, তারপর ফিরে এসে চিঠি ও খাম দিল ফন কীসলারের হাতে।

চিঠিতে একবার নজর বুলিয়েই খুশি হয়ে উঠল ফন কীসলার।

'এক্সেলেন্ট। আপনার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল সে। 'দুইদিনের মধ্যেই মুক্তি দেব আপনাদের। এই দুটো দিন মনমরা হয়ে না থেকে যত খুশি আমোদ-ফূর্তি করুন। তবে সামনের ওই গাড়ি বারান্দায় আপনাদের না যাওয়াই ভাল। কুকুরগুলো সত্যিই ভয়ঙ্কর। গাড়ির কাছে কিছুতেই পৌছতে পারবেন না আপনারা। দুর্গের পেছনে সুন্দর সুইমিং পুল আছে, ইচ্ছে করলেই ব্যবহার করতে পারেন ওটা। বিলিয়ার্ড রুম আছে, টেবিলটেনিসের ব্যবস্থা আছে—মোটকথা সময় কাটাবার জন্যে কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না আপনাদের। দুর্গের সুযোগ-সুবিধের সদ্ব্যবহার করলে আমি খুশিই হব। চলি এখন, ডিনারের সময় দেখা হবে আবার। ইতিমধ্যে যখন যা খুশি চাইবেন ফ্রিজের কাছে।'

সন্তুষ্টচিত্তে চিঠিহাতে চলে গেল ফন কীসলার। ওর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছে সে। জ্যাক ডজ এখন কিভাবে কি করবে, পারবে কি পারবে না, সেসব দেখবার দরকার নেই ওর।

উঠে দাঁড়াল রানা।

'লাঞ্চের পর ছোটখাট একটা ঘুম না দিলে জমে না,' বলল সে। ফিরল শিখার দিকে। 'ঘণ্টা দুয়েক পর সুইমিং পুলে দেখা হতে পারে।'

হলরুমে চলে এল রানা। দাঁড়িয়ে রয়েছে চাকর-বেয়ারার ইউনিফরম পরা লোকগুলো লাইন দিয়ে। রানা চাইল ওদের মুখের দিকে। ওরাও নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। কারও চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। ছোট্ট একটা শিস দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল রানা।

চোদ্দ

ঠিক চারটের সময় সুইমিং কস্টিউম পরে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। খালি গা, কাঁধে প্রকাণ্ড এক তোয়ালে। করিডরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ফ্রিজ, রানাকে দেখেই মাথা ঝুঁকিয়ে নড় করে পথ দেখাল সুইমিং পুলের।

দুর্গের পিছনের আঙিনায় সুইমিং পুলটা। ছোট্ট পুল—ষাট ফুট চওড়া, একশো বিশ ফুট লম্বা। ডাইভ দেয়ার জন্যে বোর্ড রয়েছে তিন থাক। চারপাশে এখানে ওখানে রোদ পোহাবার জন্যে লাউঞ্জিং চেয়ার, বৃষ্টি বা রোদ আড়াল করার জন্যে মার্বেল পাথরের ছাতা। পুলটা এমন ভাবে তৈরি যে বিকেলের পড়ন্ত রোদ বিছিয়ে রয়েছে স্বচ্ছ নীল পানিতে। হাত দিয়ে দেখল রানা, পানিটা গরম।

সবচেয়ে উঁচু তাক থেকে সমারসল্ট ডাইভ দিয়ে নামল রানা সুইমিং পুলে। ভুশ করে ভেসে উঠল দশ গজ দূরে, লম্বালম্বি ওপারে চলে গেল ফ্রী স্টাইল সাঁতার কেটে, ফিরে এল ব্রেস্ট-স্ট্রোক দিয়ে, তারপর আয়েশ করে ব্যাক-স্ট্রোক দিয়ে

রওনা হলো আবার ওপারের দিকে। শিখাকে দেখতে পেল সে। সাদা একটা বিকিনি পরেছে। ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁই সাঁই সাঁতার কেটে রানার পাশ দিয়ে বেরিয়ে ওপারে চলে গেল সে. পাথরের দেয়ালে হাত স্পর্শ করামাত্র পাঁই করে ঘুরে দেয়ালে পা বাধিয়ে পাকা সাঁতারুর মত ঝাঁপ দিল সামনের দিকে। রানার গা ঘেঁষে দু'পাশে ঢেউ তুলে চলে এল আবার এপারে। এপারে পৌঁছেই দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ল সে কিনারে, ওখানে বসে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে, পা দুটো পানিতে।

অলস ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে ওর কাছে ফিরে এল রানা. পা দুটো চালু রেখে চাইল ওর মুখের দিকে।

'রাগটা কমেছে?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এর মধ্যে হাসির কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি, রানা,' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল শিখা। 'হাসির ব্যাপার নয়। আমাদের ভাগ্যে ঠিক কি ঘটতে চলেছে আন্দাজ করতে পারো?'

পায়ের কব্জি ধরে একটানে পানিতে নামিয়ে আনল ওকে রানা, চট করে একটা হাত ধরে ঠেলে রাখল যাতে মাথাটা ভেসে থাকে উপরে।

'আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে,' বলল সে কানে কানে। 'তেতালার জানালা থেকে।'

পুলের মাঝামাঝি গিয়ে আবার ফিরে এল শিখা।

'কে লোকটা?'

'আমার চেনা কেউ না। চলো ওই ওপারে গিয়ে খানিক সানবাথ করা যাক। দুয়েকটা কথা বলা যাবে ওখানে শুয়ে শুয়ে। গলাটা নিচু রাখবে, আর কিছুতেই উত্তেজিত হবে না। মনে রাখবে আমাদের প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছ?' হাসল রানা। 'দেখা যাক, কে আগে পৌঁছায় ওপারে।'

ঘাড় কাত করল শিখা। রওনা হয়ে গেল ওরা। চল্লিশ গজ যেতে পনেরো গজ পিছনে পড়ল শিখা। উঠে পড়ল ওরা পানি থেকে, শুয়ে পড়ল লি-লোর উপর।

সিগারেট আর লাইটার নিয়ে ফ্রিজ এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল কি ড্রিংক আনবে। একটা সিগারেট নিল রানা, ড্রিংক লাগবে না বলে হাত নেড়ে বিদায় করে দিল ফ্রিজকে। লোকটা বিদায় নিয়ে যথেষ্ট দূরে সরে যেতেই নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'আশাকরি কোন্ ফাঁদে পড়েছ টের পাচ্ছ এবার পরিষ্কার?'

রানার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে কয়েক টান দিয়ে ফিরিয়ে দিল শিখা।

'কিন্তু···তোমার ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। এসবের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'তোমার বাবার তরফ থেকে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে ফিল্ম তিনটে উদ্ধার করার জন্যে।' চিৎ হয়ে শুয়ে নীলাকাশ দেখতে দেখতে যেন এটা একটা সাধারণ কথা, এমনি ভাবে বলল রানা। 'তোমার মত একটা মেয়ে কি করে ওই কাজটা

করল কিছুতেই মাথায় আসছে না আমার।'

'বাবা নিয়োগ করেছে তোমাকে! আমার পেছনে লাগানো হয়েছে তোমাকে…' উঠে বসতে যাচ্ছিল শিখা, সামলে নিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠেছে ওর ভয়ানক ভাবে। 'তুমি বাবার লোক?'

'তোমার বাবাকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি,' বলল রানা। 'তোমাকেও পছন্দ করি না। কাজটা হাতে নিয়েছি আমি কেবল টাকার জন্যে, আর কোন কারণ নেই। পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া হচ্ছে এজন্যে আমাকে।'

'আমাকে পছন্দ করো না মানে?' চোখ পাকিয়ে চাইল শিখা রানার দিকে। 'কাল রাতে তো কই অপছন্দ করতে দেখলাম না?'

'রাত বারোটার পর কোন মেয়ে যদি আমার শোবার ঘরে এসে ঢোকে, তাড়িয়ে দিতে চাইলেও জোর করে বিছানায় এসে ওঠে, বিশেষ করে সে যদি তোমার মত অপূর্ব সুন্দরী হয়—সাধারণত তার কামনা আমি পূরণ করি, শূন্যহাতে তাকে ফিরাই না,' বলল রানা। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাকে আমি পছন্দ করি, কিংবা তার জন্যে আমার কিছু এসে যায়।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাকে অপছন্দ করবার কারণটা জানতে পারি?'

'কারণ তুমি একজন ব্ল্যাকমেইলার।' সরু করে ধোঁয়া ছাড়ল রানা আকাশের দিকে। সিগারেটের খানিকটা জমে ওঠা ছাইয়ের দিকে চোখ রেখে বলল, 'ব্ল্যাকমেইলাররা সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী—ওদেরকে কিছুতেই সহ্য হয় না আমার।'

স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে শিখা। একটা হাত পেটের উপর, আরেকটা বুকে। মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে একটার উপর আরেকটা।

'ঠিক আছে, আমি একজন ব্ল্যাকমেইলার। কিন্তু এছাড়া আর কিভাবে আমি শায়েস্তা করতে পারতাম বাবাকে? সৎমাকে? ওদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে হলে আর কি উপায় ছিল? আমার হাতে যে অস্ত্র ছিল সেটা প্রয়োগ করেছি আমি। প্রধানমন্ত্রী আর হতে হচ্ছে না তার।'

পাশ ফিরে শিখার চোখের দিকে চাইল রানা।

'আচ্ছা বলো তো, কেন তুমি তাকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিতে চাও না?'

'আমার বাবা আর তার স্ত্রীর মত নীচমনা, স্বার্থপর লোক পৃথিবীতে আর নেই। এরা পারে না এমন কাজ নেই। এতবড় একটা দেশ চালানোর যোগ্যতা নেই তাদের।'

'বাজে বকছ। ভাল মন্দ সবরকম গুণের সমন্বয় না থাকলে দেশ চালানো যায় না। তোমার অভিযোগ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।'

'ঠিক আছে, স্বীকার করছি, ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই এই কাজটা করছি আমি। কিন্তু এই আক্রোশটা কি খামোকাই জন্ম নিয়েছে আমার মধ্যে। তাদের কোন দোষ নেই? আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, আমার জীবন ভাজাভাজা করে শেষ

করে দিয়েছে ওরা দু'জন মিলে। সুযোগ পেলে আমি ওদের শেষ করে দেব না কেন?'

'তুমি কি বুকে হাত রেখে বলতে পারো, ওদের জন্যেই তোমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে? আমি বলছি না যে তাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার নিজের দোষ কিছুই নেই, সব দোষ বাপ-মায়ের?'

'ওসব সাইকিয়াট্রির চাল ছাড়ো!' তিক্ত কণ্ঠে বলল শিখা। অতকথা বলার সময় নেই, নইলে একে একে সব শোনাতাম তোমাকে। বুঝতে পারতে কী অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছে ওরা আমাকে। কি আশ্চর্য কৌশলে প্ল্যান করে দেশ থেকে সরানো হয়েছে আমাকে। শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে তোমার। একটা কচি মেয়েকে কি নিষ্ঠুর নির্যাতন...' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল শিখা। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল চোখ থেকে। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'সে কথা কাউকে কোনদিন বোঝাতে পারব না আমি!'

'বুঝলাম, খুব কষ্ট দিয়েছে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা, 'কিন্তু তাই বলে এতটা? ব্লু ফিল্মে অভিনয় করতে হবে? সাধারণ একটা খারাপ লোকের মত সেটার সাহায্যে ব্ল্যাকমেইল করতে হবে? ভাবছি এমন একটা বিশ্রী জিনিস তোমার মাথায় এল কি করে?'

'আমার না, এসেছে উইলির মাথায়। ও মোটেই ভাল লোক না তাছাড়া ওর নিজস্ব কিছু স্বার্থও রয়েছে এর পেছনে। কিন্তু যাই হোক, কাউকে পরোয়া করবার দরকার কি আমার? উচিত শিক্ষা দেয়ার এত বড় একটা সুযোগ আমি হাতছাড়া করব কেন? সারা দুনিয়ার কাছে ছোট করে দেব ওদের মুখ, ধূলিসাৎ করে দেব ওদের অন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস না করলে আমার কিছু এসেও যায় না...ওই ছবিগুলো করতে আমার ভয়ানক খারাপ লেগেছিল। আমি চেয়েছিলাম, একটা ছবি তুলে পাঠাব বাবার কাছে—দেখুক, বুঝুক মজা। উইলির চাপাচাপিতে আরও তিনটে তুলতে হয়েছে ওকে...'

'কেন? তিনটে তুলতে হয়েছে কেন?'

'ও পালাতে চায় প্যারিস থেকে। ওর সব টাকা নাকি চলে যাচ্ছে আর একজনের পকেটে। দুই লাখ ডলার জোগাড় করতে পারলেই আমেরিকায় চলে যাবে ও, ওখানে ব্যবসা শুরু করবে। প্রথম ফিল্মের ধাক্কাটা একটু থিতিয়ে এলে ঘা শুকাবার আগেই যাবে দ্বিতীয় ফিল্ম, সেইসাথে যাবে দুই লাখ ডলার দিয়ে বাকি দুটো ফিল্ম ওর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে চিঠি।'

'এতে রাজি হলে তুমি?'

'কেন রাজি হব না? ওদের গাঁট থেকে টাকা খসলে আমার ক্ষতি কি? কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমার দ্বারা উইলির যদি কোন উপকার হয়, আর সেই উপকার করতে গিয়ে যদি ওদের কিছু ক্ষতি করা যায়...ব্যস, আর কি চাই? দাঁড়াও না, চোরের উপর বাটপারি করছে কাউন্ট... কেড়ে নিচ্ছে ফিল্মগুলো।

নিক। তারপর? থোড়াই কেয়ার করি আমি প্যারিসে ফিরে গিয়ে আরও দশটা তৈরি করব আমি ওই রকম কিংবা ওর চেয়েও খারাপ ফিল্ম। আমাকে ঠেকাবে কি করে?'

'কাউন্ট কেন ওগুলো কেড়ে নিচ্ছে বুঝতে পারছ?'

'জানি না। হয়তো সেও ব্ল্যাকমেইল করতে চায়। করুক না. তাতে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।'

'কাউন্ট রুডলফ গুস্থারের লোক.' শান্ত গলায় বলল রানা. 'আর গুস্থার তোমার বাবার বন্ধু।'

'ঠিক আছে ওগুলো উদ্ধার করে বাবাকে ফিরিয়ে দেবে তো? দিক না! প্যারিসে ফিরে গিয়ে আরও ছবি তৈরি করব আমি '

'প্যারিসে ফিরে?' মুচকি হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে সিগারেটটা টোকা দিয়ে বহুদূরে ফেলে দিল। 'তোমার ধারণা প্যারিসে ফিরে যেতে পারবে তুমি?'

ঝট করে ফিরল শিখা রানার দিকে। চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত

'নিশ্চয়ই! এখান থেকে বেরিয়েই সোজা…কি বলতে চাইছ তুমি!'

ভাসমান সাদা মেঘের উপর চোখ রেখে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল রানা. 'তুমি এত বোকা. জানতাম না। ফিল্মটা হাতে পাওয়ার পর যাতে আমরা কেউ কোনদিন এখান থেকে বেরোতে না পারি সে ব্যবস্থাও করবে কাউন্ট তুমি বা তোমার বন্ধু নেবর জীবনে আর একটি নীলছবিও তৈরি করতে পারবে না।'

কয়েক সেকেণ্ড কথা সরল না শিখার মুখ থেকে হাঁ করে চেয়ে রইল রানার নির্বিকার মুখের দিকে।

'ঠাট্টা করছ। খামোকা আটকে রাখতে যাবে কেন? কিভাবে রাখবে? তাছাড়া ও তো বলেইছে. ফিল্মগুলো হাতে পেলেই ছেড়ে দেবে আমাদের। ছাড়া পেলেই ফিরে গিয়ে আবার তৈরি করব আরও কয়েকটা।'

'ছাড়া তুমি পাবে না. শিখা। তোমাকে আরও ছবি তৈরির সুযোগই যদি দিল, তাহলে এগুলো কেড়ে নিয়ে কি লাভ হলো ওদের? তোমাকে প্যারিসে ফিরতে দিলে এত কষ্ট করবার আর কোন মানেই থাকে না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শিখা কথার পিঠে. কিন্তু থেমে গেল। চিন্তা করছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করবার পর হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

'তুমি বলতে চাও…' মুখ দিয়ে কথা সরল না শিখার. প্রবল বেগে মাথা নাড়ল। 'আমি বিশ্বাস করি না!'

'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। সহজ যুক্তিতে যা আসে. আমি তাই বলছি। ফিল্মগুলো এসে পৌঁছলেই চিরকালের জন্য মুক্তি দেবে ও আমাদের।' পাশ ফিরে কনুই ভাঁজ করে হাতের উপর মাথা রাখল রানা। সুন্দর, সুসজ্জিত লন পেরিয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেল দূরের ঘন জঙ্গলের দিকে। এত বিশাল একটা এলাকায়

গোপনে তিনটে লাশ পুঁতে ফেলার জায়গার অভাব হবে না।'

'তুমি বলতে চাও, খুন করবে ও আমাদের? অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না!'

'ওর মামাকে চিনি আমি। ও যদি ওর মামার গুণের এক কণাও পেয়ে থাকে, তিনটে খুন ওর কাছে তিনটে মশা মারার মত সহজ কাজ। খামোকা এত ঘটা করে ডেকে আনেনি ও আমাদের এখানে।'

'কিন্তু তিন তিনজন মানুষকে খুন করে ফেলবে...অসম্ভব! খেলা নাকি? হোটেল কর্তৃপক্ষ জানে যে আমরা এখানে। যখন...যদি...একটা এনকোয়্যারী মত হবে না? পুলিস—না, এটা হতেই পারে না। এত ভয়ানক একটা কাণ্ড করবার সাহস পাবে না ফন কীসলার।'

'পুলিসের ওপর খুব ভরসা তোমার, তাই না? ওদের চোখে ধুলো দেয়া কি খুব কঠিন কাজ? এখানে আসবার আগে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম আমার ঘরের জানালা দিয়ে চেয়ে। তোমাদের গাড়িটা নিয়ে চলে গেল একজন লোক। তার দুই মিনিট পর আমারটাও অনুসরণ করল ওটাকে। আমার যতদূর ধারণা তোমাদের গাড়িটা পাওয়া যাবে মিউনিখের কোন কার-পার্কে, আমারটা হয়তো অনেক খোঁজ খবর করে পাওয়া যাবে বার্লিন কিংবা ফ্র্যাংকফুর্টে। হ্যাঁ, পুলিস ঠিকই আসবে। কিন্তু কাউন্ট হ্যানস ফন কীসলার যদি বলে দু'দিন বেড়িয়ে আমরা রওনা হয়ে গিয়েছি ফ্রান্সের উদ্দেশে তারপর আমাদের আর কোন খোঁজখবর পায়নি, মেনে নিতে বাধ্য হবে ওরা। আমাদের লাশ পাওয়া যেতে পারে মনে করে এই বিশাল এস্টেটের প্রতি ইঞ্চি মাটি ওরা খুঁজে দেখবে, এতটা আশা করা বোকামি। তাই না?' হাসল রানা। 'আর, যদি খুঁজে পায়ও আমাদের কি লাভ?'

শিউরে উঠল শিখা।

'আমি বিশ্বাস করি না।' গলাটা নরম হয়ে এসেছে ওর। 'খামোকা ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ তুমি আমাকে। আমাকে ঘৃণা করো, তাই ভয় দেখিয়ে কষ্ট দেবার চেষ্টা করছ।'

'তোমাকে ঘৃণা করি না আমি, শিখা। ঘৃণা আমি, পৃথিবীর কাউকেই করি না। রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা, অভিমান, ঘৃণা, স্নেহ-পিপাসা—সব মিলে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে তোমার মধ্যে, ঘোলা হয়ে গেছে সহজ, স্বাভাবিক বুদ্ধি। এরকম ঘোলাটে চরিত্রের মানুষ আমি পছন্দ করি না। এরা মানুষকে কষ্ট দেয়, তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট পায় নিজেরাই—লাভ কারও হয় না কিছু। যাই হোক, শোনো: আজই রাত দশটার দিকে কাউন্টের লোক পৌঁছে যাবে প্যারিসে। কাল সকাল দশটা নাগাদ চিঠি দেখিয়ে ব্যাংক থেকে তুলবে ছবির রীলগুলো। দুটোর প্লেনে ফিরে আসবে সে...এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল ছ'টা। অর্থাৎ, কাল বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সময় পাচ্ছি আমরা। এরই মধ্যে এখান থেকে জ্যান্ত বের হওয়ার একটা কিছু প্ল্যান তৈরি করতে হবে।'

'সত্যিই মনে করো ফিল্মগুলো হাতে এলেই এই লোক খুন করবে আমাদের

তিনজনকে?'

'হাতে এলেই খুন করবে না,' বলল রানা। 'তাহলে তো প্যারিস থেকে ফিল্মগুলো পাওয়া গেছে এই খবর পাওয়া মাত্র সকাল এগারোটার মধ্যেই খতম করে দিতে পারত আমাদের। আসলে ছবিগুলো দেখতে হবে ওর, পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে ঠিক ছবি হাতে এসেছে কিনা। তারপর, যদি যা চেয়েছিল তা হাতের মুঠোয় এসে গিয়ে থাকে, তখন আর দেরি করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না।'

'সত্যিই খুন করবে?' গভীর দৃষ্টিতে রানার অন্তস্তল দেখবার চেষ্টা করছে যেন শিখা।

উঠে পড়ল রানা। তোয়ালেটা কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে হাসল স্মিতহাসি।

'ওর জায়গায় ও না হয়ে তুমি হলেও তাই করতে না?' কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না রানা। লম্বা পা ফেলে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

বিস্তৃত লনের দিকে চাইল শিখা। চারদিকটা এত খোলামেলা যে বিশ্বাসই হতে চায় না। যে ওরা বন্দী হয়ে আছে এখানে। হঠাৎ চোখ পড়ল, জঙ্গলের ধারে ঘাপটি মেরে বসে আছে দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর, দুই পায়ের উপর মাথা রেখে চেয়ে আছে ওর দিকে। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল সে, তোয়ালেটা খামচি দিয়ে তুলে নিয়ে ছুটল রানার পিছু পিছু।

তেতলার একটা জানালার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল জ্যাক ডজ, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। দূরের কুকুরগুলোর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সরে এল ঘরের মাঝখানে রাখা একটা টেবিলের পাশে। টেবিলের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছে টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো একটা পয়েন্ট টুটু টার্গেট রাইফেল। হাতে তুলে নিল সে ওটা। বার কয়েক গুলি করবার ভঙ্গিতে কাঁধে তুলল, তারপর গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। একটা কুকুরের উপর লক্ষ্য স্থির করল সে। দূরত্ব কমে গেল দশগুণ। ক্রসহেয়ারের মাঝের বিন্দু স্থির হয়ে রয়েছে একটা কুকুরের মাথার উপর। ফোকাসিংটা সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করে কুকুরের প্রতিটা পশম স্পষ্ট করে তুলল সে, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল সে রাইফেলটা।

দুটো টোকা পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকল ফন কীসলার। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গাড়ি দুটোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু···ওদের কি এখানেই শেষ করতে চান, মানে, এই এলাকার মধ্যেই?'

'তবে আবার কোথায়?' ভুরু নাচাল জ্যাক ডজ। সিগারেটের গোড়ায় ফুকফুক গোটা কয়েক টান দিয়ে ফেলে দিল ওটা অ্যাশট্রেতে। 'কবর কোথায় দিচ্ছেন সেই কথা ভাবুন এখন।'

'ভেবেছি এই পুরো এলাকার যত জঞ্জাল, কাটা ঘাস, মরা ডাল, ঝরা

পাতা—সব ফেলা হয় একটা মস্ত গর্তে। দিনরাত চব্বিশঘন্টা দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওখানে, সেই তাপ ব্যবহার করি আমরা সুইমিং পুল গরম রাখবার কাজে। ওর মধ্যে ফেলে দেয়া যায়। তাহলে আর কবর টবরের ঝামেলা থাকে না। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে লাশগুলো একঘন্টার মধ্যে।'

'এখানকার কর্মচারীদের সবাইকে বিশ্বাস করা যায় তো? কাজটা করতে ওদের ব্যবহার করতে হবে আপনার।'

একটু ইতস্তত করে ফন কীসলার বলল, 'এদের একটা লোককেও ভাল করে চিনি না আমি। প্রত্যেকে মামার নিয়োগ করা লোক। আপনাকে যতটা চিনি, ঠিক ততটাই চিনি আমি ওদেরকে। ওদের কিছু বেশিদিন ধরে দেখছি, এই যা।'

'তাহলে সব ঠিকই আছে,' বীভৎস হাসি ফুটে উঠল জ্যাক ডজের মুখে 'আপনার নিজস্ব লোক থাকলে চিন্তা ছিল, গুস্থারের লোক হলে কোন ভাবনা নেই।'

ঘরের চারদিকে চাইল ফন কীসলার। আবার একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কি দিয়ে কি করছেন?'

'এই একটু টার্গেট প্র্যাকটিস করব আর কি।' রাইফেলটা যত্নের সাথে হাতে তুলে নিল ডজ, বলল, 'খুব সুন্দর জিনিসটা, চমৎকার ব্যালেন্স। দুশো গজ দূরের ছুটন্ত খরগোশও ফেলে দেয়া যাবে এটা দিয়ে।'

'কিন্তু…পয়েন্ট টুটু ক্যালিবারের…'

'ক্যালিবার বড় কথা নয়, কাউন্ট। আসল কথা হচ্ছে হাতের টিপ, আর ব্যালিস্টিক নলেজ। ঠিক জায়গামত খানিকটা সীসা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই, ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই।'

জায়গামত সীসা ঢুকলে কি ঘটবে কল্পনা করে চোখমুখ বিকৃত করল ফন কীসলার। তারপর বসে পড়ল চেয়ারে।

'তবে রানার ব্যাপারে সাবধান! আজ লাঞ্চের পর টের পেয়েছি লোকটার ভেতরের ক্ষমতা। আশ্চর্য ঠাণ্ডা লোক! একবিন্দু ভড়কায়নি! সব জেনেও একফোঁটা মলিন হয়নি মুখের হাসি। কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরে বেশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি আমি এখন। অস্ত্র নেই ওর কাছে। ওর জিনিসপত্র ঘেঁটেছি, সারাঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করে দেখেছি, কোন অস্ত্র নেই। তবু পুরো ভরসা পাচ্ছি না। লোকটা সত্যিই ভয়ঙ্কর।'

আবার সেই বীভৎস হাসিটা ফুটে উঠল জ্যাক ডজের মুখে।

'ভয় নেই, ওকেই প্রথম শিকার করব।'

পনেরো

ঘরে ঢুকেই টের পেল রানা, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঢুকেছিল ওর ঘরে। ও যখন সুইমিং পুলে কথা বলছে শিখার সাথে, সেই সময়ে সুযোগ বুঝে সার্চ করে গেছে কেউ এই ঘরটা, বিশেষ করে ওর সুটকেসটা।

দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে চাবি মেরে দিয়ে একটানে খাটের উপর তুলল সে সুটকেস। ডালা খুলে যা ছিল সব বিছানার উপর ফেলল উপুড় করে। জিনিসপত্র কি আছে, কি গেছে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না ও। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল সুটকেসের তলাটা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখ। সার্চ যে-ই করে থাকুক, সে যে প্রফেশনাল নয়, আনাড়ী, বুঝতে পারল সে পরিষ্কার। সুটকেসের লাইনিং-এর ভাঁজে লুকানো ছোট্ট একটা স্প্রিং-এ চাপ দিল সে। ক্লিক শব্দে খুলে গেল সুটকেসের তলাটা। চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে সুন্দর করে আটকানো রয়েছে ওর অস্ত্রশস্ত্র—ওয়ালথার পি. পি. কে. দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন, সাইলেন্সার, হাতলসহ নয় ইঞ্চি লম্বা একখানা ক্ষুরধার ছুরি, আর ছোট্ট পিং-পং বলের সমান একটা টিয়ার গ্যাস বম্ব।

আসল জিনিস কিছুই খোয়া যায়নি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তলাটা নামিয়ে দিল সে যথাস্থানে। ক্লিক করে আটকে গেল সেটা জায়গামত, বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। আবার জিনিসপত্র সব ভরে দিয়ে নামিয়ে রাখল রানা সুটকেস। সুইমিং কস্টিউম খুলে শাওয়ারের নিচে ভিজল সে কয়েক মিনিট, তারপর গা-মাথা মুছে নিয়ে দরজার চাবিটা খুলে দিয়ে ঢোলা একটা জামা পরে গিয়ে বসল ব্যালকনির বাস্কেট চেয়ারে। লনের দিকে চেয়ে চেয়ে গোটা পাঁচেক সিগারেট ধ্বংস করল সে, আর চিন্তা করল। কুকুর দুটোকে দেখতে পেল সে, খশখশে ঘাসের উপর লম্বা পা ফেলে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে সারাটা ময়দান।

ধীরে ধীরে কমে এল সূর্যের আলো। ঘন জঙ্গলের দিক থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আঁধার গা-ছমছম রহস্য নিয়ে। চারদিক বেশ খানিকটা অন্ধকার হতে আরম্ভ করতেই উঠে পড়ল রানা। ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে। ঘরে এসে জামাকাপড় পরে নিল সে। ঠিক যখন টাইয়ের নট লাগাচ্ছে, এমনি সময়ে দড়াম করে খুলে গেল কপাট, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল শিখা। ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর চোখ। মুখটা ফ্যাকাসে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর।

'ওকে থামাও!' চেঁচিয়ে উঠল শিখা। দৌড়ে এসে খামচে ধরল সে রানার কোটের হাতা। 'পালাবার চেষ্টা করছে। আটকাও ওকে, নইলে মারা পড়বে!'

মুহূর্তে সজাগ সচেতন হয়ে গেল রানা।

'কোথায় ও?'

'ব্যালকনি থেকে একটা পাইপ বেয়ে নামছে! কথা শুনল না কিছুতেই···'

একলাফে ব্যালকনিতে চলে এল রানা। রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকেই দেখতে পেল সে নেবরকে। মধ্যযুগীয় একটা কুঠার দাঁতে কামড়ে ধরে সড় সড় করে নেমে যাচ্ছে নিচে. কয়েক ফুট বাকি থাকতে লাফিয়ে নিচে নামল। কুঠারটা হাতে নিয়ে চাইল এদিক ওদিক।

'নেবর!' চাপা গলায় ডাকল রানা। 'বোকামি করছেন। উঠে আসুন!'

উপর দিকে চাইল নেবর। পরিষ্কার দেখতে না পেলেও রানা এবং শিখার ছায়া দেখতে পেল সে ব্যালকনিতে। মাথা নেড়ে দৌড়াতে শুরু করল। ধুপধাপ পায়ের আওয়াজটা মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, অন্ধকারে আবছা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা।

হঠাৎ দপ করে সার্চলাইট জ্বলে উঠল দুর্গের চূড়ায়। তীব্র এক ঝলক আলো। তিন সেকেণ্ডেই নেবরকে খুঁজে বের করল আলোটা। কুঠার হাতে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে জঙ্গলের দিকে। ওরচেয়ে পাঁচগুণ বড় ওর বিকট ছায়া ক্যারিক্যাচারের ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছে আগে আগে। একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর দেখা গেল। সারা গায়ে ঢেউ তুলে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে. দ্রুত। হয়তো কুকুরের নিঃশ্বাসের শব্দ টের পেল. থমকে দাঁড়াল নেবর. রুখে দাঁড়াল কুঠার হাতে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত লাফ দিল বিশাল কুকুরটা। সাথে সাথেই তীব্র আলোয় ঝিক করে উঠল কুঠারের ফলা ভেজা নরম কাঠে কুঠার চালালে যে রকম আওয়াজ হয় সেই রকম একটা শব্দ হলো। কপাল ভেদ করে ঢুকে গেছে কুঠার। হ্যাঁচকা টানে ওটা খসিয়ে নিয়ে আবার ছুটল নেবর। এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে এবার। সার্চলাইটের আলোটাও দুলছে ওর সাথে সাথে। দ্বিতীয় কুকুরটাকে দেখতে পেল রানা। নেবরের ঠিক পিছনেই। তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে ঝাঁপ দিল। ঝট করে এক পাশে সরেই থমকে দাঁড়াল নেবর। উড়ন্ত অবস্থায় ওর পাশ কেটে সামনে গিয়ে পড়ল কুকুরটা. ঘুরে দাঁড়িয়েই ঝাঁপ দিল আবার। প্রস্তুত ছিল. সাঁই করে কুঠার চালাল নেবর। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠল কুকুরটা. একটা পা ঝুলে পড়েছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ঘাসের উপর।

ফুঁপিয়ে উঠল শিখা। দুই হাতে চোখ ঢাকল। রেলিং ধরে আরও একটু সামনে ঝুঁকল রানা।

রক্তাক্ত কুঠার হাতে হঠাৎ বামদিকে দৌড়াতে শুরু করল নেবর। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হারিয়ে গেল সে অন্ধকারে, তারপর আবার খুঁজে বের করল ওকে সার্চলাইট। অত্যন্ত দ্রুত দৌড়াচ্ছে সে জঙ্গলের দিকে। প্রায় পৌঁছে গেছে। আর মাত্র দশ-পনেরো ফুট। ঠিক এমনি সময়ে 'টাঁশ্‌শ্‌' করে শব্দ হলো গুলির। রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার কয়েক হাত উপরে। পয়েন্ট টুটু—চিনতে পারল রানা।

রানার মাথার কয়েক হাত উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাক ডজ। হাসিমুখে কাঁধ

থেকে নামাল রাইফেলটা। ঠিক একটা গুলি খাওয়া খরগোশের মত লাফিয়ে উঠল নেবর শূন্যে। খুলি ফুটো করে সোজা ব্রেনে গিয়ে ঢুকেছে গুলিটা। চলন্ত টার্গেট, শুধু নড়ে যাচ্ছে তাই নয়, বামদিকেও সরছে, তার উপর দূরে সরে যাওয়ায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না—এত অসুবিধে সত্ত্বেও ঠিক জায়গামত গুলিটা ঢুকাতে পেরে যার-পর-নাই খুশি হয়েছে সে নিজের উপর। গত পাঁচ বছরে এমন একটা কঠিন শট নেয়ার সুযোগ পায়নি সে। বেস্ট শট!—ভাবল সে মনে মনে। রাইফেলের বাঁটে আদর করে চাপড় দিল দুটো।

গুলির শব্দ কানে আসবার প্রায় তিন সেকেণ্ড পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নেবরকে চার হাত-পা ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে দেখে ককিয়ে কেঁদে উঠল শিখা। সার্চলাইট স্থির হয়ে রয়েছে লাশের উপর। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে শিখা সেদিকে। রানা ঘরের দিকে রওনা হতেই খামচে ধরল সে কোটের হাতা।

'মেরে ফেলল!' শিখার দুই চোখে অবিশ্বাস। 'মানা করেছিলাম, তোমার কথা বললাম, শুনল না। এত করে…'

শিখার কথা শুনবার জন্যে অপেক্ষা না করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একলাফে ফিরে এল রানা ঘরে। একটানে সুটকেসটা বিছানার উপর তুলে ডালা খুলে উপুড় করল। স্প্রিঙে চাপ দিতেই খুলে গেল তলাটা। দ্রুতহাতে পিস্তলটা তুলে নিয়ে কোটের ডান পকেটে ভরল সে, দুটো গুলিভর্তি স্পেয়ার ম্যাগাজিন রাখল বামদিকের কোট ও প্যান্টের পকেটে। খাপসহ ছোরাটা বেঁধে নিল বাম বাহুতে। টিয়ারগ্যাস বম্বটা হয়তো দরকার পড়বে না, তবু পকেটে পুরল সাইলেন্সারটাও। তারপর চার ইঞ্চি লম্বা, দেখতে ছোট, কিন্তু অত্যন্ত জোরাল একটা বারো ভোল্টের টর্চ হাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডাকল শিখাকে।

'এদিকে এসো, জলদি!'

ব্যালকনি থেকে নড়তে পারছিল না শিখা, মোহাবিষ্টের মত চেয়ে ছিল লাশটার দিকে, রানার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে চলে এল ঘরে। ওর ছাই বর্ণ চেহারা আর শরীরের কাঁপুনি দেখে প্রমাদ গুণল রানা। মহা বিপদ হবে এখন একে নিয়ে। ত্রস্তহাতে জিনিসপত্রগুলো সুটকেসে ভরে ওটা নামিয়ে রাখল যথাস্থানে।

'এখন ভয় পেলে চলবে না, শিখা। শক্ত রাখো নিজেকে। আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রত্যেক সেকেণ্ডের দাম লাখ টাকা। পাসপোর্ট কোথায় তোমার?'

'পাসপোর্ট?'

'হ্যাঁ। পাসপোর্ট। কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

'এক্ষুণি নিয়ে এসো ওটা। জলদি!'

'উইলিকে মেরে ফেলল ওরা! আমাদের…'

'আমাদেরও মারবে, যদি জলদি না করো! ঘরে গিয়ে পাসপোর্টটা নিয়ে এসো।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে দৌড় দিল শিখা। ব্যালকনিতে গিয়ে চারপাশটা আর একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল শিখার দরজার সামনে। দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে ঘরে ঢুকল। দেখল ধস্তাধস্তি করছে শিখা, পিছন থেকে ওর মুখ চেপে ধরে আছে একজন তাগড়া চেহারার লোক।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। রানাকে দেখেই ছেড়ে দিল লোকটা শিখাকে, কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার আগেই পৌঁছে গেল রানা। দড়াম করে পেটে এক ঘুসি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল লোকটা সামনের দিকে, চিবুকে প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে বাঁকা হলো এবার পিছন দিকে। ধাঁই করে ঘাড়ের পাশে এক কারাতের কোপ খেয়ে পা ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

রানার এই প্রচণ্ড মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছে শিখা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে।

'পাসপোর্ট কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওই...ওই হ্যাণ্ড ব্যাগে।'

বিছানার উপর থেকে হ্যাণ্ড ব্যাগটা তুলে ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখল রানা, পাসপোর্টটা আছে দেখে মুখ বন্ধ করে দিল ওটা শিখার হাতে, খপ করে বাম হাতের কব্জি চেপে ধরে নিয়ে এল দরজার কাছে।

দরজাটা খুলতে গিয়েও চট করে ভিড়িয়ে দিল রানা আবার। সামান্য একটু ফাঁক রাখল কেবল। তিনজন বডিবিল্ডার পা টিপে এগিয়ে আসছে করিডর ধরে। পিস্তলটা বেরিয়ে এল রানার হাতে। দড়াম করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ওরা রানার ঘরে। কপাট খুলে একটানে বের করে আনল রানা শিখাকে করিডরে।

'চুপ! একফোঁটা শব্দ করবে না!'

নিঃশব্দ পায়ে ছুটল ওরা সিঁড়িঘরের দিকে। নিচে নামার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল শিখা, হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল রানা ওকে উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে। দ্রুতপায়ে উঠে গেল ওরা কয়েক ধাপ, একটু থেমে রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে করিডরের দিকে চাইল রানা। ওর ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল একজন। আবার উঠতে শুরু করল ওরা। তেতালায় উঠেও থামল না, দৌড়ে উঠে গেল চারতলায়। আবার নিচের দিকে চাইল রানা। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। চিৎকার করে নিচের কাউকে বলল, 'কেউ নেই ঘরে!'

ঠিক এমনি সময়ে বাজতে শুরু করল পাগলাঘন্টি।

শিখার কব্জি ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা চারতলার করিডর ধরে ডানদিকে।

ষোল

ওবারমিটেন দুর্গে ঢোকার বিশাল গেটের কাছাকাছিই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেড। পিছনের বনেট হাঁ করে রয়েছে ব্যাঙের মুখের মত। নিষ্ঠুর চেহারার একহারা এক লোক একমনে কাজ করছে এঞ্জিনে রাস্তার পাশেই ঘাসের উপর বিশাল স্ফিংসের মত বসে আছে এক প্রকাণ্ড চেহারার লোক। আপন মনে সিগারেট ফুঁকছে আর বিরক্ত ভঙ্গিতে চাইছে মেরামতরত লোকটার দিকে।

মাঝে মাঝে এক-আধটা গাড়ি আসছে, সাঁই করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে গারমিশখ কিংবা মিউনিখের রাস্তা ধরে। থেমে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করবার সময় নেই কারও, সবাই ব্যস্ত: ভাবটা—*ওই ফুল ফোটে বনে, যাই মধু আহরণে, দাঁড়াবার সময় তো নাই।* পড়ন্ত বিকেল। রাস্তার পাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাতার ফাঁক গলে ঢলে পড়া সূর্যের রশ্মি এসে পড়ছে গাড়ির কাঁচে। গলা ছেড়ে ডাকছে গোটা কয়েক ঝিঁঝি।

ইঞ্জিনের ঢাকনা নামিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সিকান্দার বিল্লাহ। ক্যাও-অ্যাও-অ্যাও আওয়াজ করল, কিন্তু স্টার্ট নিল না গাড়ি আবার নেমে গিয়ে বনেট তুলল সে।

'আর কতক্ষণ চলবে এরকম, বস্?' নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল বিল্লাহ।

'ফের শুরুসে,' হুকুম করল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার।

সপ্তমবারের মত একে একে সবক'টা প্লাগ খুলে পরিষ্কার করায় মন দিল সিকান্দার বিল্লাহ। যদিও কেউ লক্ষ করছে না ওদের, তবু কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক করতে চায় না ব্রিগেডিয়ার কারও মনে। গাড়ি খারাপ হলে যেকোন লোক যেকোন রাস্তায় মেরামতের চেষ্টায় প্রাণপাত করতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

এইভাবে চলতে থাকল বিকেল চারটে পর্যন্ত। প্লাগগুলো একবার খোলে, একবার লাগায়, তারগুলো ছুটিয়ে রেখে স্টার্ট দেয়, আবার হতাশ ভঙ্গিতে নেমে গিয়ে কাজ শুরু করে। ঠিক চারটের সময় ঘড়ঘড় শব্দে খুলতে শুরু করল দুর্গের গেট। পুরোটা খোলার আগেই লাল একটা হোণ্ডা স্পোর্টস গাড়ি বেরিয়ে এল বাইরের রাস্তায়, ডানদিকে ঘুরে চলতে শুরু করল দ্রুতবেগে।

দ্রুত চিন্তা চালু হয়ে গেল তারিক আখতারের মাথায়। নেবরের গাড়ি, কিন্তু নেবর বা শিখা শংকর কেউ নেই গাড়িতে। মোটা এক লালচুলো বেঁটে লোক বসে আছে ড্রাইভিং সীটে। এর অর্থ কি?

'বিল্লাহ!' মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল সে। 'যাও, ফলো করো।'

'আর আপনি, স্যার?' ঝটাং করে বনেট নামিয়ে একলাফে উঠে বসল সে ড্রাইভিং সীটে। চাবি ঘোরাতেই চালু হয়ে গেল এঞ্জিন।

'আমার কথা তোমার ভাবতে হবে না,' বলল তারিক আখতার। 'গাড়িটা কোথায় যায় দেখো, তারপর সোবহানকে খবরটা দিয়ে অপেক্ষা করবে ওর ওখানেই। পরে যোগাযোগ করব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ। মুচকি হাসল তারিক আখতার। আসলে খানিক বাদে ও যা করতে যাচ্ছে তার কোন সাক্ষী রাখতে চায় না। ওই গাড়িটাকে অনুসরণ করে নতুন কিছুই জানতে পারবে না বিল্লাহ। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। একটু পরেই যে রানার ভাড়া করা কালো মার্সিডিজটা বেরিয়ে আসবে সে ব্যাপারেও কোনই সন্দেহ নেই তার।

জঙ্গলের ভিতর বেশ কিছুদূর সরে এল তারিক আখতার। একটা বড়সড় ঝোপের আড়ালে বসে নজর রাখল গেটের দিকে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর কালো মার্সিডিজটা বেরিয়ে এল বাইরে। বামদিকে ঘুরে চলে গেল গারমিশখের রাস্তায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোক বসে আছে ড্রাইভিং সীটে।

ছোট্ট করে শিস দিল তারিক আখতার দেখল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেট।

সাদা মার্সিডিজটাকে আলপেনহফ হোটেলের সামনে দেখে চিনতে পেরেছিল সে নাম্বারপ্লেটের উপর নজর বুলিয়েই। ওই গাড়িটাই এয়ারপোর্ট থেকে এক চোখ কানা লোকটাকে তুলেছিল। একই গাড়ি ওবারমিটের দুর্গ থেকে এসেছে রানাদেরকে নিয়ে যেতে। গাড়িটা যদি গুস্তারের হয়…মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকের মত চিনে ফেলল সে কানা লোকটাকে। জ্যাক ডজ! রুডলফ গুস্তারের অ্যাসাসিনেটর! সাদা গাড়ির পিছু পিছু মাসুদ রানা, উইলিয়াম নেবর আর শিখা শংকরকে রওনা হয়ে যেতে দেখেই বুঝে নিয়েছে সে, অজান্তে বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছে ওরা।

হাতের তালু দিয়ে চোয়াল ঘষল সে কিছুক্ষণ। কোন সন্দেহ নেই আর। ফাঁদেই পা দিয়েছে ওরা। গাড়িগুলো এদিক ওদিক পাঠিয়ে দেয়ার মানে শুরু হয়ে গেছে খুনের প্রস্তুতিপর্ব, প্রথম ধাপ।

আর একটা সিগারেট ধরাল তারিক আখতার। আপাতত করবার কিছুই নেই ওর। সন্ধে না লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তার। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইল সে—ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

দুই ঘন্টা পর চারপাশটা একটু আঁধার হয়ে আসছে দেখে উঠে পড়ল তারিক আখতার। ভাল করেই জানে সে, এখন যা করতে যাচ্ছে সেটা ওর মত একজন উচ্চপদস্থ লোকের সাজে না। বেশ কয়েক বছর ধরে সক্রিয় কর্মক্ষেত্র ছেড়ে প্ল্যানিঙে সরে গেছে সে। অ্যাকটিভ ফিল্ডে এই অনভ্যাস কতটা বাধার সৃষ্টি করবে ভেবে দেখবার সময় বা উপায় নেই ওর এখন। রানা আছে ওই দুর্গের ভিতর,

কাজেই ওকে ঢুকতেই হবে ওখানে। ও যা করতে যাচ্ছে সেটা আর কাউকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়—এমন কি সিকান্দার বিল্লাকে দিয়েও নয়। নিজেরই যেতে হবে। বিশ ফুট উঁচু বিশাল দেয়ালের গা ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল সে।

গেট থেকে শ'পাঁচেক গজ দূরে এসে থামল তারিক আখতার। এদিক ওদিক চাইল। তারপর পকেট থেকে একগাছা সরু নাইলন কর্ড বের করল। কর্ডের একমাথায় বাঁধা রয়েছে একটা রাবার মোড়া হুক। দেয়ালের মাথায় বসানো তীক্ষ্ণ স্পাইক লক্ষ্য করে হুকটা ছুঁড়ল সে উপর দিকে। তৃতীয় চেষ্টাতেই আটকে গেল হুক একটা স্পাইকের গায়ে। রশি ধরে টেনে দেখল সে কতখানি শক্তভাবে আটকেছে হুকটা। নিশ্চিন্ত হয়ে চাইল চারপাশে। এদিক ওদিক কোনদিকেই গাড়িঘোড়ার চিহ্ন না দেখে রশিটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দেয়ালের গায়ে হেঁটে উপরে উঠতে আরম্ভ করল। শরীরের ভার কিছুটা পড়ছে পায়ের উপর, কিন্তু বেশির ভাগটাই পড়ছে হাতের উপর। সরু রশিটা কেটে বসে যেতে চাইছে হাতের তালুতে, দাঁতে দাঁত চেপে পায়ে পায়ে উঠে এল সে উপরে। মাথাটা সামান্য উঁচু করে দেখল খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছেড়েই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। চোখা শিক টপকে কাঁটাতারের বেড়া গলে এপারে চলে এল তারিক আখতার, নিচটা একবার দেখে নিয়ে হুক খুলে লাফিয়ে নামল ঘাসের উপর।

নাইলনের কর্ডটা গোছাতে গোছাতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে চাইল সে। কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। শোলডার হোলস্টার থেকে বের করল একটা নাইন এম. এম. লুগার, কোটের গোপন এক পকেট থেকে একখানা সাইলেন্সার বের করে লাগাল সেটা পিস্তলের মুখে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। তারপর ছায়ার মত এগোল জঙ্গলের দিকে।

অতি সাবধানে নিঃশব্দ পায়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে এল সে গেটের পাশে সশস্ত্র গার্ডের ঘরের কাছে। চারিটা পাশ ভাল করে দেখে নিয়ে এগোল দুর্গের দিকে। জঙ্গল পেরিয়ে যখন সে ফাঁকা জায়গার কাছে পড়ল, তখন বেশ আঁধার হয়ে এসেছে চারপাশ। এখানে ওখানে ফুলের কেয়ারি করা বিস্তীর্ণ পার্কের কিনারায় একটা পাম গাছের নিচে থেমে দাঁড়াল তারিক আখতার। দুর্গটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চোখদুটো ছোট হয়ে গেল ওর। একটা লোক এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। উইলিয়াম নেবর। শিখা শংকরকেও দেখা গেল কয়েক সেকেণ্ড, কিন্তু এক ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে ভিতরের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে রেলিং টপকে একটা পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করল নেবর। একটু পরেই আরেকটা ব্যালকনিতে রানা এবং তার পাশে মেয়েটাকে দেখা গেল। রেলিংের উপর দিয়ে ঝুঁকে কি যেন বলল রানা নেবরকে। কয়েক ফুট বাকি থাকতে লাফিয়ে নিচে নামল নেবর, হাতে কুঠার, ঝেড়ে দৌড় লাগাল মাঠের মধ্যে দিয়ে।

হঠাৎ জ্বলে উঠল সার্চ লাইট। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন নেবরকে। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে।

অ্যালসেশিয়ান কুকুরের সাথে ওর কুঠার যুদ্ধ দেখে মুচকি হাসল তারিক আখতার। পরমুহূর্তে সোজা দৌড়ে ওর দিকে আসতে শুরু করল নেবর। একটু বাঁয়ে কেটে ছোটায় লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা করল সে মনে মনে। এইভাবে দৌড়ালে পিছন থেকে গুলি করে ওকে ধরাশায়ী করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তুমুল বেগে দৌড়াচ্ছে নেবর, হঠাৎ লাফিয়ে শূন্যে উঠল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, এমনি সময় গুলির শব্দ পৌছল এসে। ধড়াস করে পড়ল লোকটা। তারিক বুঝল, পা পিছলে আছাড় খায়নি, মারা গেছে উইলিয়াম নেবর। মনে মনে জ্যাক ডজকে বাহবা দিল সে। এতদূর থেকে এক গুলিতে ছুটন্ত লক্ষ্য ভেদ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারিক আখতার। বুঝতে পারল, গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, এইবার আক্রমণ শুরু হবে রানার উপর। পারবে রানা বাধা দিতে? অস্ত্র আছে ওর কাছে? কোন দিক থেকে কিভাবে দুর্গে ঢোকা যায় ভাবছে তারিক, দেখল দুর্গের দিক থেকে এগিয়ে আসছে তিনজন লোক। একটু ভিতর দিকে সরে গেল সে। লাশটা তুলে নিয়ে ফিরে গেল লোকগুলো।

জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাক ডজ আর ফন কীসলার তেতলার ব্যালকনিতে। ফন কীসলারের হাতে একটা মাইক্রোফোন। নিচুগলায়, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলছে সে মাইকটা মুখের কাছে ধরে। জঙ্গলের এখানে ওখানে আর দেয়ালের গায়ে বসানো অনেকগুলো স্পীকারে ধ্বনিত হচ্ছে কথাগুলো।

'কোন লাভ নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। এখান থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই। দেয়ালের কাছে দয়া করে ভুলেও যাবেন না। নয়শো ভোল্টের কারেন্ট চালু করে দেয়া হয়েছে। দেয়াল ডিঙাবার চেষ্টা করলেই মারা পড়বেন। ফিরে আসুন। মিস্টার নেবরের জখম খুব বেশি না, সেরে উঠবেন দু'দিনেই। আপনাদেরকে কেউ কিছু বলবে না। দয়া করে ফিরে আসুন।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে নড়ে উঠল ডজ এসব শুনে।

'বেরোতে পারবে না, আপনি শিওর?'

সুইচ টিপে মাইক্রোফোনটা অফ করে দিয়ে মাথা নাড়ল ফন কীসলার গর্বের সাথে।

'অসম্ভব। কেবল ওরা বলে নয়, কারও পক্ষেই এখন আর এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দেয়ালের উপর তার, লোহার গেট, সব এখন ইলেকট্রিফায়েড। তবে খুঁজে বের করতে একটু সময় নেবে, এই যা। আরও কুকুর থাকলে তাড়াতাড়িই চুকে যেত সব, কিন্তু কুকুর ছাড়া...'

'যোগাড় করা যাবে না?'

মাথা নাড়ল ফন কীসলার।

'ওগুলোকে স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল মানুষ খুঁজে বের করবার ব্যাপারে। আশেপাশে কারও কাছে হয়তো কুকুর পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কাজের হবে না

সেসব। তাছাড়া কেন চাইছি তার জবাবদিহি করতে হবে। কাল দিনের বেলায় চারপাশ থেকে ঢুকব আমরা জঙ্গলে। মেয়েমানুষ রয়েছে ওর সাথে...আমার মনে হয় খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। রাতের অন্ধকারে যে পালিয়ে যেতে পারবে না, সে ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'কিন্তু যদি দেয়াল টপকাবার চেষ্টা করে...' কথাটা শেষ না করেই মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল সে, আবার নিচু গলায় বোঝাবার চেষ্টা করল রানাকে যে দেয়ালের কাছে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক, দুর্গে ফিরে আসা উচিত ওর এখন।

জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে সব শুনল তারিক আখতার। ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

ফন কীসলারের ঠিক মাথার উপর, চারতলার অন্ধকার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পিস্তলের মুখে সাইলেন্সার লাগাতে লাগাতে সব শুনল মাসুদ রানা। বুঝতে পারল, ওরা মনে করেছে শিখাকে নিয়ে ও এখন জঙ্গলে। মৃদু হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে। নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ফিরে এসে ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজা লাগিয়ে টর্চ জ্বালল। ফার্নিচার ঠাসা বিশাল এক ঘর এটা। কোনকিছুতে ঠোকর না খেয়ে সাবধানে ফিরে এল সে শিখার পাশে।

'যা ভেবেছিলাম, তাই,' বলল সে চাপা গলায়। 'ওরা মনে করেছে, আমরা পালিয়ে চলে গেছি জঙ্গলে।' বামহাতে শিখাকে জড়িয়ে ধরে ঠেকি দেয়া আসবাব থেকে গা বাঁচিয়ে এগোল রানা দরজার দিকে। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে আস্তে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল, কান পেতে শুনল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর টর্চের আলো ফেলল পাশের ঘরে। মাঝারি আকৃতির ঘর, খাট পাতা রয়েছে একপাশে। হাত ধরে টানল শিখাকে। 'চলো, এই ঘরে খানিক বিশ্রাম নেয়া যাক।'

দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে শিখার। কাঁপছে সর্বাঙ্গ। রানার পিছু পিছু এসে বসল খাটের কিনারে। এক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে কম্পিত হাতে রানার হাত ধরল।

'এবার কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ঠিকই বলেছিলে তুমি, রানা। ধরতে পারলেই খুন করবে ওরা আমাদেরকে।'

'খুন করতে হলে আগে ধরতে হবে,' বলল রানা। 'কাল সকালের আগে খোঁজাখুঁজি শুরুই করবে না ওরা। খুব সম্ভব জঙ্গলে খুঁজবে ওরা প্রথম। ওখানে না পেলে তখন ওদের খেয়াল হবে যে দুর্গের মধ্যেই রয়ে যেতে পারি আমরা। ওরা যখন বাইরে যাবে, এক ফাঁকে নিচে নেমে যাব আমি, ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে একটা টেলিফোন করব, খবরটা জানিয়ে দিয়ে চেষ্টা করব কিছু খাবার জোগাড় করে আনতে। ততক্ষণ পানি খেয়ে থাকতে হবে। পারবে না?'

'ইণ্ডিয়ান এমব্যাসি!' অবাক হলো শিখা। 'পুলিসে ফোন না করে এমব্যাসিতে কেন? তাছাড়া ওদের জানালেই ওরা কোন ব্যবস্থা করবে তার কি নিশ্চয়তা?'

'করবে না মানে?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। 'যেই মুহূর্তে জানবে শংকরলালজীর মেয়ে আটকা পড়েছে ওবারসিটেন দুর্গে, তাঁর জীবন

বিপন্ন, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে না ওরা! সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে, বাবা, সোজা কথা? এমন ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে যে আধঘণ্টার মধ্যে যদি এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার এসে হাজির না হয়, আমার নাম পাল্টে রাখব। বেলা দশটা নাগাদ হাতকড়া লাগানো কাউন্টকে টাটা করে উঠে বসব আমরা হেলিকপ্টারে। পুলিসে ফোন করে কোন লাভ নেই, পাগলের প্রলাপ বলে হেসেই উড়িয়ে দেবে ওরা ব্যাপারটা। হয়তো দেখা যাবে কাউন্টের কাছ থেকে আগেই টাকা খেয়ে বসে আছে পুলিস ইন্সপেক্টর। হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।'

'না!' রানার হাত চেপে ধরল শিখা। 'অসম্ভব! শংকরলালজীর মেয়ে হিসেবে কোন সুযোগ আদায় করতে রাজি নই আমি। আমার যা হয় হোক, বাবার কলুষিত নাম ব্যবহার করব না কিছুতেই।'

মনে মনে খুশি হলো রানা, কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে হতাশ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সে, 'কথাটা বুঝে বলছ?'

'নিশ্চয়ই! কিছুতেই আমি···'

'হয়েছে, হয়েছে···থাক···উত্তেজিত হওয়ার কিছুই নেই। বুঝতে পেরেছি। তাহলে তুমি চাও না আমি ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে ফোন করি? ওদের সাহায্যে···'

'না!'

চুকচুক করে শব্দ করল রানা জিভ দিয়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আবার।

'কি আর করা,' বলল সে। 'তুমি রাজি হলে বেশ মজা দেখা যেত কাল সকালে। দশ-বারোটা হেলিকপ্টার নামত ওই সামনের মাঠে, কাঁপুনি উঠে যেত ফন কীসলারের বুকের ভিতর, মুরগির বাচ্চার মত চারদিকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করত ওর বডি বিল্ডাররা। যাই হোক, যা হবার নয় তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তোমার সোজা পথ বাতলে দিচ্ছি: নিচে গিয়ে খুঁজে বের করো কাউন্টকে। ওকে বলো, তোমার বাবার প্রভাব বা প্রতিপত্তি ব্যবহারে তোমার ঘোর আপত্তি আছে, কাজেই আত্মসমর্পণ করবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি—যদি কিছু মনে না করে, তাহলে যেন দয়া করে জবাইয়ের কাজটা আজই সেরে ফেলে তোমাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে দেয়।'

কয়েক সেকেণ্ড কোন কথা বলল না শিখা। তারপর রাগের ঠেলায় কিল মারল নিজের হাতের তালুতে।

'আশ্চর্য জানোয়ার তুমি! অসহ্য! বাবাকে আমি কী পরিমাণ ঘৃণা করি তা যদি বুঝতে পারতে···'

রানা বুঝল, আতঙ্কটা চলে গেছে আপাতত শিখার মধ্যে থেকে, এখন কিছু কাজের কথা সেরে নেয়া দরকার। বলল, 'খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তোমার অসুবিধেটা কোথায় তাও আমার জানা আছে। দেহে-গতরে বেড়ে গেছ, বুদ্ধিটা

শরী:রের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। যাই হোক, বাজে সময় নষ্ট করছি আমরা। তুমি কিছুতেই এমব্যাসির সাহায্য নেবে না···ঠিক তো?'

'তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল!'

'বেশ। যেটা ভাল সেটাই করবে তুমি, বাধা দিতে যাব না। বরং ঘাড় থেকে বোঝা নেমে যাওয়ায় যার-পর-নাই খুশি হব। ঠিক আছে, চলি তাহলে। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি ধরা না দিয়ে এখানেই বসে থাকতে পারো তুমি যতক্ষণ না ওরা নিজেরা এসে ধরে। এখান থেকে বেরোবার জন্যে আমার নিজের কোন এমব্যাসিরই সাহায্যের দরকার নেই। একা মানুষ, ফুড়ুত করে বেরিয়ে যাব—কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান যখন এতই টনটনে, ওটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে টাইট হয়ে বসে থাকো এখানটায়। চলি··· তোমার কথা অনেকদিন মনে থাকবে আমার, বিশেষ করে গতরাতের বেড-ফাইটিংটা।'

রানা উঠে দাঁড়াতেই খপ করে খামচে ধরল শিখা ওর কোটের হাতা।

'আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি, না বলে আমি বলব, যেতে হচ্ছে। তোমার জন্যে আমি অনর্থক প্রাণ দিতে যাব কেন? কেটে পড়ার জন্যে আমাকে দশটা মিনিট সময় দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে দেখা করো কাউন্টের সাথে···বলা যায় না, তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়ে ও হয়তো তোমাকে বিয়েও করে ফেলতে পারে। তবে আমার ধারণা, তার চেয়ে তোমাকে জবাই করে ফেলাটাই তার জন্যে সহজ এবং উচিত কাজ হবে।'

'আশ্চর্য নীচ লোক তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শিখা। ঝট করে উঠে দাঁড়াল; 'আমাকে রেখে চলে যাচ্ছ কি করে!'

'খুব ভয় লাগছে বুঝি?' হাসল রানা। 'তোমার বাবার নামের সুযোগ নিতে বাধছে, তার নিযুক্ত লোকের সাহায্য চাইতে বাধছে না?'

'না, বাধছে না। তুমি বলেছ, বাবাকে পছন্দ করো না তুমিও।' ফুঁসে উঠল শিখা। 'বলোনি?'

'এ-ও তো বলেছি, তোমাকেও পছন্দ করি না আমি। বলিনি?' আবার বসে পড়ল রানা খাটের কিনারে। শিখাকেও বসাল হাত ধরে টেনে। 'আর একটা বিকল্প হঠাৎ মাথায় এল। এক কাজ করা যায়—ইচ্ছে করলে আমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে পারো তুমি। ইণ্ডিয়ান এমব্যাসির সাহায্য ছাড়াই তোমাকে নিয়ে এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যেতে পারব হয়তো আমি। কিন্তু তার জন্যে আগে একটা চুক্তিতে আসতে হবে আমাদের।'

'কি বলতে চাও তুমি? কিসের চুক্তি?'

'বিনিময়ে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কোনদিন আর কাউকে ব্ল্যাকমেইল করবে না, জীবনে কোনদিন আর একটাও নোংরা ছবি তুলবে না, আর এখান থেকে বেরোবার ঠিক ছয়মাসের মধ্যে মনের মত একটা ছোকরা ধরে বিয়ে

করে সংসারী হবে।'

ঘাড় কাৎ করে লম্বা, কাঁপা শ্বাস টানল শিখা।

'সত্যিই তাহলে তুমি বাবার হয়ে কাজ করছ!'

'না...নিজের হয়ে কাজ করছি আসলে এখন। আমি তোমার বাবার লোক নই। আমি বাংলাদেশের লোক। টাকার জরুরী দরকার পড়ায় হাতে নিয়েছিলাম এই কাজ। ওই লোকটাকে মোটেই পছন্দ করি না আমি, কিন্তু কাজটা যখন হাতে নিয়েছি, টাকা যখন অ্যাডভান্স নিয়েছি, করব আমি। যদি প্রতিজ্ঞা করো, সাহায্য করব আমি, যদি না করো, চলে যাব তোমাকে ফেলে।'

'আমাকে ফেলে রেখে গেলে তোমার কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে না?'

'না।'

'আমাকে যদি ওরা মেরে ফেলে তবু তুমি টাকা পাবে? মানে, তবু তোমার কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করবে বাবা?'

'করবে। ফিল্ম তিনটে ফেরত নিয়ে গেলেই টাকা পাব আমি। এখান থেকে বেরিয়ে গেলেও যেমন ভাবে পারি ওগুলো উদ্ধার আমি করবই। তোমার কথাটা বুঝতে পারছি আমি। তুমি ভাবছ কাজ যখন হাতে নিয়েছি, তোমাকে উদ্ধার করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। তুমি জানো না, আমিও জানতাম না আগে, আসলে তোমার বাবা তোমাকে হত্যার অনুমতি দিয়েছে রুডল্‌ফ গুস্থারকে। আমি দুঃখিত, কথাটা অত্যন্ত রূঢ়, অত্যন্ত দুঃখজনক—কিন্তু বাস্তব সত্য। গুস্থারের সাথে তার স্বার্থের সম্পর্ক রয়েছে, যাতে তুমি এই দুজনের কারও কোনরকম স্বার্থহানি ঘটাতে না পারো, ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন গোলমাল পাকিয়ে তুলতে না পারো, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের পথে কোনরকম বাধা সৃষ্টি না করতে পারো, সেজন্যে তোমাকে একেবারে শেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। খুবসম্ভব আমাকে কাজে লাগাবার পর এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি আমি ব্যাপারটা আগে। যাই হোক, যদি তাই হয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবেই আমি চাইব সেটা বানচাল করে দিতে। বাপ তার নিজের মেয়েকে খুন করবার অনুমতি দিয়ে সারাজীবন গুমরে গুমরে কাঁদবে, আর পস্তাবে, তার চাইতে আমার মনে হয়, তুমি যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আর কোনদিন ওসব করবে না, আর আমি যদি নিজ দায়িত্বে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তোমার বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাই—সেটাই সবদিক থেকে ভাল হয়। এখন তোমার যা খুশি। সত্যি বলতে কি, তোমার বা তোমার বাবার ভালমন্দে আমার খুব বেশি কিছু এসে যায় না। তুমি যদি মনে করো আমার সাহায্য ছাড়াই এখান থেকে বেরিয়ে প্যারিসে ফিরে নীলছবি তৈরি করবে, করো, যত খুশি।'

এতগুলো কথা বলল রানা শিখার নির্মম সত্যের উপলব্ধিটাকে কিছুটা নরম করে দেয়ার জন্যে। ওর বাবা ওকে খুন করতে চাইছে, এই নিষ্ঠুর সত্য ছুরির মত

বিঁধবার কথা ওর বুকে। বাবার প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা রয়েছে বলেই তার বিরুদ্ধে এত রাগ, এত অভিমান, এত ক্ষোভ; স্নেহের দাবি রয়েছে বলেই আজ পাকিয়ে উঠেছে এত সমস্যা। সব জেনে শিখার বুকটা ফাঁকা হয়ে যাবে,, জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাবে বুঝেই এত কথা দিয়ে ভুলাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু শাক দিয়ে আসলে মাছ ঢাকা গেল না।

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে রইল শিখা। চট করে একবার টর্চ জেলে দেখল রানা, দু'চোখ থেকে বৃষ্টির মত ঝরছে অঝোর ধারা। স্তম্ভিত, আত্মমগ্ন, বিমূঢ় হয়ে গেছে মেয়েটা কলজে-ফাটা সত্য টের পেয়ে। আর এক মিনিট সময় দিল রানা ওকে সামলে নেয়ার, তারপর নড়ে উঠল।

'কি ঠিক করলে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সহজ কণ্ঠে বলল শিখা, 'তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ।'

'তাতে অন্যায় তো কিছুই দেখি না,' বলল রানা। 'ব্ল্যাকমেইলারকে ব্ল্যাকমেইল করায় অন্যায় নেই।' উঠে দাঁড়াল। 'তুমি ভেবে দেখো আমি বাইরে একটু নজর বুলিয়ে আসছি।'

নিঃশব্দে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল সে।

মাঠময় ছোটাছুটি করছে সার্চলাইটের আলো। ইউনিফরম পরা একদল লোককে জঙ্গলের দিকে এগোতে দেখল রানা। বুঝতে পারল, মত পরিবর্তন করছে ফন কীসলার, কাল দিনের বেলা জঙ্গলে ঢোকার প্ল্যান পাল্টে রাতেই নেমে গেছে কাজে। আবার কানে গেল ওর লাউড স্পীকারের চাপা হুমকি। ফিরে আসবার অনুরোধ, গেট আর দেয়ালের ভয়ঙ্করত্বের বর্ণনা, সবশেষে নেবরের জখমের সামান্যতা ঘোষণা। ছেলেবেলায় পড়া সুকুমার রায়ের একটা ছড়ার কথা মনে পড়ল রানার—বিশাল এক তিন শিংওয়ালা দৈত্য তাড়া করছে ছাতা হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নরত এক নিরীহ বাঙালীকে, মুখে বলছে: ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না!

যতদূর চোখ যায় চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে লোকজনের সংখ্যা বোঝার চেষ্টা করল রানা। আলোটা এদিক ওদিক ঘুরছে বলে সঠিক কিছু অনুমান করা গেল না, মোটামুটি বুঝে নিল সে বিশ জনের বেশি লোক আছে এখানে। কুকুর দুটো শেষ করে দেয়ায় নেবরের আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সে।

যাই হোক, রাতের মধ্যেই ওরা জেনে যাবে যে জঙ্গলে নেই রানারা, কাজেই একটা কিছু বুদ্ধি বের করে নিতে হবে ওর এখন। একা হলে চিন্তা ছিল না। শিখা যদি প্রতিজ্ঞা করতে অস্বীকার করে—অবশ্য প্রতিজ্ঞা করেও সেটা ভঙ্গ করবে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়?—তবু ওকে ফেলে রেখে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধোঁকাতে কাজ হবে বলেই ওর বিশ্বাস। ফিরে এল সে ঘরের ভিতর। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো বন্ধ করে দিয়ে চলে এল খাটের পাশে।

'বলো, কি ঠিক করলে? আমি থাকব, না যাব?'

'আমি প্রতিজ্ঞা করলেই যে তুমি আমাকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করবে, তার কি নিশ্চয়তা?'

'আমি সাহায্য করলেই যে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে, তার কি নিশ্চয়তা?' মৃদু হেসে শিখার পাশে বসে পড়ল রানা।

'জীবনে কোন দিন কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি আমি। কথা দিলে কথা রেখেই আমি অভ্যস্ত। আমি বোকা হতে পারি, দুশ্চরিত্রা হতে পারি, ব্ল্যাকমেইলার হতে পারি, কিন্তু আমার কথার দাম আছে। খামোকা প্রতিজ্ঞা করে কি লাভ? তুমি সত্যিই পারবে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে?'

শিখার কাঁধে হাত রাখল রানা।

'কসম খেয়ে বলতে পারব না, শিখা। বাইরে বিশ-ত্রিশজন সশস্ত্র লোক দেখলাম। আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। কুকুর দুটো অবশ্য নেই, কিন্তু নিজেই তো দেখেছ, তেতলা দারুণ এক লক্ষ্যভেদী রয়েছে, এতদূর থেকেও সে এক গুলিতে খতম করতে পারে ছুটন্ত মানুষকে। তার ওপর রয়েছে দেয়ালের তার আর লোহার গেটের গায়ে নয়শো ভোল্টের ইলেকট্রিক কারেন্ট। কাউন্টের হাত ফসকে এখান থেকে বেরোনো সহজ হবে না। অনেক বাধা ডিঙাতে হবে আমাদের। কাজেই আমি বড়জোর কথা দিতে পারি, চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। আমি একা হলে সহজে বেরিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু সাথে তুমি থাকায় আমার কাজকর্ম মন্থর হয়ে যাচ্ছে, বহুগুণে কঠিন হয়ে পড়ছে কাজটা, কিন্তু তবু আমি বলব তোমাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এটুকুই কথা দিতে পারি, তোমাকে ছেড়ে একা পালাব না আমি। এর বেশি আর কি বলব, বলো? সবটা তো আর আমার একার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে না। কিন্তু তোমারটা করছে।'

'ঠিক আছে প্রতিজ্ঞা করছি আমি, যদি প্রাণ নিয়ে এই দুর্গ থেকে বেরোতে পারি তাহলে তোমার ওই তিনটে শর্ত পালন করব।' রানার হাতে মৃদু চাপ দিল শিখা। 'এছাড়া আমার অবশ্য আর কোন উপায়ও নেই, কিন্তু ঠিক সেই আলোকে দেখছি না আমি ব্যাপারটা। হঠাৎ আজ বুঝতে পেরেছি, আমি একা। একাই চলতে হবে আমার এই দুনিয়াতে। সত্যিই যদি আমি বাবাকে বা তার স্ত্রীকে কেয়ার না করতাম, তাহলে তাদের শায়েস্তা করবারও কোন আগ্রহ বোধ করতাম না। এই একটু আগে পর্যন্ত আমার সব অবাধ্যতা দিয়ে হয়তো কিছু একটা আদায় করবার চেষ্টা ছিল আমার মধ্যে। কিন্তু এখন আর নেই। বাবার কাছে কিছুই চাই না আমি আর। কিচ্ছু না। জন্ম যখন হয়েছে, মৃত্যু হবে একদিন—এটা প্রকৃতির নিয়ম। বেঁচে থাকার ইচ্ছে বা চেষ্টা—সেটাও প্রকৃতির নিয়ম। আমি বাঁচতে চাই, অস্বীকার করব না। মাটিতে পেড়ে ধরে স্বয়ং ভগবানও যদি ছুরি নিয়ে আসে, যদি বলে চুপচাপ শুয়ে থাকলে স্বর্গে যাবে, তবু চেষ্টা করব উঠে দৌড় দিতে। বাঁচতে হলে তোমার সাহায্য আমার নিতেই হবে। ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে কাউকে

ব্ল্যাকমেইল করব না আর। কোনদিন আর একটাও নোংরা ছবি তুলব না।'

'আর তৃতীয়টা?'

'বিয়ে করে সংসারী হওয়া?' মাথাটা নিচু করল শিখা। 'একটা ছেলের সাথে বিয়ের কথা সব ঠিক ছিল আমার। এনগেজমেন্ট রিঙও দিয়েছিল, সেটা খুলে রেখে গত দু'মাস ধরে শয়তানী করে বেড়াচ্ছি আমি। মুক্তি পেলে ওর কাছে ফিরে যাব আমি, সব খুলে বলব। ও যদি সব শুনে আমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়, ঠিক আছে, বিয়ে করে সংসারী হব; যদি না হয় চেষ্টা থাকবে আমার, কিন্তু কবে মনের মত মানুষ পাব, হলফ করে বলতে পারব না।'

'তাহলেই চলবে,' বলল রানা। মৃদু চাপ দিল সে শিখার কাঁধে। 'দ্যাট্‌স্ আ গুড গার্ল। এবার এখান থেকে পালাবার চেষ্টায় পুরোপুরি মন দেয়া যেতে পারে। পারলে পারলাম, না পারলে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারে তাগাদা দেয়ার লোক থাকবে না। শোনো, নেবর যে মারা গেছে সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। আমাদেরও হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা কোলে বসিয়ে সকাল-বিকেল চুমো খাওয়ার জন্যে নয়, দেখামাত্র খুন করার জন্যে। কাজেই, আমি যা বলব ঠিক তাই করতে হবে তোমার। নার্ভ ঠিক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, কাজটা সহজ যদিও নয়, অসম্ভবও নয়। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'ভেরি গুড। এবার খানিকটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক দুর্গটা। প্রথমে নিরাপদে ঘুমানোর মত একটা ঘর দরকার।'

'ঘুমানোর মত ঘর! এই অবস্থায় ঘুমের কথা ভাবছ কি করে?'

'লম্বা একটা রাত পড়ে রয়েছে সামনে। ঘুম আসুক, না আসুক বিশ্রাম তো একটু নিতেই হবে।'

'আজ রাতে যাচ্ছি না আমরা?'

'না। ফিল্মগুলো উদ্ধার না করে এক পা নড়ব না আমি। ওগুলো তোমার বাবার হাতে তুলে দিলে বাকি বিশ হাজার ডলার পাব। তার চেয়েও বড় কথা, যে কাজের ভার আমাকে দেয়া হয়েছে সেটা করতে না পারলে ত্রিশ হাজার ডলার যেটা অগ্রিম নিয়েছি, সব ফেরত দিতে হবে আমার। অথচ ফেরত দেয়ার উপায় নেই, অর্ধেকের বেশি খরচ করে বসে আছি।'

'মাথা খারাপ তোমার!' এক পর্দা চড়ে গেল শিখার কণ্ঠস্বর। 'ওগুলোর জন্যে অপেক্ষা করলে আর এখান থেকে বেরোতে হচ্ছে না। ধরা পড়ে যাব আমরা—এটাও হবে না, ওটাও হবে না।'

'দুটোই হবে। খামোকা দুশ্চিন্তা কোরো না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। চলো, আগের কাজ আগে, পছন্দসই একটা ঘর খুঁজে বের করে ফেলা যাক।'

সার বেঁধে একদল লোককে এগিয়ে আসতে দেখে আরও খানিকটা পিছিয়ে গেল

তারিক আখতার। প্রত্যেকটা লোকের হাতে একটা টর্চ আর একটা করে শটগান। টর্চগুলো জ্বলছে নিভছে এগিয়ে আসছে।

এতে মোটেই বিচলিত হলো না সে। ও নিজে হলে কোনদিন এই রাতে জঙ্গলের মধ্যে কাউকে খুঁজতে লোক পাঠাত না। ভয় পেয়ে যদি কোন শব্দ করে না ফেলে তাহলে এই রাতের অন্ধকারে আত্মগোপনকারীকে খুঁজে বের করা এক কথায় অসম্ভব।

কিন্তু এই খোঁজাখুঁজির অর্থ কি? কাকে খুঁজছে ওরা? মাসুদ রানা আর শিখা শংকরকে? ওরাও পালিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে? যদি তাই হয় তাহলেও কিছু করার নেই ওর। সারারাত যদি জঙ্গলে ঘোরে, তবু রানাকে খুঁজে বের করা যাবে না।

বড়সড় একটা ঝাঁকড়া গাছ বেছে নিয়ে সড়সড় করে উঠে গেল সে মগডালে। নিচ থেকে টর্চ ফেললেও দেখতে পাবে না কেউ আর ওকে। একটা ডালের দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে নিচের দিকে সতর্ক চোখ রাখল সে।

একটু পরেই জুতোর মচ-মচ শব্দ পাওয়া গেল, পাতার ফাঁক দিয়ে আলোর রশ্মি দেখা গেল। পায়ের শব্দ এগিয়ে গেল গভীরতর জঙ্গলের দিকে। ওদের বোকামি দেখে মুখ বাঁকা করল তারিক আখতার। অযথা সময় নষ্ট করছে ব্যাটারা।

ঘণ্টা দেড়েক অনর্থক খোঁজাখুঁজি করে ওরা নিজেরাও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। ফিরে আসছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে আলো ফেলতে ফেলতে চলে গেল ওরা গাছের নিচ দিয়ে। ঘড়ি দেখল তারিক আখতার। সাড়ে আটটা। ওদের ফিরে যাওয়ার তাড়াটা এত প্রবল কেন বুঝতে পেরে মুচকি হাসল সে। ডিনার টাইম—খিদে পেয়েছে। একটা সরু ডালে পায়ের চাপ দিয়ে পাতাগুলো দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল সে, মাঠ পেরিয়ে দুর্গের একটা সাইড রোড দিয়ে ঢুকছে ওরা। ওদের মধ্যে একজন লোক ঢুকল কেবল সামনের দরজা দিয়ে। একটু পরেই লোকটাকে দেখা গেল একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে। জ্যাক ডজ আর ফন কীসলার বসে আছে দুটো চেয়ারে, তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

'কি খবর, ক্লিমেঞ্জা? ফিরে এলে যে?' জিজ্ঞেস করল ফন কীসলার।

'খামোকা রাতের বেলা বন-বাদাড়ে ঘুরে কোন লাভ নেই, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' বলল গরিলা-সদৃশ ইটালিয়ান ক্লিমেঞ্জা। ধূর্ত এক জোড়া চোখ রাখল ফন কীসলারের চোখে। 'অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল খুঁজে বের করে দেব, আজ না।'

'কাল সকাল কয়টার মধ্যে হাতে পাচ্ছি ওদের?'

'যদি বলেন জীবিত ধরতে হবে, তাহলে বারোটার মধ্যে অবশ্যই; আর যদি বলেন "অথবা মৃত", তাহলে সকাল নয়টার মধ্যে হাজির করতে পারব দুটো লাশ। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকবে ওরা, টিকতে পারবে না বেশিক্ষণ।'

' "অথবা মৃত"ই বললাম। যাও। আমাদের ডিনার লাগাতে বলো গিয়ে।'

হাতের ইশারায় বিদায় করে দিল ওকে ফন কীসলার।

ক্লিমেঞ্জা চলে যেতেই হুইস্কির গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফন কীসলারের দিকে চাইল জ্যাক ডজ।

'আপনি সন্তুষ্ট?'

তিন সেকেণ্ড ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে কাঁধ ঝাঁকাল ফন কীসলার।

'তাছাড়া উপায় কি? ঠিকই বলেছে ক্লিমেঞ্জা। এই রাতে জঙ্গলের মধ্যে ওদের খুঁজে বের করা সত্যিই অসম্ভব। দিনের বেলায় আবার তেমনি সহজ। রানার কাছে কোন অস্ত্র নেই, সে ব্যাপারে আমি শিওর। কাজেই বাধা দেয়ার সাধ্য নেই ওদের। কিছু না, শুধু সময়ের ব্যাপার।'

কোন কথা বলল না জ্যাক ডজ। ওর এক চোখের দিকে চেয়ে টের পেল ফন কীসলার, ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করতে পারছে না সে। চুপচাপ বসে রইল ওরা। খানিক বাদেই ডাক পড়ল ডিনারের। উঠে গিয়ে বসল দু'জন খাবার টেবিলে। খাবারের সুগন্ধে খুশি হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু ডজের কুড়োলমার্কা মুখে কোন রকম ভাবের ছায়া পড়ল না। খাওয়া শুরু হওয়ার একটু পরেই বুঝতে পারল ফন কীসলার খাবারগুলো নাড়াচাড়া করছে কেবল জ্যাক ডজ, মুখে তেমন তুলছে না।

'চমৎকার হয়েছে, তাই না?' বলল ফন কীসলার। 'আর একটু দিতে বলি?'

'না, না…যথেষ্ট হয়েছে।' বলে প্লেটটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল জ্যাক ডজ।

'খারাপ লাগছে আপনার কাছে? রান্নাটা…'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক ডজ। বলল, 'সুন্দর…সুন্দর হয়েছে। খিদে নেই তেমন।'

ক্ষুব্ধ হলো ফন কীসলার। প্রথম কোর্সটা ওর এত ভাল লেগেছিল যে আরও খানিকটা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ঘন ক্রীম সসের মধ্যে লেজসহ চিংড়ি। এই ব্যাটার জন্যে ওটা ছেড়ে এখন দ্বিতীয় কোর্সের অর্ডার দিতে হবে। হাতের ইশারায় প্লেট নিয়ে যেতে বলল সে ফুটম্যানকে। সরাসরি চাইল জ্যাক ডজের দিকে।

'কোন কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা করছেন মনে হচ্ছে?'

'পরে এ নিয়ে আলাপ করা যাবে,' বলল ডজ।

কচি ভেড়ার মাংসের দ্বিতীয় কোর্স দিয়ে গেল বেয়ারা। কিন্তু ডজের এই মন্তব্যে খাওয়ার আগ্রহে ভাটা পড়ল ফন কীসলারের। দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে ওর মনের মধ্যেও। গুস্থার সাবধান করেছিল ওকে রানার ব্যাপারে। ঠিকই দেখা যাচ্ছে, পালাতে গিয়ে মারা পড়ল নেবর, কিন্তু কোন কৌশলে হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে মাসুদ রানা। অন্তত আজ রাতের জন্যে তো বটেই। বিরাট জঙ্গলের মধ্যে ওকে খুঁজে বের করা যতটা ভাবছে ততটা সহজ সত্যিই হবে কি? আক্রমণ করতে কিংবা পালাতে পারবে না নিরস্ত্র রানা, কিন্তু এই গভীর জঙ্গলে ওকে খুঁজে বের করা সহজ না-ও হতে পারে।

গেট এবং দেয়ালের কারেন্ট চালু করবার সুইচটা রয়েছে এন্ট্রান্স গেটের পাশের ঘরটায়। সকালে বাইরে থেকে বাজার নিয়ে আসবে দু'জন লোক, স্থানীয় এক কাঠের ব্যবসায়ী আসবে গোটা ত্রিশেক গাছ কাটার চুক্তির ব্যাপারে—সেই সময় কারেন্ট অফ করে দিতেই হবে। সেটা টের পেলে ঠিক সেই মুহূর্তে হয়তো দেয়াল টপকে বেরিয়ে যেতে পারে সে বাইরে। কিন্তু টের পাবে কি?

অর্ধেক খেয়েই ঠেলে সরিয়ে দিল সে কচি ভেড়ার মাংসের ডিশ। ফুটম্যানকে আদেশ দিল যেন এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসে ক্লিমেঞ্জাকে। ফন কীসলারের এই পরিবর্তনে সিকিভাগ খাওয়া প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে চোখ তুলে চাইল জ্যাক ডজ।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল সে মৃদু কণ্ঠে।

'এই রানা লোকটা...' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কাউন্ট চেয়ার ছেড়ে। 'দুর্গের বাইরে ওর স্বাধীনভাবে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোটা কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না আমার। আমি জানি, পালাতে পারবে না...কিন্তু...' ক্লিমেঞ্জা এসে ঢুকল ঘরে মুখ নাড়তে নাড়তে। অর্থাৎ খাওয়া ফেলে এসেছে। ফন কীসলার জিজ্ঞেস করল, 'কারেন্টের সুইচ রয়েছে যে ঘরটায়, সেখানে কি ব্যবস্থা করেছ?'

'কোন চিন্তা নেই, এক্সেলেন্সি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ক্লিমেঞ্জা, 'তিনজন আর্মড্ গার্ড বসিয়ে দিয়েছি ওই ঘরে। সারারাত এক মিনিটের জন্যেও ঘুমাবে না কেউ।'

'গুড!' স্বস্তির আভাস ফুটে উঠল ফন কীসলারের মুখে। 'তবু একটা ফোন করে ওদের বলে দাও, আজকের রাতটা খুবই সতর্ক থাকতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে একজন ভয়ঙ্কর লোক আছে...সামান্য দুর্বলতার আভাস পেলেই আক্রমণ করে বসবে সে লোক।'

'ইয়েস, এক্সেলেন্সি। প্রয়োজন নেই, তবু আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি আমি ওদের।' বেরিয়ে গেল ক্লিমেঞ্জা ঘর ছেড়ে।

আবার বসে পড়ল ফন কীসলার। প্লেট সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বেশ একটু খারাপই লাগল ওর। পেট ভরেনি। কারেন্টের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চেগিয়ে উঠেছে তার খিদেটা। কিন্তু ফেরত দেয়া প্লেট আর আনানো ঠিক হবে না। পনিরের বাস্কেটের দিকে চাইল সে লোভাতুর দৃষ্টিতে। ডজকে বলল, 'আসুন, এবার পনির চেখে দেখা যাক খানিকটা।'

'আমার ইচ্ছে নেই,' বলে উঠে দাঁড়াল জ্যাক ডজ। চলে গেল ঘরের শেষ মাথায় খোলা জানালার সামনে। চাঁদের ম্লান আলো পড়েছে লনে। স্থিরদৃষ্টিতে জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কোমরে হাত দিয়ে।

পনিরগুলোর ওপর করুণ দৃষ্টি বুলিয়ে মনে মনে দুটো গাল দিয়ে উঠে পড়ল ফন কীসলার। বড় ট্যাড়া লোক, ভাবল সে। অথচ একে উপযুক্ত খাতির না করলে ফিরে গিয়ে যদি ওর মামার কান ভাঙায় তাহলে বিপদ হতে পারে। ভাগনে বলে ছেড়ে দেয়ার লোক গুস্থার নয়, এটুকু বুঝে নিয়েছে সে এতদিনে।

'কি হলো আপনার? শরীর খারাপ...'

'আমি নিজেকে মাসুদ রানা হিসেবে কল্পনা করবার চেষ্টা করছি। ওর অবস্থায় আমি হলে কি করতাম তাই ভাবছি।' সিগারেট ধরাল জ্যাক ডজ। 'বোকা বানাচ্ছে না তো? যেহেতু নেবর পালাবার চেষ্টা করেছিল, আমরা ধরে নিচ্ছি যে রানা আর ওই মেয়েটাও পালিয়েছে। ধরে নিচ্ছি, আমরা যখন কুত্তার সাথে নেবরের ফাইট উপভোগ করছি, তখন সবার অলক্ষ্যে নিচে নেমে উল্টোদিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে ওরা। কিন্তু যদি না গিয়ে থাকে? ঘরে নেই বলেই ওরা নিচে নেমে জঙ্গলে চলে গেছে বলে ধরে নিচ্ছি কেন? ওপরেও তো যেতে পারে? আমার মনে হয় ওর জায়গায় আমি হলে তাই করতাম। অসংখ্য ঘর রয়েছে এই দুর্গে···অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে লুকিয়ে থাকা যায়।' এতক্ষণ অনেকটা আপন মনে কথা বলছিল জ্যাক ডজ, হঠাৎ ফিরল ফন কীসলারের দিকে। 'একদিন, দুইদিন, তিনদিন··· আমরা হন্যে হয়ে খুঁজতে পারি, তোলপাড় করে ফেলতে পারি পুরোটা জঙ্গল···হয়তো দেখা যাবে, এই দুর্গেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে ছিল ওরা সারাক্ষণ।'

একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল ফন কীসলার। তারপর জানাল, 'আমার তা মনে হয় না। সুযোগ পেয়েও এখানে এই ফাঁদের মধ্যে রয়ে যাবে, এতটা গর্দভ মনে করি না আমি ওকে। আমার বিশ্বাস, সুযোগ পেয়েছে, এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছে সে।'

'নাও করতে পারে,' বলল ডজ। 'ও কি করে জানবে যে আপনার আরও কুকুর নেই? ও কি করে জানবে যে অন্যদিকের অন্য জানালায় আরও লোক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ও এই দুর্গেই রয়ে গেছে, মেয়েটাকে নিয়ে।'

'ঠিক আছে, আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। পুরোটা দুর্গ সার্চ করার ব্যবস্থা করছি আমি। দেখা যাক, আপনার কথা ঠিক, না আমারটা।'

'প্রতিযোগিতাটা আপনার সাথে আমার হচ্ছে না,' কঠোর কণ্ঠে বলল ডজ, 'হচ্ছে মাসুদ রানার সঙ্গে আমাদের সবার। হ্যাঁ···সার্চের ব্যবস্থা করে ফেলুন। পাওয়া যদি নাও যায় কাজের কাজ হবে একটা।' ডাইনিং টেবিলের দিকে এগোল সে। 'এবার খানিকটা পনির খেলে মন্দ হয় না,' বলে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে।

আবার ডেকে পাঠানো হলো ক্লিমেঞ্জাকে।

খাবার সময় দ্বিতীয়বার বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল ক্লিমেঞ্জা গজর গজর করতে করতে। আরও পাঁচজন গার্ড একসাথে বসে খাচ্ছিল, হাসি চাপল তারা। এই সিসিলিয়ান দানবকে ভয় এবং অপছন্দ—দুটোই করে ওরা তীব্রভাবে। বাবুর্চি বলল ওর খাবারটা গরম রাখার ব্যবস্থা করবে। প্লেটের দিকে মুখ ভেংচে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ক্লিমেঞ্জা।

পনির কাটতে কাটতে ফন কীসলার বলল, 'এমনও হতে পারে, পলাতকরা

জঙ্গলে মোটেই যায়নি। হয়তো এই দুর্গের কোথাও লুকিয়ে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। লোকজন নিয়ে প্রত্যেকটা ঘর সার্চ করবার ব্যবস্থা করো।'

আধ-খাওয়া প্লেটটা ভেসে উঠল ক্লিমেঞ্জার চোখের সামনে।

'নিশ্চয়ই, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' মাথা ঝুঁকিয়ে বো করল সে। 'কিন্তু তেতলার ওপর আর কোন তলায় বাতির ব্যবস্থা নেই। সবগুলো ঘর ঠাসা রয়েছে আসবাব পত্রে। টর্চের আলোয় ভালমত সার্চ করা যাবে না। তারচেয়ে কাল দিনের বেলা দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে সার্চ করলে ভাল হত না? সকালে হলে প্রত্যেকটা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। আপনি বললে আজই সার্চের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু সন্তোষজনক থরো হবে না কাজটা।'

জ্যাক ডজের দিকে চাইলেন ফন কীসলার। ওকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখে ক্লিমেঞ্জার দিকে ফিরল।

'ঠিক আছে। কিন্তু এক্ষুণি একটা কাজ করো তুমি। প্রত্যেকটা সিঁড়ির মাথায় একজন করে লোক দাঁড় করিয়ে দাও। যদি এই দুর্গের মধ্যেই ওরা থাকে তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকে যেন অন্য কোথাও না যেতে পারে। বুঝতে পেরেছ? সকাল হলেই শুরু হবে সার্চ।

মাথা ঝুঁকিয়ে বো করে বেরিয়ে গেল ক্লিমেঞ্জা। প্রত্যেক তলার সিঁড়ির মাথায় একজন করে গার্ড মোতায়েন করে দিয়ে ফিরে গেল খাওয়া সমাপ্ত করতে।

সতেরো

শিখাকে নিয়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে উঠে এল রানা ছয়তলায়। আরও তিনটে তলা রয়েছে দুর্গের—যদি প্রয়োজন হয় তাড়া খেয়ে পালাবার মত বেশ অনেকটা জায়গা থাকল।

অন্ধকার। চারপাশে কোন সাড়াশব্দ নেই। করিডর ধরে কিছুদূর এগিয়ে টর্চ জ্বালল রানা। দুপাশে সারি বাঁধা ঘর। দোতলার মতই। পঞ্চম দরজার সামনে থামল রানা, সামান্য একটু ফাঁক করে চোখ রাখল, শুনল কান পেতে, তারপর টর্চ জ্বেলে ভিতরটা দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল।

বড়সড় একটা ঘর। ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল রানা। চারপাশে আলো ফেলে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'চলবে। খাটে উঠে পড়ো। আমি বাইরেটা একনজর দেখে আসছি।'

ব্যালকনিতে বেরোবার দরজা খুলে বাইরেটা দেখে ফিরে এল রানা, উঠে পড়ল খাটে। হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে সিগারেট ধরাল। বলল, 'ডিনারের জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে আছে। আমাদের জন্যে রান্না হয়েছে, অথচ খেতে

পারব না—কি বিচ্ছিরি ব্যাপার না? বিপদের ঝুঁকি না থাকলে চুরি করে আনতাম কিছুটা।' অবাক হয়ে চাইল শিখার দিকে। 'কি হলো! বসে কেন? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। অনেক রাত পড়ে আছে।'

'আমি ভাবছি, এই ভয়ঙ্কর এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সত্যিই কোনদিন সম্ভব হবে কিনা।'

'হবে। কালকেই। খিদে লেগেছে?'

'না। খাওয়ার কথা ভাবতেও পারছি না এখন।'

হাত ধরে টেনে শুইয়ে দিল ওকে রানা। বলল, 'লাকি মানুষ! আমি ওই কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। ভুলতে হলে ঘুম ছাড়া রাস্তা নেই।'

'আমি ঘুমোতে পারব না। ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইছে।'

'এই ভয়টা অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল। শংকরলালজীর মত একজন লোকের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়ার আগে একশো এক বার চিন্তা করা উচিত ছিল তোমার। বোঝা উচিত ছিল, যাকে ব্ল্যাকমেইল করতে যাচ্ছ, সে একজন...'

'থাক রানা, ওঁর কথা আর শুনতে চাই না।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? নিচে নেমে গিয়ে কাউন্টকে যদি বলা যায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমাদের ছেড়ে দিলে জীবনে আর কোনদিন ওসব ছবি তুলব না, তাহলে? ছবিগুলো হাতে পাচ্ছে, আমার প্রতিজ্ঞা পাচ্ছে...'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে যাবে কেন সে?'

'কেন করবে না? তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করছ।'

'করতে বাধ্য হচ্ছি, তাই। বিশ্বাস করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই, কিন্তু ওর আছে। তোমার মাথার পিছন দিয়ে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারলে ওর সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে না, নিশ্চিন্ত হতে পারছে যে শিখা শংকর জীবনে কোনদিন আর নীলছবি তৈরি করবে না। সেটাই তার জন্যে সহজ না?' পাশ ফিরল রানা। 'ওসব উদ্ভট খেয়াল বাদ দিয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো।'

প্রকাণ্ড এক হাই তুলল রানা, তারপর আশ্চর্য, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল! অন্ধকারে অদৃশ্য ছাতের দিকে চেয়ে রানার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল শিখা কয়েক মিনিট। একে একে নিজের জীবনের অতীত স্মৃতি ভেসে উঠতে শুরু করল ওর মনের পর্দায়।

মায়ের মুখ, স্নেহময় বাবার মুখ পরিষ্কার দেখতে পায় ও। আহা, কি সুন্দর ছিল তখন জীবনটা! বাবার সাথে খেলা, তার পাশে ঘুমানো, তার থালা থেকে খাওয়া। বারোটা বছর যেন অপূর্ব সুন্দর এক সুখস্বপ্নে কেটেছিল ওর। বাবাই ছিল ওর সব। কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ওকে খুঁজে বের করবে বলে লুকিয়ে থাকত সে দরজার আড়ালে, কোনদিন খুঁজতে ভুলে গেলে কেঁদে খুন হয়ে যেত, অনেক চকোলেট

খরচ হয়ে যেত ওর মান ভাঙাতে। তারপর সব ওলোটপালোট হয়ে গেল মায়ের মৃত্যুর পর। দু'বছর পর সংসারে এল সৎমা। শুরু করল কৌশল। একে একে খর্ব হতে আরম্ভ করল ওর সব অধিকার। ধীরে ধীরে বাবাও সরে গেল বহুদূরে। উহ্, কেটলির ফুটন্ত জলের মত অবস্থা হয়েছিল ওর।

কিন্তু আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ওর যত বিক্ষোভ, যত আক্রোশ, যত যন্ত্রণা—সবই ছিল হারানো স্নেহ ভালবাসা ফিরে পাওয়ার জন্যে। তাণ্ডব ঝংকার বাজছিল ঠিকই, কিন্তু সেতারটা ছিল, তারও ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে রানার একটি কথায় ছিঁড়ে গেছে সব তার। সত্যিই এতটা দূরে সরে গেছে বাবা! মেয়েকে খুন করবার পরিকল্পনা নিতেও তার বাধেনি? এতই অতিষ্ঠ করে তুলেছে সে তাকে, যে ওকে হত্যা করা ছাড়া পথ ছিল না বাবার? এতটুকু স্থান নেই ওর বাবার হৃদয়ে?

যাকগে, ওসব আর ভাবতে চায় না শিখা। সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে আজ ওর বাবার সাথে। আর কোন দাবি নেই ওর বাবার উপর, কাজেই তাকে জ্বালাতনের প্রশ্নই ওঠে না। এতদিন মনে করেছিল কষ্ট দিচ্ছে সে ওর বাবাকে, ভেবেছে কষ্ট পেলে বাবা বুঝবে ওর ভিতরের যন্ত্রণা, দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসবে, বলবে—তোকে এত কষ্ট দিয়েছি বুঝিনিরে শিখি! সব অভিমান ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে ওর বাবার বুকে, কেঁদে হালকা করে ফেলবে হৃদয়ের সব বোঝা, গ্লানি। কিন্তু ওকে ভালবাসা দিয়ে মমতা দিয়ে সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার বদলে খুনী লেলিয়ে দিয়েছে বাবা ওর পিছনে, হুকুম দিয়েছে ফিল্মগুলো কেড়ে নিয়ে ওকে খতম করে দেয়ার। সন্তানের উপর এতটা নিষ্ঠুর হতে পারল বাবা? উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতটা বদলে দিতে পারে মানুষকে?

কিন্তু সে ও তো কম করেনি। ওর মনে কি ছিল সেটা তো আর ওর বাবার জানবার কথা নয়। আসলে এই ছবি তৈরির ব্যাপারে কিছুতেই মত দেয়া উচিত হয়নি ওর। উইলিকে সাহায্য করতে গিয়ে ও নিজের যে কতখানি সর্বনাশ করছে টের পায়নি আগে। ব্যাপারটা অনেক হালকা ভাবে দেখেছিল উইলি, বলেছিল নীলছবির ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে সে ওর বাবার কাছ থেকে, তারপর ছবিটা তার হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবে আমেরিকায়। কিন্তু সেজন্যে চারটে ছবি তোলার কি দরকার তখন বুঝতে পারেনি ও, এখন বুঝতে পারছে, অনেক টাকার স্বপ্ন দেখেছিল উইলি—অন্তত তিন লক্ষ ডলার আদায় করবার ইচ্ছে ছিল ওর বাকি তিনটে ছবি দিয়ে।

উইলির মৃত্যুতে কেন ওর তেমন খারাপ লাগছে না ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারল শিখা লোকটাকে মোটেই পছন্দ ছিল না ওর। পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও মনে মনে ঠিকই বুঝেছিল ও উইলির উদ্দেশ্য, প্রথম রীলটা ওকে কিছু না জানিয়ে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে জেনে প্রথমে টনক নড়েছিল ওর—মুখে যা বলছে কাজে অন্য রকম করছে লোকটা। কিন্তু ভেবেছিল তাতে ওর কিছুই এসে যায় না। দুঃখ দিতে চেয়েছিল, সেটা হলেই ও খুশি। তবু যখনই মনে হয়েছে ওর ওই নোংরা

কাজকর্মের ছবি দেখছে ওর বাবা, লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছে ওর মাটির সাথে। সীমা কি সে-ও লঙ্ঘন করেনি? পাঠাবার কথা নাহয় ভাবতেও পারেনি, কিন্তু তুলল কি করে সে ওসব ছবি?

তুলতে আসলে চায়নি ও। উইলির সাধাসাধি আর চাটুকারিতায় বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিল। তাও লজ্জার বাধা ডিঙানো সম্ভব হত না ওর পক্ষে যদি না এল. এস. ডি. খাইয়ে ওকে বেপরোয়া করে তোলা হত। ছি! কি করে রাজি হয়েছিল সে ওসব কাজে!

ভিতর ভিতর তীব্র একটা লজ্জা অনুভব করল শিখা। স্থির করল, যদি এই মৃত্যু-দুর্গ থেকে প্রাণ নিয়ে একবার বেরোতে পারে তাহলে নতুন ভাবে জীবন শুরু করবে সে। বাবাকে মুছে ফেলবে সে মন থেকে। কোন সম্পর্ক রাখবে না আর কিছুতেই। যতদিন না মনের মত কোন মানুষ পাওয়া যাচ্ছে ততদিন একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়ে পেট চালাবে সে। বাবার সাহায্য নেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারও সাহায্যই নেবে না সে আর জীবনে। বুঝে গেছে সে, সবার সব সাহায্যের সাথেই একটা করে গিট লাগানো থাকে। স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে সাহায্য করে না। এই যে লোকটা, মাসুদ রানা, এ যে সাহায্য করছে ওকে সেটাও নিঃস্বার্থ নয়—বিশ হাজার ডলার পাবে লোকটা ফিল্ম তিনটে ওর বাবার হাতে তুলে দিতে পারলে। ভবিষ্যতে কোনদিন আর নীলছবি তৈরি করবে না এই কথা আদায় করে নিয়ে তারপর সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিঃস্বার্থ কেউই নেই দুনিয়ায়। কেউ না।

ঘুমন্ত রানার দিকে চেয়ে ঈর্ষা বোধ করল শিখা। এই বিপদের মধ্যে লোকটা এমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে কি করে? প্রকৃতি এই পুরুষ জাতটাকে এমন কতগুলো সুবিধে দিয়েছে...

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল শিখা। মুহূর্তে ধুপধাপ লাফাতে শুরু করল ওর হৃৎপিণ্ড। মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না? উঠে বসতে যাচ্ছিল শিখা, একহাতে জড়িয়ে ধরে আবার শুইয়ে দিল ওকে রানা। কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম বলে মনে হলো!'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

অন্ধকারে দেখতে পেল না, কিন্তু অনুভব করল শিখা, দুলে উঠল বিছানাটা। নেমে গেছে রানা।

'কোথায় চললে!' ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শিখা।

'চুপ!' ধমক দিল রানা। 'বসে থাকো চুপচাপ!'

দরজায় কান ঠেকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল রানা। কিছু শুনতে না পেয়ে আস্তে দরজাটা খুলে ফাঁক করল এক ইঞ্চি।

আলো জ্বলছে সিঁড়িঘরে। কথা বলে উঠল একজন, 'কি খবর ভালডেজ, কেমন বুঝছ?'

দরজা আর একটু ফাঁক করে মাথাটা সামনে বাড়িয়েই দেখতে পেল রানা লোকটাকে। সিঁড়ির ধাপে বসে রেলিঙে হেলান দিয়ে নিচে কারও সাথে কথা বলছে লোকটা। কোলের উপর রাখা একটা শটগান। নিচ থেকে কি উত্তর এল বোঝা গেল না। উপরের লোকটা বলল, 'আর বোলো না, পাগলের কারখানা! ভরপেট খেয়ে এখন থাক বসে সারা রাত সিঁড়ির গোড়ায়!'

কি যেন বলল নিচের লোকটা, হেসে উঠল একজন। তারপর চুপ।

লোকটাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে গেছে রানার। এখানে পাহারা দেয়ার কারণ কি? নিচে আরও লোক রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কাউন্ট কি বুঝে ফেলেছে, জঙ্গলে পালিয়ে না গিয়ে এই দুর্গেই রয়ে গেছে এখনও ওরা? তা নইলে সিঁড়িতে পাহারা বসাবার আর কি কারণ থাকতে পারে? কিন্তু তাহলে বসে রয়েছে কেন? সার্চ করলেই তো সন্দেহ নিরসন হয়ে যেতে পারে? একটু ভাবতেই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা রানার কাছে। নিশ্চিত জানলে সিঁড়িতে পাহারা থাকতই, আজ রাতেই পুরোটা দুর্গ সার্চ করবার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু এত বিশাল দুর্গ দিনের বেলা সার্চ করাই কঠিন, সামান্য সন্দেহের উপর ভিত্তি করে রাতের বেলা সার্চ করবার প্রশ্নই ওঠে না। যদি ওরা এই দুর্গেরই কোথাও লুকিয়ে থাকে তাহলে যেন এখান থেকে আর বেরোতে না পারে সেই ব্যবস্থা করেই আজ রাতের মত নিশ্চিন্ত হয়েছে কাউন্ট।

ফিরে গিয়ে বসল রানা খাটের কিনারে, যা দেখেছে, শুনেছে আর ভেবেছে বলল শিখাকে। ভয় পেয়ে গেল শিখা।

'আমরা যে এখানে রয়েছি সেটা টের পেয়ে গেছে তাহলে!'

'পরিষ্কার জানে না, কিন্তু সন্দেহ করেছে। তবে তোমার ঘাবড়াবার কিছুই নেই—খুঁজে পাওয়া অত সহজ না। নড়াচড়ার জন্যে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে আমাদের, হাতে সময়ও রয়েছে যথেষ্ট। একটা কিছু বুদ্ধি বেরিয়ে যাবেই। আমার কথামত চললে ওরা নাগাল পাবে না তোমার। যদি ভয় পেয়ে বোকার মত কিছু করে বসো, ধরা পড়ে যাবে নির্ঘাত।'

'সার্চ শুরু হলে কি করব কাল?'

'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে, আজকের কথা আজ।'

'আজকে কি করব?'

'প্রথম কাজ হচ্ছে, আমাকে একটা কিস্ করো।'

'এই অবস্থায় ঠাট্টা করছ কি করে?'

'ঠাট্টা নয়, এটা হচ্ছে রানা ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের একটা অমূল্য নার্ভ টনিক। এটা খেলে সহজে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয় না। লজ্জার কিছু নেই, ডু ইট।'

হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নিল-ডাউন হয়ে দাঁড়াল শিখা, রানার গলা জড়িয়ে ধরে টেনে নিল বুকের উপর, শিশু যেমন দুধের শিশির নিপ্‌ল্ খোঁজে তেমনি করে খুঁজল রানার ঠোঁট। আধ মিনিট পর সরে গেল শিখা, জিজ্ঞেস করল, 'এইবার কি করতে

হবে?'

'এইবার অপেক্ষা করতে হবে। যখনই ভয় লাগবে এক ডোজ করে টনিক খাবে—নো লেস, নো মোর। শুয়ে পড়ো, আমি ভেবে চিন্তে একটা কিছু উপায় বের করে ফেলি।'

শুয়ে পড়ল শিখা। রানাও। চুপচাপ কেটে গেল অনেকটা সময়। তারপর নড়ে উঠল রানা।

'শুনতে পাচ্ছ?'

'কি!' বিস্ফারিত হয়ে গেল শিখার চোখ। সত্যিই বিদঘুটে একটা শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

'নাক ডাকাচ্ছে গার্ড। ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কপাট ফাঁক করে দেখল রেলিঙে হেলান দিয়ে সুখের রাজ্যে চলে গেছে প্রহরী। মাথাটা হেলে আছে একপাশে।

দরজা বন্ধ করে টর্চ জ্বালল রানা। ঘরের চারপাশে আলোটা একবার বুলিয়ে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভারি কার্টেন খোলা এবং বন্ধ করার জন্যে কড়ে আঙুলের সমান মোটা শক্ত সোনালী দড়িটা পরীক্ষা করল মন দিয়ে। তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে খসিয়ে আনল হুকসহ। ওপাশের দড়িটাও খসাল এইভাবে। দুই মিনিটের মধ্যে চারটে জানালার সব রশি টেনে নামিয়ে আনল নিচে, তারপর গিঁঠ দিয়ে বাঁধতে শুরু করল ওগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা। শিখা উঠে এসে টর্চ ধরল কাজের সুবিধের জন্যে।

'কি করছ?'

'ওদের একটু ঘোলা পানিতে ফেলতে চাই,' বলল রানা। 'ধাঁধা লাগিয়ে দেব ওদের মনে। গ্যাঁড়াকলে পড়লে এটাই একমাত্র রাস্তা।'

উঠে গিয়ে নিঃশব্দে ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাটা খুলল রানা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ব্যালকনিতে বাঁকা হয়ে। রেলিঙের উপর দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখল দুর্গের কোথাও কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের আলো বিছিয়ে রয়েছে সারা মাঠে, দূরে আঁধার দেখা যাচ্ছে জঙ্গলটা।

দড়িটা নামাতে শুরু করল রানা। এমন ভাবে নামাল, যেন পথে কোন জানালা বা ব্যালকনি না পড়ে। দোতলা পর্যন্ত নামানো গেল। অর্থাৎ আরও দড়ি জোড়া দিতে হবে।

'তুমি বসো, আমি আরও দড়ি নিয়ে আসি। টর্চটা শিখার হাত থেকে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল রানা।

'আমিও যাব। একা এইঘরে…'

'যা বলছি তাই করো।' বলে টর্চ নিয়ে করিডরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজা ফাঁক করে ঘুমন্ত গার্ডকে দেখল কয়েক সেকেণ্ড, নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। পাশের ঘরের দরজায় কান পেতে অপেক্ষা করল কয়েক সেকেণ্ড,

তারপর নিঃশব্দে খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। দুই মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে দড়ি নিয়ে। রেলিঙের সাথে হালকা করে বেঁধে রাখা দড়ির সাথে বাকিটুকু যোগ দিয়ে আরও খানিক নামাতেই মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওটা। এদিকের মাথাটা শক্ত করে বাঁধল এবার সে ব্যালকনির রেলিঙের সাথে, তারপর ফিরে এল ঘরে দরজাটা আধ ভেজানো রেখে।

'ওদের বোকা বানানো সম্ভব হতে পারে,' বলল সে। 'যদি তা নাও হয়, কিছুটা গোলমালে পড়বে ওরা, সময় পাব আমরা।'

'ওই রশি বেয়ে নেমে যাচ্ছি না আমরা? এদিক দিয়ে পালালে...'

'আমি পারি, কিন্তু তুমি পারবে না। কাজেই এদিক দিয়ে যাচ্ছি না।'

রানার একটা হাত ধরল শিখা।

'যদি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারি, জীবনে কোনদিন কোনভাবে ঘাঁটাব না আমি আর বাবাকে। কোন সম্পর্কই রাখব না আর তার সাথে। কোনদিন না!'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'আগে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচে নিই, তারপর সম্পর্কের কথা ভাবা যাবে। এখন চলো, এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যাক।'

পা টিপে বেরিয়ে এল ওরা করিডরে। সিঁড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। একটা মোড় ঘুরে করিডরের একেবারে শেষ মাথায় চলে এল। বিরাট আকারের দুই পাল্লার দরজা দেখে নিল রানা চট করে একবার টর্চ জ্বেলে। শিখাকে অপেক্ষা করবার ইঙ্গিত করে এগিয়ে গিয়ে কান ঠেকাল দরজায়। দরজা ফাঁক করে আরও কয়েক সেকেণ্ড কান খাড়া করে অপেক্ষা করল রানা, তারপর আলো জ্বালল ভিতরের দিকে।

মস্ত এক ব্যাংকোয়েটিং হলে ঢুকল ওরা। নানান ধরনের জিনিসে একেবারে ঠাসা। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা। এখান থেকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না। এক অংশ খুঁজলে সরে যাওয়া যাবে অন্য অংশে। ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ঘুমাচ্ছে সিঁড়ির গার্ড। নাক ডাকছে সমান তালে।

গাছের মগডাল থেকে রানাকে দেখতে পেল তারিক আখতার দুর্গের ছয়তলার একটা ব্যালকনিতে। একটা রশি নামাচ্ছে রানা। ছোট্ট বিনকিউলারের ফোকাসিং আর একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতেই স্পষ্টতর হলো রানার ছবি। দোতলা পর্যন্ত রশি নামিয়ে ঘরে ফিরে গেল সে। তারিক বুঝতে পারল, আরও রশি সংগ্রহ করতে গেল রানা। ভাগবার মতলবে আছে ব্যাটা।

চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়ে দুর্গটাকে বিশাল এক দৈত্যপুরী বলে মনে হচ্ছে। আলো ছায়া সব মিলিয়ে রহস্যময়। কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সবাই ঘুমে নিঝুম। খানিক বাদেই ফিরে এল রানা। আরও কিছুটা দড়ি যোগ করল, সাবধানে নামাল ওটা নিচ পর্যন্ত, তারপর কষে বাঁধল এক মাথা রেলিঙের সাথে।

এইবার নামবে, ভাবল তারিক। ছয়তলার উপর থেকে রশি বেয়ে নামাটা বিপদজনক। রানার জন্যে ততটা না, কিন্তু মেয়েটা নামবে কি করে? নিচের দিকে একবার চাইলেই পড়ে যাবে মাথা ঘুরে। দেখা যাক, কি বুদ্ধি বের করে মাসুদ রানা।

মাসুদ রানার আশ্চর্য সব কার্যকলাপের কথা শুনেছে তারিক আখতার হেড অফিসে বসে। জানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশজন স্পাইয়ের একজন হিসেবে ধরা হয় ওকে। ওর কাজের ধারা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করার সুযোগ পায়নি সে আগে কোনদিন। মনে মনে খুব খুশি হলো সে। মোহাম্মদ আলী ক্লের ফাইট দেখবার মত মজা পাবে সে আজ একজন মাস্টার স্পাইয়ের খেলা দেখে। খাড়া হয়ে বসে আছে সে গাছের ফাডালে।

.আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। একপাট খোলা দরজাটা তেমনি হাঁ হয়ে আছে, ব্যালকনি জনশূন্য। রানাকে দেখা গেল না আর। আরও মিনিট পনেরো পেরিয়ে যেতে হঠাৎ বুঝতে পারল তারিক এদিকে আর কিছুই ঘটবে না—বুঝে ফেলল, ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে ঝুলিয়েছে রানা রশিটা। প্রশংসা ফুটে উঠল ওর চোখে-মুখে। .একই সাথে একসময় কাজ করেছে ওরা পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর পরোক্ষ প্রত্যক্ষ দুই ভাবেই রানার বিরুদ্ধে কাজ করেছে সে—কিন্তু টিকতে পরেনি ওর সামনে। কিছুদিন আগে লাহোরে প্রায় আটকে ফেলেছিল ওরা রানাকে, ওর বিরুদ্ধে ট্রুপস্ পর্যন্ত নামানো হয়েছিল, কিন্তু সবাইকে কলা দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ও। এই আশ্চর্য ধূর্ত লোকটার প্রতি দিন দিন বাড়ছে ওর শ্রদ্ধাবোধ। বোঝা যাচ্ছে, দুর্গের মধ্যেই থেকে যেতে চাইছে ও এখন, অথচ ভাব দেখাতে চাইছে যে ওরা দড়ি বেয়ে নেমে জঙ্গলে পালিয়েছে।

আরও আধঘণ্টা চুপচাপ বসে থেকে কর্তব্য স্থির করে ফেলল তারিক আখতার। অনেক আগেই নিভে গেছে দুর্গের সব বাতি। কাল সকালে পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠলেই তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে জঙ্গলময়। তখন এখানে টেকা মুশকিল হয়ে উঠবে। গাছ থেকে নেমে দুর্গের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

দুর্গের ভিতর আটকা পড়েছে মাসুদ রানা। অনেক কথা মনে পড়ছে আজ ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের। বিশেষ করে আফগান সীমান্তের কথা। ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারত সেদিন রানা ওকে। কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হত না। সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে চলে গিয়েছিল সে রানাকে হত্যা করার জন্যে। বড় ভাই জেনারেল এহতেশামের মৃত্যুর বদলা নিতে গিয়েছিল সে। কিন্তু রানাকে কাবু করতে গিয়ে উল্টো নিজেই কাবু হয়ে গিয়েছিল খনিগুহার অভ্যন্তরে। নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল সে, এমনি সময়ে এগিয়ে দিয়েছিল রানা গুলিভর্তি স্টেনগানটা। দিয়ে দিলারা দুররানীকে নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল গুহামুখের দিকে। আজও পরিষ্কার শুনতে পায় তারিক রানার কণ্ঠস্বর। আশ্বাস দিয়েছিল সে

দিলারাকে: ভয় নেই, রানী। মারবে না। ও, আমি, দু'জনেই এমন এক মহৎ বৃদ্ধের কাছে শিক্ষা পেয়েছি, যিনি আমাদের শুধু আক্রমণ আর আত্মরক্ষার কৌশলই শেখাননি, কলজের মধ্যে নখ বসিয়ে টান দিয়ে বড় করে দিয়েছেন মনটাও।

অথচ সে গিয়েছিল ওকে খুন করতে। চেষ্টাও করেছিল। কতবড় মহৎ লোক হলে সেই অবস্থায় সাফ মনে মাফ করে দিতে পারে, আজও হিসেব করে বুঝে উঠতে পারে না তারিক আখতার। ও নিজে হলে একটা গুলিতে চুকিয়ে দিত সব ঝামেলা। অথচ রানা শুধু প্রাণ ফেরত দিল না, ভুল শুধরে নেয়ার সুযোগ দিয়ে সম্মানের সাথে বিদায় দিল ওকে। সুযোগ দিল পাকিস্তানে ফিরে আসবার। সত্যিই, মৃত্যুপথযাত্রী কর্ণেল শেখ স্বীকার করেছে, রানার হাতে মারা যায়নি ওর বড়ভাই, মারা গেছে ডক্টর হুয়াং-এর গুলিতে। অনেক ঋণ জমেছে ওর রানার কাছে। আজ সময় এসেছে, যদি পারে, ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করবে সে।

হিংস্র এক প্রকাণ্ড জানোয়ারের মত নিঃশব্দ পায়ে ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে জঙ্গলের কিনারে এসে দাঁড়াল তারিক আখতার। বাকি পথটুকু বিপজ্জনক। তিন মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দুর্গটা পরীক্ষা করল। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন মাত্র নেই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেউ পাহারায় নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেউ এইদিকে চেয়ে রয়েছে কিনা বুঝবার উপায় নেই। যদি থাকে, উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাবে ওকে। হোলস্টার থেকে বের করে হাতে নিল সে লুগারটা, তারপর এঁকেবেঁকে দৌড় দিল সামনের দিকে। অত্যন্ত দ্রুত ছুটে এসে দুর্গের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁপাল সে দুই মিনিট। চোখ কান সজাগ, সতর্ক। কিছুই শুনতে পেল না সে। কেউ গুলি করল না, কেউ চেঁচিয়ে উঠল না, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘুমাচ্ছে নিঝুমপুরী।

নিশ্চিত হয়ে ঝুলন্ত দড়িটার দিকে এগোল এবার তারিক আখতার। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে রেখে দড়ি ধরে জোরে টান দিল সে। ছিঁড়ল না দড়ি, গিঁঠগুলো আরও শক্ত হয়ে চেপে বসায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হলো শুধু। রশি ধরে ঝুলে দেখল সে, ছিঁড়ল না।

আবার একবার চারপাশে নজর বুলিয়ে নিয়ে রশি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে উপরে। দেয়ালের গায়ে পা রেখে রেখে হাঁটার ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে সে, যতটা সম্ভব পায়ের উপর শরীরের ভার চাপাচ্ছে, যেন দড়ির ওপর চাপটা কম পড়ে। দোতলার ব্যালকনির কাছে এসে থামল তারিক। এক হাতে রেলিং ধরে দেয়ালের গায়ে খোদাই করা একটা ড্রাগনের মাথায় পা বাধিয়ে কান পাতল। কোন শব্দ এল না কানে। আবার ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। প্রত্যেকটা ব্যালকনির কাছে এসে কিছুক্ষণ করে থেমে থেমে উঠে এল সে ছয়তলায়। রেলিং টপকে খোলা দরজার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিল দুই মিনিট।

নিঃশব্দে উঠেছে সে উপরে, কিন্তু রানার তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির সাথে বাস্তব পরিচয় আছে তার, কাজেই হুট করে ঘরে ঢোকার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হলো তারিক

আখতার। হয়তো কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে রানা, হয়তো মনে করেছে কাউন্টের কোন লোক উঠে এসেছে রশি বেয়ে, ঘরের ভিতর এক পা রাখার সাথে সাথেই হয়তো ছুরিটা ঢুকিয়ে দেবে হৃৎপিণ্ডের ভিতর। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল সে, ঘরের ভিতর কোন শব্দ নেই।

'রানা...আমি তারিক!' আস্তে করে ডাকল তারিক আখতার। আর একটু তুলল গলার স্বর। 'রানা...আমি ব্রিগেডিয়ার তারিক!'

অপেক্ষা করল তারিক আখতার। ঘরের ভিতর থেকে কোন সাড়া নেই। পিস্তল আর টর্চ বেরিয়ে এল ওর দুই হাতে। এক পা এগিয়ে টর্চ জ্বালল সে। চট করে ঘরের চারপাশে আলোটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে নিশ্চিত হলো, কেউ নেই ঘরে। বিছানার উপর স্থির হলো আলোটা। এলোমেলো চাদর দেখে বোঝা গেল ব্যবহার করা হয়েছে বিছানাটা।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল তারিক। রশিটা যে ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্যেই ঝোলানো হয়েছে সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই ওর মনে। মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে খুলল করিডরে বেরোবার দরজাটা। আলো দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। সবুজ চোখ দুটো চারদিকে ঘুরে এসে স্থির হলো ঘুমন্ত গার্ডের উপর। কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে চেয়ে থেকে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

করিডরের দুপাশে একের পর এক দরজা। সিঁড়ির কাছে যখন গার্ড রয়েছে, তখন এই ছয়তলারই কোন একটা ঘরে লুকিয়ে রয়েছে রানা শিখা শংকরকে নিয়ে। একটু দ্বিধায় পড়ল তারিক। কি করবে সে এখন? গার্ডটাকে ঘুম থেকে জাগালে চলবে না। প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকে রানার নাম ধরে ডাকাডাকি করা সম্ভব নয়। আবার নিজের পরিচয় না দিয়ে রানা যে ঘরে রয়েছে সেখানে ঢুকে পড়লে ছুরি খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভেবে-চিন্তে স্থির করল, আপাতত নিজের জন্যে একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর প্রত্যেকটা দরজায় পি. সি. আই. এজেন্টের সিগন্যাল টোকা দিলে কোন ঘরে রানা আছে সেটা বের করতে অসুবিধে হবে না খুব। পুরানো সিগন্যালটা নিশ্চয়ই মনে আছে রানার?

বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে করিডরের শেষ মাথার দুইপাল্লা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তারিক। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে কান পাতল। কোন শব্দ না পেয়ে পা বাড়াল সে অন্ধকার ব্যাংকোয়েটিং হলের ভিতর।

আঠারো

চামড়ার একটা হান্টিং জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে দোনালা বন্দুকটা কোলের উপর নিয়ে

দ্রুত নাস্তা সারছিল কাউন্ট হ্যান্স ফন কীসলার, কুকুর দুটোর জন্যে খচখচ করছিল বুকের ভিতরটা, এমনি সময়ে পিলে চমকানো খবর দিল ক্লিমেঞ্জা দৌড়ে এসে।

'ছয়তলার ব্যালকনি থেকে একটা দড়ি ঝুলছে, ইয়োর একসেলেন্সি!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ফন কীসলার।

'দড়ি ঝুলছে। কিসের দড়ি ঝুলছে?'

'মনে হচ্ছে, ছিল ওরা দুর্গের মধ্যেই।'

'মিস্টার জ্যাক ডজকে জানিয়েছ?'

'উনিই আমাকে ডেকে দেখিয়েছেন, ইয়োর একসেলেন্সি। আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।'

পড়ি কি মরি করে ছুটল ফন কীসলার। ছয়তলা থেকে নিচ পর্যন্ত ঝুলানো দড়িটা দেখে কপাল কুঁচকে উঠল ওর। দেখতে পেল কাছেই কালো শার্ট, কালো প্যান্ট আর কালো জুতো পরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক ডজ সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত।

'ঠিকই বলেছিলেন আপনি,' বলল ফন কীসলার। 'কাল রাত পর্যন্ত এখানেই ছিল ওরা। সিঁড়ির গোড়ায় গার্ডের ব্যবস্থা দেখে এইদিক দিয়ে পালিয়েছে জঙ্গলে।'

'হতে পারে।' একটা সিগারেট ধরিয়ে হাতের ইশারায় কাছে আসতে বলল ক্লিমেঞ্জাকে। 'রশিটা ধরে জোরে টানো দেখি?'

টানল ক্লিমেঞ্জা, শক্ত করে ধরে ঝুলে চাপ দিল, তারপর রশি ছেড়ে সরে দাঁড়াল। পরীক্ষা করে দেখল জ্যাক ডজ, শেষের গিঁঠটা হাত উঁচু করে আঙুলের মাথা দিয়ে স্পর্শ করা যাচ্ছিল, সেটা সেখানেই রয়েছে, এক ইঞ্চিও নিচে নামেনি। অর্থাৎ ধরে নেয়া যায়, কাল রাতে এই রশি শুধু ঝুলানোই হয়নি, ব্যবহারও করা হয়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেয়ালটা আর একবার পরীক্ষা করে নিয়ে ফন কীসলারের দিকে ফিরল ডজ।

'সূর্য উঠে গেছে, যথেষ্ট আলো হয়েছে, সার্চ শুরু হয়ে যাক। কি বলেন?'

'হ্যা। আধঘন্টার মধ্যেই রওনা হয়ে যাব আমরা সবাই। এবার যখন নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে ওরা জঙ্গলেই লুকিয়েছে, দুর্গের মধ্যে খোঁজাখুঁজির আর কোন দরকার নেই।' ডাইনিং হলের দিকে এগোতে শুরু করল সে জ্যাক ডজকে নিয়ে। 'এখানে আর বাজে সময় নষ্ট না করে সরাসরি জঙ্গলে ঢুকে পড়াই ভাল।'

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি চাই প্রত্যেকটা লোক, এমন কি বাবুর্চি পর্যন্ত যেন বেরিয়ে পড়ে সার্চে। আপনিও।'

'ঠিক বুঝলাম না।' ঘাড় কাৎ করে ডজের মুখের দিকে চাইল ফন কীসলার।

'চলুন, ঘরে গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি সব।'

ফিরে এসে স্ক্র্যাম্বলড এগের প্লেটটা সামনে টেনে নিয়ে বাম হাতে বাটার টোস্ট তুলল ফন কীসলার। জ্যাক ডজ বসল সামনের চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে। টোস্টে একটা কামড় দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে ফন কীসলার।

'আমার ধারণা, এখনও ওরা রয়েছে এই দুর্গের মধ্যেই,' নিচু গলায় বলল ডজ।

'ওদের ধরবার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে আমি ছাড়া আর সবার জঙ্গলে চলে যাওয়া।'

'এখনও দুর্গেই আছে!'

'আমার ধারণা। দড়িটা তো দেখেছেন। রানার পক্ষে ওটা বেয়ে নিচে নেমে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু আপনার কি মনে হয় শিখা শংকরের পক্ষে এটা সম্ভব? উঁহুঁ। এটা আমাদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না।'

'ধোঁকা দিয়ে লাভ? ওখান থেকে রশি ঝুলাতে যাবে কেন? আমরা তো জেনে ফেললাম যে ওরা ছয়তলাতেই রয়েছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি আমার সন্দেহের কথাটা আপনাকে না জানালে আপনি কি ভাবতেন?'

'ভাবতাম রশি বেয়ে নেমে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে ওরা। এখনও তাই ভাবি।'

'দ্যাটস গুড। ছয়তলা থেকে সিঁড়ি ছাড়া আর কোন পথ আছে নিচে নামার?'

'না! দড়ি অথবা সিঁড়ি বেয়ে নামা ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

'তাহলে বুঝতে হবে ছয়তলাতেই রয়েছে ওরা এখনও।'

'আপনার সন্দেহ নিরসনের সহজ পথ রয়েছে,' বলল ফন কীসলার! 'এক্ষুণি দশজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি ছয়তলায়, যদি থাকে, ধরে নিয়ে আসবে। কি দরকার তাহলে খামোকা জঙ্গলে ঘুরে যদি ওরা এই দুর্গেই...'

'রানা যদি একা থাকে, মারা পড়বে পাঁচজন; যদি তার সাথে আর একজন লোক থাকে, তাহলে সব ক'জনই মারা যাবে ওদের ধরতে গিয়ে। তিনটে লাশ গায়েব করাই কঠিন কাজ, তেরোটা লাশ আরও কঠিন হয়ে পড়বে।'

খাওয়া ভুলে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ফন কীসলার ডজের মুখের দিকে। তারপর বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না আমি। নিরস্ত্র মাসুদ রানা কি করে এতগুলো সশস্ত্র লোককে মারবে? তাছাড়া আর একজন লোক কোথায় পাচ্ছেন আপনি? কি বলছেন...'

'বুঝিয়ে বলছি।' একটু অসহিষ্ণু ভাব প্রকাশ পেল জ্যাক ডজের কণ্ঠে। সিগারেটটা ফেলে দিল গোটাদুই সুখটান দিয়ে। 'প্রথম কথা, একেবারে নিরস্ত্র রানা নয়। নানান ধরনের অস্ত্র টাঙানো রয়েছে দুর্গের প্রত্যেক তলার দেয়ালের গায়ে। ওর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র হয়তো নাও থাকতে পারে, কিন্তু পাঁচজন লোককে খতম করবার মত যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র পাবে সে দেয়াল হাতড়ালেই। দ্বিতীয়ত: রানার সুটকেস ঘেঁটে আপনি কোন অস্ত্র পাননি বলে ধরে নিচ্ছেন যে রানা নিরস্ত্র, কিন্তু আমি চোখ বুজে আপনার কথা মেনে নিতে রাজি নই। আজ ভোরে ওর সুটকেস সার্চ করেছি আমি নিজে। সুটকেসের তলায় একটা ফল্স্ বটম আছে। একটা স্প্রিঙে চাপ দিলেই খুলে যায় তলাটা। কি ছিল ওর ভেতর জানি না, কিন্তু এখন কিছুই নেই।'

দুই চোখ কপালে উঠল ফন কীসলারের।

'তার মানে পিস্তল থাকতে পারে ওর কাছে!'

'পারেই তো। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ও এক দুর্ধর্ষ এজেন্ট। বিপদে পড়লে কি করে রুখে দাঁড়াতে হয় তার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে। ওর বিরুদ্ধে দশজন লাগলে—পাঁচজন যে হারাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তৃতীয় যে সন্দেহটা আমার মনে আসছে, সেটা আরও ভয়ঙ্কর। আমার ধারণা, আরও লোক এসে যোগ দিয়েছে ওর সাথে। রশি টেনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ওটা ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ উঠে বা নেমে গেছে ওই রশি বেয়ে। নইলে গিঁঠগুলো যত শক্ত করেই বাঁধা হোক, নিচে থেকে টানলে ইঞ্চি দুয়েক নেমে আসত আরও খানিক চেপে বসে।'

'তাহলে তো আমাদের সমস্ত লোক এখন ছয়তলায় পাঠানো দরকার!' নাস্তা খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে ফন কীসলারের, ঠেলে সরিয়ে দিল প্লেটগুলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুমুক দিল কফির কাপে। 'সবাইকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলে তারপর? জঙ্গলে ওরা না থাকলে খামোকা ওখানে ঘুরে মরলে কি লাভ হবে?'

'ওরা যে জঙ্গলে নেই, ছয়তলার ওপরেই রয়েছে তার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সবই অনুমান। ওরা যদি সত্যি সত্যিই দড়ি বেয়ে নেমে জঙ্গলে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আপনার লোকদের হাতে ধরা বা মারা তো পড়ছেই, কিন্তু যদি ধোঁকা দেয়ার জন্যে রশি ঝুলিয়ে থাকে, যদি দুর্গেই থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে যেন ওরা মনে করে আমরা ঝুলানো রশি দেখেই নিঃসন্দেহ হয়ে সবাই মিলে জঙ্গলে গিয়েছি ওদের ধরতে। দুর্গে কেউ নেই, এই রকম একটা ভাব দেখাতে চাই আমি ওদের।'

'তাতে লাভ কি? গোঁপে তা দিয়ে বসে থাকবে ওরা ছয়তলার ওপর।'

'বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।' নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল ডজের মুখে। 'দুটো জিনিস ওদের দরকার: এক হচ্ছে, খাবার; দুই, টেলিফোন। এই দুটো কারণে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ওদের পক্ষে সম্ভব হবে না। নামতেই হবে নিচে। আমি অপেক্ষা করব নিচে ওদের জন্যে। একা।'

'ওরা নেমে এলে কি করবেন?'

'প্রথম সুযোগেই গুলি করব মাসুদ রানাকে। মেয়েটাকে এক্ষুণি মারা যাবে না। ফিল্মগুলো আমাদের হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কে জানে, হয়তো মিথ্যে বলেছিল নেবর। ফিল্মগুলো হাতে এসে গেলে ওকে খতম করে দিয়ে ফিরে যাব আমি প্যারিসে।'

'কিন্তু আপনার একা এখানে থাকা কি ঠিক হবে? অন্তত কয়েকজন লোক রাখা দরকার আপনার সঙ্গে।'

'কোন দরকার নেই,' মৃদু হাসল ডজ। 'আমি একাই একশো। তাছাড়া খুনের সাক্ষী রাখতে চাই না আমি। কাউকে বিশ্বাস করতে চাই না। তবে মজা দেখতে

যদি চান, আপনি থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার মত দেখতে কোন একজনকে আপনার পোশাক পরে সবার আগে আগে যেতে হবে জঙ্গলে। আমি চাই, ওরা জানুক কেউ নেই দুর্গে। আপনিও না।' আবার হাসল সে। 'কিং খেলা দেখার ইচ্ছে আছে?'

খেলা দেখবার জন্যে নয়, সাত-পাঁচ ভেবে দুর্গে থেকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ফন কীসলার। কখন কি অবস্থার সৃষ্টি হবে বলা যায় না। হয়তো রাতে গুলির আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীদের কেউ এসে হাজির হবে খোঁজ নিতে। কিংবা অন্য কোন লোক এসে হাজির হয়ে যাবে কোন কাজে। রানা, শিখা বা রেবরের সাথে দেখা করতে আসতে পারে তাদের পরিচিত কেউ। ওদের সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার জন্যে ওর থাকা দরকার দুর্গে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে ডজের কথায়, উঠে পড়ল উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

আধঘন্টার মধ্যেই সারাদিনের জন্যে তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই দুর্গ ছেড়ে। তেতলার জানালা দিয়ে দেখল জ্যাক ডজ, ঘুরে দাঁড়াল হাসিমুখে।

'এইবার?' জিজ্ঞেস করল ফন কীসলার।

এবার বসে থাকব আমরা শিকারের অপেক্ষায়। এখন থেকে আগামী তিনটে ঘন্টা টু শব্দ করা চলবে না।' শোলডার হোলস্টার থেকে একটা মাউযার বের করে এগিয়ে এল সে দরজার দিকে। নিঃশব্দে দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। ফন কীসলারের হাতে একটা ডাবল ব্যারেল আইহলিস শটগান। দুই ব্যারেলে দুটো এল. জি. কার্তুজ পোরা। প্রস্তুত।

হলরুমে চলে এল ওরা পা টিপে। সিঁড়ির কাছাকাছি দরজার একটা কপাট খুলে নিঃশব্দে একটা চেয়ার এনে রাখল জ্যাক ডজ। বসবার ইঙ্গিত করল ফন কীসলারকে। জায়গাটা এমন, যে সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামলে পরিষ্কার দেখা যাবে, কিন্তু সেই লোক দেখতে পাবে না ফন কীসলারকে। চেয়ারে বসে বন্দুকটা কোলের উপর রাখল ফন কীসলার। দেখল, নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেল ডজ হলরুম থেকে।

সিঁড়ির ওপাশের একটা ঘরে আধ-ভেজানো দরজার পাশে আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা একটা চেয়ারে বসল জ্যাক ডজ। এখান থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি, কিন্তু যে নামবে সে দেখতে পাবে না ডজকে। অথচ ডজ আর ফন কীসলার দেখতে পারে পরস্পরকে, প্রয়োজন হলে ইঙ্গিত বিনিময় করতে পারবে।

পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগাল ফন কীসলার। হঠাৎ ডজের উপর চোখ পড়তেই দেখতে পেল প্রবল ভাবে মাথা নাড়ছে জ্যাক ডজ। বিমর্ষ বদনে আবার যথাস্থানে রেখে দিল সে সিগারেটটা, সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে চেয়ে বসে রইল।

এই ধাপ বেয়ে নামবে মাসুদ রানা। লাল হয়ে যাবে কার্পেটটা রক্তে ভিজে। খানিক বাদেই।

*

ব্যাংকোয়েটিং হলের দরজা খোলার অস্পষ্ট মৃদু শব্দ কানে গেল রানার। শব্দটা এতই অস্পষ্ট যে টের পেল না শিখা। ওর বামবাহু স্পর্শ করল রানা একহাতে, অপর হাতের তর্জনী রাখল ওর ঠোঁটে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল শিখা।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানার সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল। বাম হাতে টর্চ। দরজাটা বন্ধ হওয়ার অস্পষ্ট শব্দ এল ওর কানে।

প্রায় দশ সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল একজন:

'রানা···আমি তারিক! ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার!'

নামটা শুনে একেবারে হতচকিত হয়ে গেল রানা। তারিক! এখানে? এখানে তারিক আখতার আসবে কি করে? অথচ কণ্ঠস্বরটা যে তারিক আখতারের তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ক্লিক করে রানার পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ হলো। নিস্তব্ধ কামরার মধ্যে এই শব্দটা মনে হলো বোমা ফাটার আওয়াজ।

'যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো,' বলল রানা। 'আমার হাতে পিস্তল আছে।'

'আমাকে চিনতে পারছ না, রানা?' অস্ফুট কণ্ঠে জানতে চাইল তারিক। 'আমার বিরুদ্ধে পিস্তল দরকার নেই তোমার।'

টর্চের বোতামে টিপ দিল রানা। উজ্জ্বল আলো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার উপর, একটু ডান পাশে সরে স্থির হলো তারিক আখতারের বিশাল শরীরের উপর। দু'হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে সে। আলোটা একটু নিচু করে রাখল রানা, যাতে তারিকের চোখ ঝলসে না যায়।

'তোমাকে এখানে দেখব কল্পনাও করতে পারিনি, দোস্ত,' বলল রানা। 'তুমি কি করছ এখানে?'

'আমার মনে হলো তোমার সাহায্য দরকার,' সহজ কণ্ঠে বলল তারিক।

হেসে উঠল রানা।

'দরকার বলে দরকার!' খানিক চুপ করে থেকে বলল রানা, 'বিশেষ করে এই অবস্থায় এর চেয়ে বেশি দরকার আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু তুমি কবে থেকে আবার আমার সাহায্যকারী হলে?'

'তুমি জানো, তোমার কাছে ঋণী আছি আমি।' মাথার উপর থেকে হাত নামাল তারিক।

'ঋণী!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'ওহ্-হো কর্নেল শেখ বুঝি স্বীকার করেছে যে আমার গুলিতে মারা যায়নি তোমার ভাই? কিন্তু তাতে ঋণী হবার কি আছে? ভাইটা তো আর বেঁচে যায়নি।'

'ইচ্ছে করলেই মেরে ফেলতে পারতে তুমি আমাকে সেদিন। বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে আমি এগিয়ে এসেছি আজ তোমার সাহায্যে।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা তারিকের দিকে, তারপর পিস্তলটা পকেটে পুরে এগিয়ে গেল কাছে। হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। আগ্রহের সাথে ওর হাত ধরে আন্তরিকভাবে ঝাঁকাল তারিক।

'ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার জন্যে আমি দুঃখিত,' বলল তারিক। 'কিন্তু…'

'কিন্তু যখন নিজের দেশের পক্ষ হয়ে কাজ করব, তখন প্রয়োজন হলে আমরা পরস্পরের শত্রু, এই তো?'

'হ্যাঁ। যদি কাজটা শত্রুতাপূর্ণ হয়, শত্রু; বন্ধুত্বপূর্ণ হলে বন্ধু। তখন আমরা দাবার ঘুঁটি…কিন্তু আজ মানুষ হিসেবে এসেছি আমি এক মহৎপ্রাণ মানুষের সাহায্যে লাগবার আশায়।'

'ভেরি গুড। থ্যাংকিউ। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই।' শিখার দিকে এগিয়ে গেল রানা ব্রিগেডিয়ারকে নিয়ে। আলোটা এমন ভাবে ধরল যাতে দু'জনেই দু'জনকে দেখতে পায়। 'শিখা, ইনি হচ্ছেন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাশালী ম্যাগনেট, ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। তারিক, ইনি হচ্ছেন ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রী শংকরলালজীর একমাত্র কন্যা, শিখা শংকর।'

বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পেল না তারিকের সবুজ চোখে। সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি সব জানি।' একটু থেমে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'তোমার সাথে কথা আছে আমার রানা। মেয়েটা বাংলা বুঝবে?'

'কিছু কিছু তো অবশ্যই বুঝবে। কেন? গোপন কথা?'

'না, মানে প্ল্যান-প্রোগ্রামের মধ্যে মেয়েমানুষকে না রাখাই ভাল। আমরা ওই ওখানে বসে কথা বলতে পারি।' হাতের ইঙ্গিতে ঘরের একটা কোণের দিকে দেখিয়ে ওখানে রাখা কয়েকটা চেয়ারের দিকে এগোল তারিক।

'তুমি এখানেই থাকো,' বলল রানা শিখাকে। 'ও কিছু কথা বলতে চায় আমার সাথে।'

'সাবধান!' বলল শিখা ফিসফিস করে। 'লোকটা ভয়ঙ্কর। বলছে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। লোকটা যদি ভালই হবে তাহলে এত রাতে প্রেতাত্মার মত কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে? কাউন্টের লোকই যদি না হবে…'

'খামোকা মাথা গরম কোরো না, শিখা,' বলল রানা। 'বহু বছর একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা। আমি ওকে ভাল করেই চিনি। একটু আবেগপ্রবণ, আর মেয়েমানুষকে দু'চোখে দেখতে পারে না—এছাড়া আর কোন দোষ নেই ওর মধ্যে। কোন ভয় নেই, তুমি এইখানেই অপেক্ষা করো, আসছি আমি।'

রানা এসে পাশের চেয়ারে বসতেই সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল তারিক আখতার। দু'জন দুটো ধরিয়ে চুপচাপ টানল আধমিনিট। সেই ফাঁকে কথা গুছিয়ে নিল তারিক।

'বিশ্বাস করতে পারো, একমাত্র তোমাকে সাহায্য করবার জন্যেই এসেছি আমি এখানে। আর কোন কারণ নেই।'

'কিন্তু কয়েক ঘন্টা আগেও কোন সাহায্যের দরকার ছিল না আমার। ভাবছি প্যারিসে বসে কি করে তুমি খবর পেলে যে আমার সাহায্য দরকার, আর এত অল্প সময়ে এসে হাজিরই বা হলে কি করে?'

খোঁচাটা বুঝতে পারল তারিক। রানাকে শান্ত করার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল উপরে।

'শংকরলালজীর প্যারিসে পৌঁছানোর খবর পেয়ে হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম আমি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, শংকরজীকে কোন রকম অসুবিধেয় না ফেলে আমার জানতে হবে, কেন তিনি এসেছিলেন প্যারিসে, কেন এইট মিলিমিটার মুভি প্রোজেক্টর নিয়ে তোমার সাথে গিয়ে দেখা করেছিল জটিলেশ্বর রায়, কেন তুমি চলেছ জার্মানীর গারমিশখে। ইচ্ছে করলেই যে কোন একজন এজেন্টের ওপর কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে গোঁফে তা দিতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু এর সাথে তুমি জড়িত, আমি নিজে আসাই স্থির করেছিলাম।'

'কতটা কি বুঝতে পারলে?'

'বেশ অনেকটা।' সিগারেটে টান দিল তারিক, উজ্জ্বলতর হলো সিগারেটের আগুন, সবুজ চোখ দুটো, নাক আর কপালের একটা অংশ আলোকিত হলো ম্লানভাবে। 'এই মেয়েটা একখানা পর্নোগ্রাফিক ফিল্ম তৈরি করেছে, এবং সেটার সাহায্যে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে তার বাবাকে। নীলছবি তুলেছিল উইলিয়াম নেবর বলে এক ফটোগ্রাফার। সন্ধের দিকে মারা গেছে সে আজ। ছবিটার ব্যাপারে শংকরজী গিয়েছিল প্যারিসে জটিলের কাছে সাহায্য চাইতে। জটিল বুঝতে পারল, অফিশিয়ালি সে তাকে সাহায্য করতে পারে না, তাই তোমার সাহায্য নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তুমি খোঁজখবর করে বের করে ফেললে কোথায় আছে শিখা শংকর, এসে হাজির হলে গারমিশখে। ব্যাপারটা কোনভাবে কানে গেল রুডল্ফ গুন্থারের। এ দুর্গ ওর। নিমন্ত্রণ করা হলো তোমাদের এখানে, নিজের অজান্তে ঢুকে পড়লে তোমরা বাঘের খাঁচায়। তোমাদের অনুসরণ করলাম আমি, অপেক্ষা করলাম বাইরে। দেখলাম, নেবরের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল একজন লোক, তোমারটাও চলে গেল একটু পরেই। দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। নিজের চোখে দেখলাম, গুলি করে মারল ওরা নেবরকে। মাঝরাতে তোমাকে ব্যালকনি থেকে দড়ি ঝুলিয়ে ওদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে দেখে বুঝলাম তোমার সাহায্য দরকার। তাই উঠে এলাম ওটা বেয়ে।'

হাসল রানা।

'শাবাশ। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে বহুদূর চলে এসেছ তুমি ঠিক ঠিক। নেবরের গাড়ি করে যে লোকটা গেল, সে গেল প্যারিস থেকে ফিল্মগুলো আনতে। একটা নয়, তিনটে ফিল্ম রয়েছে নেবরের ব্যাংকে। ওগুলো হাতে এসে গেলেই মেয়েটাকে খতম করে দেয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোন ছবি তুলতে না পারে।'

'আর তোমাকে?'

'আমাকেও চেষ্টা করবে।'

'তাহলে আর অপেক্ষা করবার দরকার কি? চলো, বেরিয়ে পড়ি,' বলল তারিক। 'দড়ি বেয়ে নেমে যাব আমরা। গেটের পাশে দারোয়ানদের ঘরে রয়েছে কারেন্টের সুইচ। তিনজন গার্ড রয়েছে সেই ঘরে। ওদের কাবু করা আমাদের দু'জনের পক্ষে পানির মত সহজ। গোলাগুলির শব্দ পাবে না কেউ—সাইলেন্সার রয়েছে আমাদের পিস্তলে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক ফাঁদ থেকে।'

'মেয়েটা নামতে পারবে না রশি বেয়ে।'

'তাতে কি এসে যায়? ওকে সাথে নেয়ার দরকার কি? ওকে রেখেই যেতে পারি আমরা।'

'তা হয় না। তাছাড়া এক্ষুণি রওনা হতে পারছি না আমি এমনিতেও। ফিল্ম তিনটে এলে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে তারপর যাব আমি এখান থেকে। কাজেই আগামী কাল সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে আমার।'

'আচ্ছা!' মাথা ঝাঁকাল তারিক আখতার। 'ব্যাপারটা সুইসাইডাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিনিময়ে টাকা পাচ্ছ বোধ হয়?'

'তা নইলে বেহুদা ঘাড় পাততে যাব কেন?'

'তাহলে টাকাটাই শুধু তোমার কনসিডারেশন হওয়া উচিত, মেয়েটাকে উদ্ধার করা তোমার অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে পড়ে না।'

'অর্থাৎ?'

'সহজ ব্যাপার। এখানেও দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছি আমি। গুন্থার হচ্ছে শংকরজীর চোরে-চোরে মাসতুত ভাই। সে যখন শিখা শংকরকে খুন করবার হুকুম দিচ্ছে, বুঝে নিতে হবে এতে ওর বাপেরও সায় আছে। বাপই যদি তার মেয়েকে শেষ করে দিতে চায়, তোমার অত মাথাব্যথা কিসের? ওকে উদ্ধার করে নিতে গেলে তোমার মনিব খুশি হবে না, লিখে দিতে পারি।'

'শংকরলাল আমার মনিব নয়, জেনে রাখো। এ-ও জেনে রাখো, দুইয়ে দুইয়ে সব সময় চার মেলানো যায় না, মাঝে মাঝে পাঁচও হয়ে যায় রিলেটিভিটির দৌলতে। সেই হিসেবে মেয়েটাকেও বের করে নিয়ে যাব আমি এখান থেকে।'

সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল রানা। খানিক চুপচাপ চিন্তা করে মুখ খুলল তারিক।

'তার মানে, ফিল্মগুলো না আসা পর্যন্ত তুমি থাকছ এখানেই। তারপর কি

করতে চাও?'

'ওগুলো নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাই।'

'কিভাবে?'

'যে ভাবে পারি। ভাবের অভাব হবে না। কাউন্টের ঘাড়ের ওপর পিস্তল চেপে ধরলেই সুড়সুড় করে নিজে ড্রাইভ করে বের করে দিয়ে আসবে আমাদের।'

'অর্থাৎ কাল সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে আমার এখানে।'

'সেটা তোমার খুশি। না থাকলেও পারো।'

'আমি না থাকলে তোমার চলবে না। তোমার হয়তো জানা নেই, জ্যাক ডজ বলে ভয়ঙ্কর এক খুনীকে ভাড়া করা হয়েছে তোমাদের শেষ করে দেয়ার জন্যে। দারুণ টিপ ওর হাতের। এতদূর থেকে এক গুলিতে নেকরকে ধরাশায়ী করল কে?—ওই জ্যাক ডজ। তোমার পিছন দিকে কেউ একজন গার্ড না দিলে নির্ঘাত মারা পড়বে তুমি ওর গুলি খেয়ে। সেজন্যেই আমাকে তোমার দরকার।'

হাতের তালু দিয়ে চোয়াল ঘষল রানা কিছুক্ষণ। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়। কাউন্টকে হঠাৎ বেকায়দায় ফেলে কাজ উদ্ধার করা এক কথা, কিন্তু একজন ভাড়াটে খুনীকে কাবু করা মোটেই সহজ কাজ নয়। কখন যে কোন দিক থেকে ট্রিগার টিপে দেবে হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে তার ঠিক নেই। প্রফেশনাল কিলারের চোখে ধুলো দেয়া অত সহজ হবে না। অনেকটা আপন মনে কথা বলে উঠল রানা।

'ফিল্মগুলো উদ্ধার আমাকে করতেই হবে। বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছে আমাকে জটিলেশ্বর। কাজে হাত দেবার আগেই। তিরিশ হাজার ডলার। ওর হাতে ফিল্মগুলো তুলে দিলে পাব আরও বিশ হাজার। খুব দরকার আমার এই টাকা। তার চেয়েও বেশি দরকার মানুষের চোখে আমার বা আমার দেশের সম্মান বজায় রাখা। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না মাসুদ রানা, কাজ না করেই মেরে দিল টাকা—এই কথা যেন কেউ বলতে বা ভাবতে না পারে। কাজেই অপেক্ষা আমার করতেই হবে।' গলার স্বর পরিবর্তন করল রানা। 'তুমি এক কাজ করো তারিক, খামোকা এখানে আটকে না গিয়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করো। অনেক সময় আছে হাতে আমার, একটা কিছু বুদ্ধি বের করে ফেলবই।'

'আমি থাকছি তোমার সঙ্গে।'

'থ্যাংকিউ। তাতে আমার উপকার বই অপকার নেই।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে, একেবারে খালিপেটে এত লম্বা সময়...'

'কাল একফাঁকে নিচ থেকে কিছু খাবার জোগাড় করে আনব।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'অনেক রাত পড়ে আছে এখনও। আশপাশের যেকোন ঘরে ঢুকে বিশ্রাম করে নিতে পারো।'

'বিশ্রাম দরকার নেই আমার। আমি পাহারায় থাকব। তোমরা খানিক গড়িয়ে নিতে পারো ইচ্ছে করলে।'

শিখাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রানা ব্যাংকোয়েটিং হল থেকে। করিডর ধরে

ফিরে চলল যে ঘরে আগে শুয়েছিল সেই ঘরের দিকে। গার্ডটা তেমনি ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। উল্টোদিকের একটা ঘরে ঢুকল এবার ওরা। দরজাটা সামান্য খোলা রাখল, কোন্ ঘরে ওরা ঢুকেছে তারিকের বুঝবার সুবিধের জন্যে।

'কিন্তু…' ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করল শিখা, 'কিন্তু পাকিস্তানী একজন ব্রিগেডিয়ার তোমাকে সাহায্য করবে কেন? ভবিষ্যৎ ব্ল্যাকমেইলিঙের জন্যে ওরা যে ফিল্ম তিনটে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না, তার ঠিক কি? ওর উদ্দেশ্য কি শুধু সাহায্য, না…'

'বেশি চিন্তা করে মাথাটা খামোকা গরম করো না, শিখা। ছোটখাট একটা ঘুম দাও, কাল সকালে উঠে দেখবে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'আমি ভাবছি পাকিস্তানীরা কি করে জানতে পারল আমার কথা।'

'আবার কথা! শুয়ে পড়ো ওই বিছানায়।'

'আর তুমি?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার পাশে রাখল রানা। বলল, 'আমি পাহারায় থাকব।'

বহুক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ ফিরে তারপর এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল শিখা। রানার ডাকে ঘুম ভাঙল ওর ভোর ছ'টায়। খড়খড়ি আর স্কাইলাইটের ফাঁক গলে দিনের আলো আসছে।

'উঠে পড়ো! পাঁচতলায় নেমে যাব আমরা।'

'সিঁড়ির গার্ড?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল শিখা। 'ঘুমাচ্ছে এখনও?'

'আধঘন্টা আগেই নেমে চলে গেছে নিচে। উঠে পড়ো, জলদি।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ঘরের ভিতর ঢুকল তারিক। দ্রুতহাতে বুকের কাপড় ঠিক করল শিখা।

'নিচে বেশ কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে,' বলল তারিক। 'এক্ষুণি হয়তো সার্চ শুরু হয়ে যেতে পারে। ব্যালকনিতে বাঁধা রশিটা দেখতে পেয়েছে ওরা।'

পা টিপে পাঁচতলায় নেমে এল ওরা। টয়লেট সেরে নিল তিনজন তিন বাথরুমে। আবার মিলিত হলো আধো অন্ধকার করিডরে। নিচতলা থেকে বাতাসে ভেসে এল ডিম ভাজার গন্ধ। জিভে জল এসে গেল রানার। ঢোক গিলে বলল, 'আমি দেখি কি করছে ব্যাটারা, এত শোরগোল কিসের।'

সিঁড়ি ঘরে এসে সাবধানে রেলিঙের উপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে নিচে কি চলছে বোঝার চেষ্টা করল সে, কিন্তু অনেক লোকের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ দোতলা থেকে ফন কীসলারের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। উঁচু গলায় হুকুম দিচ্ছে সে: সবাইকে যেতে হবে জঙ্গলে। দুর্গ পাহারার আর কোন দরকার নেই।'

'চার-পাঁচজনকে রেখে যাই এখানে?' বলল একজন।

'না। জঙ্গলে চলে গেছে ওরা দড়ি বেয়ে নেমে, এখানে বসে মাছি মারবার

দরকার নেই কারও। কাউকে রেখে যাওয়ার দরকার নেই। প্রত্যেকে যাব। বাবুর্চি পর্যন্ত। আমি লিড করব। সবাইকে বন্দুক নিয়ে তৈরি হতে বলো। তিনঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে ওদের।'

ফিরে এসে তারিককে সিঁড়ির দিকটা নজর রাখতে বলে করিডর ধরে কিছুদূর এগিয়ে ডানদিকের একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকল সে, সেখান থেকে ছয় ধাপের একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এল একটা ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ড লাগানো টানা বারান্দায়। ব্লাইণ্ডের ফাঁকে চোখ রেখে দুর্গের খিলান থেকে শুরু করে একেবারে জঙ্গল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ লন দেখা যায়।

মিনিট দশেক পর লোক বেরোতে শুরু করল। পাঁচজন ছয়জন করে এককে দলে বেরিয়ে আসছে মানুষ দুর্গ থেকে। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। দ্রুতপায়ে জঙ্গলের দিকে হাঁটছে। মোটা এক লোককে হাঁসফাঁস করে এগোতে দেখে চিনতে পারল রানা—বাবুর্চি। মিনিট দশেক পর ফন কীসলারকে দেখতে পেল সে। ঘোড়ায় চেপে দ্রুতবেগে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে, পিঠে বন্দুক।

শেষ লোকটা জঙ্গলে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল রানা বারান্দায়, দুর্গ থেকে আর কোন লোক বেরোবে না বুঝতে পেরে ফিরে এল সে। করিডরে সপ্রশ্ন নয়নে অপেক্ষা করছে শিখা, সিঁড়িঘরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে তারিক আখতার। রানাকে দেখে সরে এল এপাশে, মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখলে।'

'মোট তেত্রিশ জন দেখলাম জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। কাউন্ট গেল ঘোড়ায় চেপে, বাকি সবাই পায়ে হেঁটে। তুমি কিছু টের পেলে?'

'তিনজন লোক এসেছিল। তুমি ওদিকে যাওয়ার পর পরই। সোজা ছয়তলায় উঠে গেল ওরা, পিছু পিছু গেলাম। কিছু না, রেলিঙে বাঁধা দড়িটা খুলে নিয়ে নেমে চলে গেল। সার্চ করবার প্রয়োজন বোধ করছে না ওরা, ধরেই নিয়েছে রশি বেয়ে নেমে জঙ্গলে চলে গেছ তোমরা।'

'ট্র্যাপও হতে পারে।' বলল রানা। 'নইলে রশিটা খুলে নেয়ার কি দরকার ছিল?'

'হতে পারে।' মাথা ঝাঁকাল তারিক। 'তোমার রশি ঝোলানোর মতই হয়তো এটা ওদের একটা চাল। হয়তো জ্যাক ডজকে রেখে গেছে, নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নামতে গেলেই গুলি খাবে। চলো, বের করে ফেলি শালাকে।'

মাথা নাড়ল রানা।

'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। যথেষ্ট সময় আছে আমাদের হাতে। আমাদের অপেক্ষায় নিচে কেউ ঘাপটি মেরে বসে নাও থাকতে পারে, কিন্তু যদি থাকে, তাকে ঘণ্টাখানেক উদ্বিগ্ন হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। আমরা যেমন জানি না, ও-ও তেমনি জানে না সত্যিই আমরা দুর্গেই রয়ে গেছি কিনা। ওর স্নায়ুর ওপর খানিকটা অত্যাচার করে নেয়া যাক খানিকটা চুপচাপ থেকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল আরিক আখতার।

'ঠিক আছে, আমি এখানেই থাকি, তুমি নজর রাখো বাইরের দিকটায়। কেউ ফিরে আসে কিনা জানা দরকার।'

'হ্যাঁ।' শিখার দিকে ফিরল রানা। 'চলো, পালা করে পাহারা দেয়া যাবে।'

ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ড দিয়ে ঘেরা বারান্দায় চলে এল ওরা। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল অলস ভঙ্গিতে। এদিক ওদিক চাইল চেয়ারের আশায়।

তাড়াহুড়োয় কোন মানে হয় না। অপেক্ষা করবে সে।

উনিশ

বসে আছে জ্যাক ডজ। মূর্তির মত স্থির। কোলের উপর মাউযার।

বিশাল দুর্গ একেবারে নিশ্চুপ। শুধু একটা দাদার আমলের দেয়াল ঘড়ি টিক টিক করে চলেছে দোতলার কোথাও। শিকারের প্রতীক্ষায় কিংবা গভীর নিস্তব্ধতায় অভ্যস্ত সে, কিন্তু ঘড়িটার একটানা টিক টিক শব্দ বিরক্ত করে তুলল ওকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে ঠিক নেই। যখনই হোক, রানা যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবে তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখন?

ক্লিমেঞ্জাকে বলে দেয়া হয়েছে লাউড স্পীকারে ডাকা না হলে যেন ওর লোকজন কেউ সন্ধের আগে দুর্গে ফিরে না আসে। দরকার হলে রানার জন্যে সারাদিন অপেক্ষা করবে সে। নেমে রানাকে আসতেই হবে, কিন্তু কখন, সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ও যদি মনে করে যে দুর্গের সবাই চলে গেছে জঙ্গলে তাহলে একঘণ্টার মধ্যেই ফাঁদে এসে ধরা দেবে, কিন্তু যদি সন্দেহ করে যে আরও লোক এখানে থেকে যেতে পারে, তাহলে সহজে নামবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খিদের জ্বালায় নেমে তাকে আসতেই হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত টুঁ শব্দ না করে অপেক্ষা করতে রাজি আছে সে। কিন্তু একটা সন্দেহ এসে দেখা দিচ্ছে ওর মনে—রানা যদি আঁচ করে যে নিচে ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্যে তাহলে কি করবে? ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে রয়ে যাবে ছয়তলায়, নাকি কৌশল খুঁজবে আক্রমণের? কি অস্ত্র রয়েছে ওর কাছে, পিস্তল, ছুরি, না দেয়াল থেকে খসিয়ে নেয়া কোন কুঠার বা বর্শা?

সিগারেটের তৃষ্ণা লেগেছে ওর বেশ অনেকক্ষণ হয়। কিন্তু সিগারেট ধরালেই টের পেয়ে যাবে মাসুদ রানা যে নিচে লোক আছে। সিগারেটের নেশা, সেই সাথে ঘড়ির টিক টিক মিলে মেজাজটা খিচড়ে উঠতে চাইছে ওর। সিঁড়ির উপর এক চোখ রেখে বসে রইল সে ঠায়। একবার ভাবল পা টিপে গিয়ে ঘড়িটা বন্ধ করে দিয়ে

আসবে কিনা, কিন্তু ইচ্ছেটা সাথে সাথেই তাড়িয়ে দিল সে। রানাও নিশ্চই শুনতে পাচ্ছে শব্দটা, বন্ধ হলেই সাবধান হয়ে যাবে।

হঠাৎ ঘণ্টা পড়তে শুরু করল ঘড়িতে ডজকে চমকে দিয়ে। আটটা বাজল। তারপর চলল আবার সেই একঘেয়ে টিক টিক। মিনিটের পর মিনিট কাটল। তারপর আবার চমকে উঠল সে নয়টা বাজার সময় সংকেত শুনে। পরমুহূর্তে দোতলার টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল। হাত নেড়ে চুপচাপ বসে থাকবার ইঙ্গিত করল সে ফন কীসলারকে। তিন মিনিট পর থেমে গেল ফোনের রিঙ। স্পষ্ট অনুভব করল ডজ, ওর ইস্পাৎদৃঢ় স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসছে ক্রমে। বার দুই মনে হলো যেন মৃদু খশখশ শব্দ শুনতে পেয়েছে সে সিঁড়ির কাছে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। আধমিনিট অপেক্ষায় থেকেও যখন আর কোন আওয়াজ পায়নি, তখন বসে পড়েছে সে আবার, নিজের অজান্তেই হাতটা চলে গেছে পকেটে, সিগারেটের প্যাকেট বের করে এনেই হঠাৎ খেয়াল হয়েছে খাওয়া যাবে না, মনে মনে গোটা কয়েক গালি দিয়ে রেখে দিয়েছে প্যাকেটটা আবার। সিগারেট খাওয়ার জন্যে মনটা বড়ই আনচান করছে ওর।

নামছে না কেন? টের পেয়ে গেল? আক্রমণ এলে কোন্ দিক থেকে আসবে?

ফন কীসলার ব্যাটাই বা ওরকম ঝিমোচ্ছে কেন? ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? না, নড়ে উঠল। পিছন ফিরে চাইল একবার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারল ডজ, কিছু একটা ঘটেছে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু বসে পড়ল আবার ফন কীসলারকে বসতে দেখে। কান খাড়া করে কি যেন শুনবার চেষ্টা করছে ফন কীসলার। শক্ত করে চেপে ধরেছে বন্দুক।

ঢং ঢং করে বেজে উঠল দশটার সময় সংকেত।

এমনি সময় ডজের কানে গেল টোকার আওয়াজ।

•

পৌনে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার পর রানা স্থির করল যথেষ্ট হয়েছে, এবার কাজে নামতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে শিখাকে ওর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করে বলল, 'নজর রাখো, আমি তারিকের সাথে আলোচনা করে একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলি। এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে অপেক্ষা করা যায় না। কাউকে দুর্গের দিকে আসতে দেখলেই খবর দেবে আমাদের।'

করিডর ধরে নিঃশব্দ পায়ে চলে এল সে তারিক আখতারের কাছে। সিঁড়ির থেকে বেশ কিছুটা সরে গেল ওরা।

'এবার একটা কিছু করতে হয়,' বলল রানা। 'কোনও আওয়াজ পেয়েছ?'

'না।'

'আর সময় নষ্ট করা যায় না। হয়তো সত্যিই দুর্গ ছেড়ে সবাই চলে গেছে জঙ্গলে। বলা যায় না। কেউ যদি থাকে, আমার বিশ্বাস, তাকে পাব তেতলায়। নিশ্চয়ই হলরুমে বসে নজর রেখেছে লোকটা সিঁড়ির ওপর। সত্যিই কেউ আছে

কিনা দেখতে হবে এখন। আবার একটা দড়ি ঝুলিয়ে নেমে যাচ্ছি আমি।'

মাথা নাড়ল তারিক।

'বিপজ্জনক হবে। ওভাবে নামতে গেলে কিছু না কিছু শব্দ হবেই। টের পেয়ে গেলে মারা পড়বে নির্ঘাত।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল তারিক, 'আমরা তো এখন পাঁচ তলায়?'

তারিকের মতলব আঁচ করে বলল রানা, 'হ্যাঁ। আর একটা তলা নিশ্চিন্তে নেমে যেতে পারি আমরা।'

'তারপর ডাইভারশন তৈরি করা যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। পা টিপে নেমে এল ওরা চারতলায়। দু'জনের হাতেই বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। নেমেই ভ্রূ নাচাল তারিক। অর্থাৎ, জানতে চায় রানার মাথায় কোন প্ল্যান এসেছে কিনা। ওকে টেনে নিয়ে সিঁড়িঘর থেকে বেশ কিছুদূর সরে এল রানা। কানের কাছে নিয়ে এল মুখটা।

'তুমি ব্যালকনিতে গিয়ে রেলিঙের ওপর টোকা দিতে শুরু করো পিস্তলের বাঁট দিয়ে। শব্দটা কিসের জানতে হবে ওর। ওকে দেখামাত্রই খুব তাড়াতাড়ি তিনটে টোকা দেবে তুমি, এইভাবে।' তারিকের হাতের উপর টোকা দিয়ে দেখাল রানা। 'আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকব, তোমার সিগন্যাল পেলেই দৌড়ে নেমে যাব নিচে।'

'ঠিক আছে।'

নিঃশব্দে একটা দরজা খুলে ভিতরে চলে গেল তারিক। ফন কীসলার যে হলঘরে বসে আছে, ঠিক তার উপরেরটায়। রানা এসে দাঁড়াল সিঁড়িঘরে। হাতে পিস্তল। প্রস্তুত। লক্ষ করল, হৃৎপিণ্ডের গতি বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে ওর।

ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাটা খুলতে গিয়ে কয়েক পা এগিয়েই ছোট্ট একটু হোঁচট খেল তারিক আখতার। আধহাত জিভ কেটে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল সে, কয়েক সেকেণ্ড থেমে থেকে আবার এগোল। নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলে চলে এল ব্যালকনিতে। রেলিং টপকে কার্নিসের উপর শুয়ে পড়ল সে লম্বালম্বি হয়ে, মাথা বাড়িয়ে দেখল নিচটা। তারপর পিস্তলের বাঁট দিয়ে টোকা দিতে শুরু করল কার্নিসের গায়ে অসমান তালে।

শব্দটা কানে যেতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাক ডজের একহারা পেটা শরীর। ফন কীসলারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে হাতের ইশারায় বসতে বলল। কান খাড়া করে শুনল সে শব্দটা। কয়েকবার হয়েই থেমে গেল আওয়াজ। ঘড়িদাদা শুধু টিক টিক করছে একমনে। আর সব নিস্তব্ধ।

কিসের শব্দ? কোনও পাখি? জলের ফোঁটা পড়ছে শুকনো পাতার উপর?

এক মিনিট পেরিয়ে গেল। কোন আওয়াজ নেই। দুই মিনিট ঋজু ভঙ্গিতে বসে থেকে কান খাড়া রাখল ডজ, তারপর ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় মনে করে শিথিল করল শরীরটা। কপালের ঘাম মুছে সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিয়েই মন

খারাপ হয়ে গেল তার। বের করে আনল হাত। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটা তীক্ষ্ণ ছুরি হয়ে বিঁধল ওর কলজের মধ্যে।

আরও তিন মিনিট পেরিয়ে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারল ডজ, এইভাবে আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলেই স্নায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে তার। ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে এই নীরব প্রতীক্ষা।

হঠাৎ আবার শুরু হলো টোকা।

উঠে পড়ল জ্যাক ডজ। ফন কীসলারকে সিঁড়ির দিকে নজর রাখবার ইশারা করে নিঃশব্দ পায়ে চলে এল করিডরে। ঢুকে পড়ল হলরুমে। থেমে গেছে আওয়াজটা। ইশারায় ব্যালকনির দিকে দেখাল ফন কীসলার। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ।

পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জ্যাক ডজ। আবার শুরু হয়েছে টোকা। শব্দটা বাইরে থেকে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলল দরজার। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে সামান্য ফাঁক করল কপাট। চোখ রাখল ফাঁকে। ব্যালকনি ফাঁকা। কেউ নেই ওখানে। থেমে গেছে টোকা। চারদিক নিস্তব্ধ।

ব্যাপার কি? পিছন ফিরে ফন কীসলারকে দেখল ডজ। সিঁড়ির দিকে বন্দুক বাগিয়ে ধরে বসে আছে সে। আধ-খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। কোন গতিবিধি নেই সেখানে। ট্র্যাপ? কেউ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে? ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে আক্রমণের প্ল্যান করেছে মাসুদ রানা?

ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চাইল ডজ। কেউ নেই কোথাও। ভৌতিক কারবার নাকি! কেউ নেই তো শব্দটা এল কোনখান থেকে? মিনিট তিনেক অপেক্ষা করে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল জ্যাক ডজ। পাঁই করে ঘুরল। আবার টোকা। উপর দিকে!

রেলিঙের উপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না সে। ওকে দেখেই চট করে মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে তারিক, দ্রুত তিনটে টোকা দিল কার্নিসের গায়ে। জেদ চেপে গেল ডজের, ব্যাপার কি দেখতেই হবে ওর। রেলিং টপকে এক পা কার্নিসে রেখে আরেক পা দিয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরে চিৎ হয়ে ঝুঁকল সে বাইরের দিকে। পিস্তলটা তাক করে ধরা আছে উপর দিকে।

নিচে কি অবস্থা দেখবার জন্যে মাথাটা সামনে বাড়িয়েই চট করে পিছিয়ে গেল তারিক। গুলি করল ডজ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফন কীসলার। ঝট করে ঘুরল ব্যালকনির দিকে।

একেক বারে তিন ধাপ করে ডিঙিয়ে দৌড়ে নেমে এল রানা। এক ঝলক দেখতে পেল ফন কীসলারকে। আঁৎকে উঠল সে ওকে দেখে। এইলোক এখানে কি করে এল! তাহলে ব্যালকনির কাছে কি আরেকজন? কিন্তু বিস্মিত হওয়ার সময় নেই এখন। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফন কীসলার পিছন ফিরে। ব্যালকনির

দিকে এগোতে যাচ্ছিল, এক লাফে এগিয়ে এসে বাম হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরল রানা ওর, হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল সিঁড়িঘরে।

বন্দুকটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েই কনুই চালাল ফন কীসলার। পাঁজরের উপর কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে 'হুঁক' করে উঠল রানা। ঢিল হয়ে যাওয়া হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে রুখে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ফন কীসলার, ল্যাং খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ল মেঝের উপর। সেই সাথে দড়াম করে প্রচণ্ড এক রদ্দা পড়ল ঘাড়ের পাশে। ধাঁই করে এক লাথিতে ফন কীসলারের লম্বা নাকটা সমান করে দিল রানা। শুনতে পেল, ডাকছে জ্যাক ডজ।

'কাউন্ট! কাউন্ট!'

গুলিটা করেই টের পেয়েছে জ্যাক ডজ, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলি। চট করে রেলিং ডিঙিয়ে চলে এল এপারে। জানা গেছে কোথায় রয়েছে মাসুদ রানা। কাজেই আর লুকোছাপার দরকার নেই, সরাসরি আক্রমণ করবে সে এবার। দু'জনের বিরুদ্ধে একজন···আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে মাসুদ রানা। কিন্তু···কাউন্ট গেল কোথায়? চেয়ার খালি! পালাল নাকি? দ্রুতপায়ে এগোল সে সিঁড়ি ঘরের দিকে, ডাকল।

কথা বলে উঠতে যাচ্ছিল ফন কীসলার, দড়াম করে পড়ল আরেক লাথি। উপর-নিচে চারটে-চারটে আটটা দাঁত খসে গেল কাউন্ট ফন কীসলারের। জ্ঞান হারাল সে। বগলের নিচে দু'হাত ভরে টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে রানা, বাম হাতে জাপটে ধরল পেছন থেকে, ডান হাতে পিস্তল। হলরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল জ্যাক ডজ। সামনের দৃশ্য দেখে 'চারো চাক্কা জাম' হয়ে গেল ওর, থমকে দাঁড়িয়ে গেল ব্রেকচাপা গাড়ির মত। দুই চোখে অবিশ্বাস। মাসুদ রানা এইখানে···তাহলে গুলি করল সে কাকে! শিপ্রা শংকর, নাকি আরও কেউ আছে এদের সাথে?

'পিস্তল ফেলে দাও জ্যাক ডজ?' গম্ভীর রানার কণ্ঠস্বর।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিল ডজ মুহূর্তে। বীভৎস হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। পিস্তলটা তাক করে রেখে মাথা নাড়ল।

'এটা মাউযার, মাসুদ রানা। কাউন্টের আড়ালে থেকেও পার পাবে না···তুমি গুলি করলেই আমিও গুলি করব, ফুটো হয়ে যাবে দু'জনেই। ভাল চাও তো ফেলে দাও পিস্তল।'

তারিক আখতারকে দেখতে পেল রানা। রশি বেয়ে নেমে এসেছে ব্যালকনিতে। কপাল থেকে কলকল করে রক্ত ঝরছে। হিংস্র চিতার মত এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ পায়ে, দ্রুত। জ্যাক ডজের চোখ থেকে চোখ সরাল না রানা। আর কয়েকটা সেকেণ্ড ওকে গুলি করা থেকে বিরত রাখতে পারলে···

'একজনকে মারতে গিয়ে যদি তোমরা দু'জন মরতে চাও আমার আপত্তি

নেই। কিন্তু তার চেয়ে আমরা একটা সমঝোতায় আসতে পারি…'

'কোন সমঝোতা নয়,' রানার দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করল ডজ। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমি বেপরোয়া লোক! যদি বাঁচতে চাও, ফেলে দাও পিস্তল!'

আর দশটা সেকেণ্ড!

'ঠিক আছে, ডজ,' বলল রানা, 'হার মানছি আমি। ফেলে দিচ্ছি পিস্তল। কিন্তু…'

জ্যাক ডজের বাম চোখটা কানা, জানে তারিক, তাই বাম দিক থেকে এগিয়ে আসছিল সে, কিন্তু দেখতে না পেলেও পায়ের শব্দে টের পেয়ে গেল ডজ।

পাঁই করে ঘুরেই গুলি করল ডজ, কিন্তু তার আগেই 'খুক' করে কেশে উঠল রানার হাতের ওয়ালথার পি.পি. কে.। কনুইয়ের কাছ দিয়ে ঢুকে ডান হাতের কব্জির কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল ডজের গুলি, পিস্তলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা বাম হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিল সে, পা দিয়ে চেপে ধরল তারিক ওর হাতটা।

ফন কীসলারকে ছেড়ে দিতেই হুড়মুড় করে পড়ল সে জ্যাক ডজের পায়ের উপর। মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে ব্যালকনিতে চলে এল রানা, নাইলনের কর্ট ধরে কয়েকটা ঝাড়া দিতেই খসে এল চারতলার রেলিঙের গায়ে আটকানো রাবার মোড়া হুক। ফিরে এসে দেখল শরীরের সমস্ত ভার ডজের বাম হাতের কব্জির উপর চাপিয়ে দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে তারিক, কিন্তু বিন্দুমাত্র ছটফট করছে না লোকটা, তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিষ চোখে নিয়ে চেয়ে রয়েছে ওর চোখের দিকে। খুনের প্রতিজ্ঞা দেখতে পেল রানা ওর চোখে।

দুই মিনিটেই হাত পা বাঁধা হয়ে গেল দু'জনের। উঠে দাঁড়াল রানা। হাসল তারিকের দিকে চেয়ে।

'কপালে কি হয়েছে?'

'ও কিছু না, কার্নিসে গুলি লেগে প্লাস্টার ছিটে এসে লেগেছিল। কিন্তু রশিটা তো কেটেকুটে সর্বনাশ করলে, এখন দেয়াল টপকে বেরোবে কি করে?'

'দেয়াল টপ্‌কাবার দরকার পড়বে না। নাও, একটাকে আমি নিচ্ছি, আরেকটা তুমি নাও কাঁধে।'

পাঁচতলায় উঠেই ভীতচকিত শিখাকে দেখতে পেল রানা করিডরে।

'তুমি এখানে কি করছ?' বলল রানা। 'তোমাকে না জঙ্গলের দিকে নজর রাখতে বলেছি?'

'আমি…আমি ভেবেছিলাম…' ঢোক গিলল শিখা। 'গুলির আওয়াজ শুনে…'

'এখন তো দেখলে বেঁচে আছি আমরা। যাও, কেউ ফিরে আসছে কিনা দেখো। এ দুটোকে লুকিয়ে রেখেই নেমে যাব আমরা নিচে।'

আসবাবপত্রে ঠাসা একটা মস্ত ঘরে ফন কীসলার আর জ্যাক ডজকে এমন ভাবে শোয়ানো হলো যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। টর্চ ধরে আছে রানা

তারিককে বলল, 'আরও কয়েকটা চেয়ার টেবিল টেনে দাও এদিকে। সন্ধের আগে যেন খুঁজে না পাওয়া যায় এদের।'

জ্বলছে ডজের চোখটা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'নিস্তার নেই তোর, শুয়োরের বাচ্চা! তোকে আমি...'

কথা শেষ করতে পারল না ডজ, ঝট করে দুইপা এগিয়ে এসে ওর মুখের উপর পা তুলে দিল তারিক আখতার। রানা ধরে ফেলবার আগেই জোরে একটা চাপ দিয়ে মড়মড় করে ভেঙে দিল সামনের দাঁত কয়টা। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ডজ। ওর পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ঢুকিয়ে দিল হাঁ করা রক্তাক্ত মুখের ভিতর। ফন কীসলারের মুখের মধ্যেও একটা রুমাল পুরে দিয়ে গোটা কয়েক চেয়ার টেবিল টেনে এনে দেহ দুটো ভালমত লুকিয়ে বেরিয়ে এল ওরা বাইরে।

শিখা জানাল, কাউকে আসতে দেখা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। দ্রুতপায়ে নেমে এল ওরা নিচে। রান্নাঘরের ফ্রিজ থেকে যে যা পেল লুটপাট করে খেয়ে নিল। তারপর তারিকের দিকে ফিরল রানা।

'ওই ওপাশের গ্যারেজে রয়েছে সাদা মার্সিডিস। ওটা নিয়ে এসো তুমি, আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামছি এখুনি।'

'গেটের গার্ডগুলো?' ভুরু নাচাল তারিক আখতার।

পিস্তলের উপর দুটো চাপড় দিল রানা। বলল, 'সেটা তেমন কোন সমস্যা হবে না। আমরা দু'জন আছি।'

'আর ফিল্মগুলো?' এবার প্রশ্ন করল শিখা।

'ওগুলো ভাবছি এয়ারপোর্ট থেকেই উদ্ধার করব। কাউন্ট আর ডজকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এখন কি করতে হবে সে হুকুম দেয়ার মত কেউ থাকবে না এদের মধ্যে। যখন ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে, আর যতক্ষণে ওরা হুকুম দেয়ার মত মানসিক অবস্থা ফিরে পাবে, তার অনেক আগেই এসে যাবে ফিল্মগুলো আমাদের হাতে। যে লোকটাকে পাঠানো হয়েছে তাকে কেউ সাবধান করতে পারছে না, কাজেই অসুবিধে নেই।' তারিকের দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি বলো?'

'এগ্রীড। আমি গাড়ি আনতে চললাম।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে দুই হাতে দুই সুটকেস বয়ে নেমে এল রানা গাড়ি বারান্দায়। পিছন পিছন নেমে এল শিখা। সুটকেস দুটো গাড়ির বুটে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠবার ইঙ্গিত করল রানা শিখাকে।

'তুমি চালাও। জঙ্গলের মধ্যে বাধা পড়লে দুটো পিস্তলই ব্যবহার করতে হবে আমাদের।'

শিখা উঠল ড্রাইভিং সীটে, পিছনের সীটে বসল ওরা দু'জন। চলতে শুরু করল গাড়িটা। জঙ্গলের মধ্যে কারও দেখা পেল না ওরা। গেটের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামাবার নির্দেশ দিল রানা।

'আমরা দু'জন নেমে যাব এখানেই। আমি হুইসেল দিলেই রওনা হবে তুমি

গেটের দিকে।'

'একা থাকব? যদি আমার কোন বিপদ হয়?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল শিখা।

'হলে প্রাণপণে চ্যাঁচাবে, উড়ে এসে হাজির হয়ে যাব আমরা।' হাসল রানা। 'বিপদ হলে আগেই হতে পারত, এখন আর কোন ভয় নেই। কাঁচ তুলে ভেতর থেকে লক করে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকো।'

দ্রুতপায়ে জঙ্গলের কিনারে চলে এল ওরা। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে দু'জনের হাতেই। গজ ত্রিশেক সামনেই দেখা যাচ্ছে বিশাল গেট। তার পাশেই গার্ডরুম।

'তুমি পেছন দিয়ে ঘুরে যাও,' বলল রানা। 'ঠিক দু'মিনিট পর এগোতে শুরু করব আমি।'

এই সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। কারণ একজনকে পাহারায় রেখে বাকি দু'জন খেতে বসেছিল তখন। সেই পাহারারত একজনও আবার বাইরের চেয়ে খাবারের দিকেই নজর রেখেছিল বেশি।

রানার পায়ের প্রচণ্ড এক লাথিতে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। চমকে উঠেই আড়ষ্ট হয়ে গেল সব ক'জন রানার হাতের পিস্তলটা দেখে। ঠিক এমনি সময় ওপাশের দরজাটা খুলে গেল তারিকের এক লাথিতে। সবকটা চোখ ঘুরল সেদিকে। ওপাশে যমদূতের মত আরেকজন পিস্তলধারীকে দেখে খটাশ করে মেঝেতে পড়ল প্রহরীর হাতের অটোমেটিক রাইফেল। ছানাবড়া চোখে চাইছে ওরা পর্যায়ক্রমে একবার রানা, আর একবার তারিকের মুখের দিকে।

'কারেন্ট অফ করো!' গর্জে উঠল তারিক আখতার।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সবচেয়ে বয়স্ক গার্ড। প্রায় ছুটে গিয়ে টেনে নামিয়ে দিল একটা থ্রী-ফেজ সুইচের লিভার। তিন মিনিট লাগল ওদের তিনজনকে বেঁধে ফেলতে। জোরে একটা শিস দিল রানা, ঘড়ঘড় শব্দে গেট খুলতে শুরু করল তারিক।

ঘণ্টা খানেক পর মিউনিখ এয়ারপোর্টের কার পার্কে এসে ঢুকল সাদা মার্সিডিস। চালাচ্ছে মাসুদ রানা।

'ওই যে।' চেঁচিয়ে উঠল শিখা। 'ওই আমাদের হোণ্ডা স্পোর্স কার!'

সত্যিই গাড়ির ভিড়ে দেখা গেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল গাড়িটা।

মার্সিডিসের পিছনের সীটে তারিক ঝুঁকে এল সামনে।

'শোনো, বাকিটুকু আমার ওপর ভার দিতে পারো নিশ্চিন্তে। তোমাদের চিনে ফেলবে লোকটা, কিন্তু আমাকে চিনতে পারবে না।'

'কিভাবে কি করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি কি প্ল্যান করেছি শোনো...'

সীটবেল্ট খুলতে খুলতে মুচকে হাসল ক্লিক বর্গ। কাজটা সুসম্পন্ন করে ভালয় ভালয় মিউনিখে ফিরে আসতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে ওর। ব্যাপারটার

সাথে মাসুদ রানা জড়িত ছিল বলেই আসলে মনে মনে একটা ভয় ছিল ওর, ফিল্মগুলো ব্যাংক থেকে তুলবার সময় কিংবা তার পরে হোটেলে ফিরবার সময় হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার সময় হঠাৎ আক্রমণ আসতে পারে। প্লেনটা মিউনিখে ল্যাণ্ড করতেই পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরে এল ওর। লাল গাড়িটায় চেপে একঘণ্টার মধ্যে ভোঁ করে পৌঁছে যাবে সে ওবারমিটেন দুর্গে।

কাস্টমসের বেড়া ডিঙিয়ে এপারে এসেই বিশাল এক দৈত্যের সামনে পড়ল ক্লিকি বর্গ। সবুজ, তীক্ষ্ণ চোখে আপাদমস্তক দেখল লোকটা ওকে। ইশারায় কাছে ডাকল।

'তোমার নাম ক্লিকি বর্গ?' জিজ্ঞেস করল তারিক। রানার কাছে নামটা জেনে নিয়েছে সে।

'ইয়েস, স্যার।' তারিকের মিলিটারি ভাবচক্কোর দেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল ক্লিকি বর্গ।

মাথা ঝাঁকাল তারিক।

'এদিকে বিপদ হয়েছে। তোমাকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে আমাকে কাউন্ট।'

'বিপদ!' জ্রজোড়া চুলের সীমানায় গিয়ে পৌঁছল বর্গের।

'আমার সাথে এসো।'

কথাটা বলেই পিছন ফিরল তারিক, ক্লিক বর্গ অনুসরণ করছে কি করছে না দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। দ্রুত পায়ে এগোল সে মার্সিডিসের দিকে। ও জানে, ওকে অনুসরণ করতে বর্গ বাধ্য।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বর্গ প্রথমটায়। কে এই লোক? একে পাঠাল কেন কাউন্ট? কি বিপদ হয়েছে দুর্গে? একরাশ প্রশ্ন আর আশঙ্কার ছায়া জাগল ওর মনে। কিন্তু লোকটাকে ঘুরে রওনা হয়ে যেতে দেখে পিছু নিতে বাধ্য হলো সে। কয়েক পা এগিয়ে সাদা মার্সিডিসটা চিনতে পেরে সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল ওর। দৈত্যের মত লোকটা উঠে বসেছে ড্রাইভিং সীটে। কোনমতে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল সে পিছনের সীটে। পার্কিং বে থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। বর্গ লক্ষ্য করল, যে গাড়িতে করে সে গতকাল এয়ারপোর্টে এসেছিল, সেটা এখন আর কার পার্কে নেই।

'যদি কিছু মনে না করেন...' বিনয়ের সাথে কথা শুরু করতে যাচ্ছিল ক্লিকি বর্গ, মাঝপথেই থামিয়ে দিল ওকে তারিক আখতার। ও জানে মুখ ফসকে কোন বেমক্কা কথা বেরিয়ে গেলে ধরে ফেলবে বর্গ। কথা না বলাই ভাল।

'মনে করব,' বলল সে। 'ড্রাইভ করতে করতে কথা বলতে বা শুনতে পছন্দ করি না আমি।'

ব্রিফকেসটা কোলের উপর রেখে চুপচাপ বসে রইল ক্লিকি বর্গ। মনে মনে দৈত্যের মত লোকটার গাড়ি চালনার প্রশংসা না করে পারল না। মিউনিখ শহরে

পৌঁছে দক্ষ হাতে মন্থর ট্রাফিকের ভিড় কাটিয়ে গারমিশখের রাস্তা ধরল মার্সিডিস. খানিক এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ধরবে ওবারমিটেন কেল্লার পথ। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে স্পীড তুলে ফেলল তারিক নব্বই কিলোমিটারে। তুফান বেগে ছুটছে গাড়ি।

হঠাৎ ডানদিকের উইং মিররে চোখ পড়তেই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ক্লিকি বর্গের। লাল একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে ঠিক মার্সিডিসের পিছনেই। খানিকটা সামনে ঝুঁকে ভাল করে লক্ষ করেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্ব শরীর।

সেই গাড়িটাই! ঝট করে পিছন ফিরল সে। পরিষ্কার চিনতে পারল মাসুদ রানা আর তার পাশে বসা মেয়েটাকে। এদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল দুর্গে। বেরিয়ে এল কিভাবে! এতগুলো লোক এদের আটকে রাখতে পারল না! আর এই গাড়িটা? এই গাড়িটাতে করেই ওকে পাঠানো হয়েছিল এয়ারপোর্টে। কার পার্কে রেখে প্যারিস গিয়েছিল ও। ওখান থেকেই সংগ্রহ করেছে ওরা গাড়িটা। তার মানে এয়ারপোর্ট থেকেই অনুসরণ করা হচ্ছে ওদের।

ঘেমে উঠল ক্লিকি বর্গ।

'পিছনে···পেছনের গাড়িটা···'

কটমট করে চাইল তারিক ঘাড় ফিরিয়ে। হিম হয়ে গেল বর্গের কলজেটা।

'চুপচাপ বসে থাকো!' বলেই ঘাড় ফিরিয়ে নিল তারিক।

কিছুদূর গিয়েই বাম দিকে একটা সরু রাস্তা পেয়ে গতি কমিয়ে মোড় নিল মার্সিডিস, আরও কিছুদূর গিয়ে আর একটা মোড় নিয়ে থেমে দাঁড়াল। বড় রাস্তা থেকে দেখা যায় না এ জায়গাটা।

'প্যারিসের ব্যাংক থেকে যে প্যাকেটটা এনেছ, ওটা বের করো!' বজ্রকণ্ঠে হুকুম করল তারিক।

লাল গাড়িটা থেমে দাঁড়াল মার্সিডিসের পিছনে। রানা নেমে এল ড্রাইভিং সীট থেকে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চাইল বর্গের মুখের দিকে।

'কিছুদিন আগে পরিচয় হয়েছিল একবার, মনে আছে?'

একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ক্লিকি বর্গ, কোন জবাব দিতে পারল না।

'ফিল্মগুলো তোমাকে দিয়েছে?' তারিককে জিজ্ঞেস করল রানা। 'দেয়নি এখনও···দেবে।'

তিন সেকেণ্ড ইতঃস্তত করে কাঁপা হাতে ব্রিফকেস খুলল ক্লিকি বর্গ। ছোট্ট একটা সীলমোহর করা চারকোনা প্যাকেট বের করল সে। হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল তারিক আখতার।

আলগোছে পিস্তলটা বেরিয়ে এল রানার পকেট থেকে। হাতটা নিচু করে রাখল সে, কিন্তু ব্যাপারটা চোখ এড়াল না তারিকের। অবাক হয়ে চাইল সে রানার মুখের দিকে, তারপর হাসল।

'দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করো না তুমি, তাই না, রানা?' প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে।

'তুমি করো?' বাম হাতে প্যাকেটটা নিয়ে হাসল রানাও। দুঃখিত। তবে আমার ধারণা জিনিসটা আমার চেয়ে তোমার অনেক বেশি দরকার। আমি যদি এর বিনিময়ে দশ লাখ ডলার চাই, এক বাক্যে রাজি হয়ে যাবে তুমি। তাই না?'

'সত্যি বলতে কি, ঠিক এই প্রস্তাবটাই দেব বলে মনে মনে ভাবছিলাম আমি।'

'প্রস্তাবে রাজি না হলে যদি আবার পিস্তল বের করবার কথা মনে আসে, তাই একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম।'

'পিস্তল আমি বের করব না, রানা। কিন্তু পাকিস্তানের জন্যে ওই ফিল্মগুলো কতটা দরকার তা তোমাকে বোঝাবার ভাষা আমার নেই। তুমি তো টাকার বিনিময়েই নিয়েছিলে কাজটা হাতে…যদি বহুগুণ বেশি টাকা…নাহ্, তোমার যা খুশি। তোমাকে কোন প্রস্তাবই দেব না আমি।'

'এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। সবাইকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না।' লাল গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। প্যাকেটটা দেখাল শিখাকে। 'এই প্যাকেটই না?'

'হ্যাঁ!' ছোঁ মেরে প্যাকেটটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল শিখা, কিন্তু চট করে হাত সরিয়ে নিল রানা। অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাইল শিখা রানার মুখের দিকে। 'প্লীজ! ওটা আমাকে দিয়ে দাও রানা। ওগুলো আমার।'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা।

'তোমার জন্যে উদ্ধার করা হয়নি এটা, শিখা। কথা দিয়েছি, তোমার বাবার হাতে তুলে দেব আমি এই প্যাকেট।' হাসল। 'তোমাকে আগেও বলেছি, বিনিময়ে আরও বিশ হাজার ডলার পাব আমি।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শিখার মুখটা।

'তোমার দুটো হাত ধরছি, রানা। দয়া করো। বাবা যদি ওগুলো দেখে, আত্মহত্যা করব আমি। সত্যি বলছি, আত্মহত্যা করব!'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা শিখার চোখের দিকে। যেন ভিতরের মনটা দেখার চেষ্টা করছে সে। আশ্চর্য শান্ত, অথচ তীব্র সে দৃষ্টি। নরম গলায় বলল, 'কথাটা আগে ভাবা উচিত ছিল না তোমার? এত লজ্জার কি আছে? বিরোধী দলের কাছে তো ওগুলো পাঠাতে যাচ্ছিলেই।'

'কক্ষনো না! বিশ্বাস করো। শুধু বাবাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে উইলির জন্যে টাকা আদায়ের জন্যে করেছিলাম আমি এই কাজ…তাও সজ্ঞানে নয়, এল. এস.ডি খেয়ে উন্মত্ত অবস্থায়। পরে লজ্জায় মরে গেছি, ফিল্মগুলো ফেরত দেয়ার জন্যে পা পর্যন্ত ধরেছি উইলির। প্রথম ছবিটাও আমাকে না বলেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ও। বিশ্বাস করো, শুধু বাবা বলে নয়, ওই ছবিগুলো কোন মানুষ দেখেছে ভাবতেও পারি না আমি।' কাঁদতে শুরু করল শিখা। 'প্লীজ, রানা! দিয়ে দাও।'

প্যাকেটটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। তারপর আবার চাইল শিখার চোখে।

'কি করবে এগুলো নিয়ে?'

'নষ্ট করে ফেলব। সত্যি বলছি, নষ্ট করে ফেলব ওগুলো।'

'আবার ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করবে না?'

কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারল না শিখা। দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁদল। তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, 'আর কোন দাবি নেই আমার কারও ওপর, রানা। কেউ নেই আমার যার ওপর অত্যাচার করে কিছু আদায় করবার চেষ্টা করব। সত্যি, নষ্ট করে দেয়ার জন্যেই চাইছি আমি ওগুলো।'

জটিলেশ্বরকে কি বলবে ভেবে নিল রানা মনে মনে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নিজের ভুল যখন বুঝতে পেরেছ, নাও তুমি এগুলো। নিয়ে পালাও এখান থেকে। জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি নষ্ট করবে ততই তোমার জন্যে মঙ্গল।' প্যাকেটটা শিখার হাতে দিয়ে হাসল রানা। 'ইচ্ছে করলে দশ লক্ষ ডলারে বিক্রি করতে পারো প্যাকেটটা ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের কাছে। বেচবে?'

রানার হাতের উপর হাত রাখল শিখা। দৃষ্টি বিস্ফারিত, স্থির।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, রানা। এখন লজ্জা আর অসম্মানের হাত থেকে বাঁচালে। তোমার কাছে মিথ্যে বললে যেন আমার চির নরকবাস হয়। তোমার গা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, আমার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমি। কোটি ডলার পেলেও বেচব না এটা। আমি জানি কতটা ত্যাগ স্বীকার করে আমার হাতে তুলে দিচ্ছ তুমি এই প্যাকেট। তোমার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না আমি। দয়া করে অবিশ্বাস কোরো না আমাকে।'

'ভেরি গুড গার্ল। তোমাকে বিশ্বাস করছি আমি।' শিখার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। 'এবার ভাগো।'

মার্সিডিসের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। বুট থেকে শিখার সুটকেসটা বের করে লাল গাড়ির সীটের উপর নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল।

'এই ব্যাটার কি ব্যবস্থা করা যায়?' জিজ্ঞেস করল তারিক।

'চলো, আরেকটু এগিয়ে যাওয়া যাক,' গাড়িতে উঠে বসল রানা। 'হাত-পা বেঁধে ফেলে দেব ব্যাটাকে কোন ঝোপের ধারে। ওকে খুঁজে পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিস কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবার আগেই প্লেনে চেপে পগার পার হয়ে যাব আমরা।'

লাল গাড়িটাকে স্টার্ট নিয়ে বড় রাস্তার দিকে ঘুরতে দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল তারিকের চোখ।

'পালাচ্ছে!'

'হ্যাঁ।'

'ফিল্মগুলো দিয়ে দিলে পাজি মেয়েটার হাতে? কিছুটা চোখের পানি ফেলল, আর গলে গেলে?'

'ওগুলো ওরই প্রাপ্য। পাজি আর নেই মেয়েটা, জোর ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে গেছে। নষ্ট করে ফেলবে ও ফিল্মগুলো।'

'এত পরিশ্রম করলে…কি লাভ হলো শেষ পর্যন্ত? জটিল রায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারবে আর? কি পেলে তুমি, রানা, এত কষ্ট স্বীকার করে?'

'আনন্দ।' সিগারেট ধরাল রানা। 'চলো, এগোও।'

হাত-পা বেঁধে একটা বড়সড় ঝোপের আড়ালে নামিয়ে দেয়া হলো ক্লিকি বর্গকে। তারপর ফিরে চলল সাদা মার্সিডিসটা এয়ারপোর্টের দিকে। তুমুল বেগে ছুটল তারিক, কিন্তু লাল গাড়িটার চিহ্নও দেখা গেল না। ওটা ছুটেছে আরও জোরে।

বিশ

'মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন, স্যার।'

ইন্টারকমে ভেসে এল আসমা শেরির সুললিত কণ্ঠস্বর। চমকে উঠল বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে বসা দু'জন। একজন জটিলেশ্বর রায়, অপরজন দিল্লী থেকে সদ্য আগত শংকরলালজী। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে কারও কথায় কান না দিয়ে ছুটে এসেছে সে আবার প্যারিসে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যেই মাত্র মাথা নেড়ে জটিল রায় জানিয়েছে যে এখন পর্যন্ত মাসুদ রানার কোন খবর নেই, ওমনি ইন্টারকমের মাধ্যমে ভেসে এসেছে সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর: মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন, স্যার।

এদিক ওদিক পালাবার পথ খুঁজল শংকরলালজী। উঠে দাঁড়িয়েছে এক লাফে।

'ওই লোকটার মুখোমুখি হতে চাই না আমি, জটিল। এ ঘর থেকে বাইরে বেরোবার আর কোন পথ নেই?'

'না।' মাথা নাড়ল জটিলেশ্বর। 'ওই দরজা দিয়েই বেরোতে হবে। আপনি যদি বলেন ওকে পরে আসতে বলতে পারি।'

'না, না। পরে না। এখনই বলুক ও যা বলার। ওর বক্তব্য শোনার জন্যে দিল্লী থেকে ছুটে এসেছি আমি। তোমার ঘরে লুকাবার কোন জায়গা নেই?' আলমারিগুলোর দিকে চাইল শংকরলালজী।

শংকরলালজীর এই বিচলিত ভাব দেখে যার-পর-নাই অবাক হলো জটিলেশ্বর, কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছে বুঝবার চেষ্টা করল গভীর দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লোকটার কপাল ঘেমে উঠতে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল ওর মনের মধ্যে কি চলছে। চট করে উঠে দাঁড়াল সে।

'আপনি ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন,' বলল সে। 'আমি টেনে দিচ্ছি পর্দা।'

পর্দা টেনে দিয়ে নিজের সীটে ফিরে এসে বসল জটিলেশ্বর, ইন্টারকমের সুইচ টিপে বলল, 'ভেতরে আসতে বলো।'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল রানা। মুখে মৃদুহাসি। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে বসল একটা চেয়ারে। হালকা বাদামী টুইডের স্যুট আর রক্ত-লাল টাইয়ে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল রানা, তারপর দৃষ্টি এসে স্থির হলো জটিল রায়ের চোখে।

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল জটিলেশ্বর। 'ফিল্মগুলো উদ্ধার করতে পারলেন?'

'প্রথমেই কঠিন একটা প্রশ্ন করে বসেছেন,' বলল রানা। 'উত্তরটা হচ্ছে—হ্যাঁ এবং না। উদ্ধার করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সাথে করে আনতে পারিনি, ওগুলো ফিরিয়ে দিয়েছি শিখা শংকরকে।'

প্রথমে বিস্ফারিত হয়ে গেল জটিল রায়ের চোখ, তারপর সংকুচিত হলো ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠায়।

'আপনি ঠাট্টা করছেন আমার সাথে?'

'কাজের ব্যাপারে ঠাট্টা-তামাশা আমি একটু কমই করি।'

'তাহলে শিখা শংকরের হাতে ফিল্মগুলো দিয়েছেন, তার মানে কি?'

'মানে যা বলছি তাই। বিশ্বাস না হয় পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। সে ছিল সামনে। ওর সাহায্যেই উদ্ধার করেছিলাম ওগুলো। কিন্তু শিখা এমন হৃদয় বিদারক কান্না শুরু করল যে আর স্থির থাকা গেল না। ভেবে দেখলাম, শংকরলালজীর মত হীনচরিত্রের জঘন্য এক লোকের হাতে তুলে দেয়ার চাইতে ওগুলো তার শুধরে যাওয়া মেয়ের হাতে দেওয়াই ভাল।'

'কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!' রানার কথা শুনে একেবারে হকচকিয়ে গেল জটিলেশ্বর। 'তার মানে, যে কাজের ভার নিয়েছিলেন সেটা করতে পারেননি আপনি?'

'করতে পারিনি তা বলব না আমি। আপনি ইচ্ছে করলে বলতে পারেন। ছবির রিল তিনটে উদ্ধার করেছিলাম আমি। শুধু তাই নয়, অনেক কিছু জানতে এবং বুঝতেও পেরেছিলাম। আপনার হারামী বন্ধুকে বলে দিতে পারেন, আর কোন গোলমাল হবে না শিখার তরফ থেকে···নিশ্চিন্তে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে সে। ছবিগুলো নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। শিখা প্রতিজ্ঞা করেছে আমার কাছে: জীবনে কোনদিন আর ঘাঁটাবে না ওর খুনী বাবাকে, কোনদিন আর একটাও নীলছবি তৈরি করবে না, ছয়মাসের মধ্যে মনের মত একটা ছেলে ধরে বিয়ে করে সংসারী হবে। এটাকে ঠিক "করতে পারিনি" বলা যায় না। কি বলেন?'

'কি সব আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন আপনি আমাকে, মিস্টার মাসুদ রানা? আপনাকে অ্যাডভান্স ত্রিশ হাজার ডলার দেয়া হয়েছিল, কথা ছিল ছবিগুলো আমার হাতে তুলে দিলে আরও বিশ হাজার ডলার দেয়া হবে। এখন কি সব আবোলতাবোল কথা নিয়ে এসেছেন? আজেবাজে কথা রেখে সহজ ভাষায় বলুন, এনেছেন ফিল্মগুলো?'

'না। তবে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন সেটা আমি ঠিকই সুসম্পন্ন করেছি। ব্ল্যাকমেইল তো দূরে থাক, বাপের ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না শিখা জীবনে আর।'

'প্রমাণ কোথায়? আপনার মুখের কথায় হয়তো কিছুটা আস্থা আমি রাখতে পারি, কিন্তু ওই পাজি মেয়ের প্রতিজ্ঞার কতটুকু মূল্য? এসব জোলো কথা আদায় করবার জন্যে তো আপনাকে পাঠানো হয়নি, মিস্টার মাসুদ রানা!' নিভুনিভু চুরুটটা সরাল সে দাঁতের ফাঁক থেকে। 'যেমন করে পারেন ওকে ধরে নিয়ে আসবার কথা ছিল। কোথায়?'

'ইচ্ছে করলেই আনতে পারতাম, কিন্তু আনিনি। কার কাছে ধরে নিয়ে আসব আমি শিখাকে? ভুল করেছিল শিখা ঠিকই, তাই বলে জবাই হয়ে যাওয়ার জন্যে কসাইয়ের হাতে ওকে তুলে দেয়ার পক্ষপাতি আমি নই।'

'কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।' চশমাটা ঠিক করে বলল, 'হেঁয়ালি ছেড়ে দয়া করে পরিষ্কার করে বলুন।'

'আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি, আপনার জানা নেই, আপনার বন্ধু রুডলফ গুন্থারকে লাগিয়েছিল শিখার পেছনে। ওকে হত্যা করবার জন্যে। আমাদের তিনজনকে বন্দী করা হয়েছিল গুন্থারের ওবারমিটেন দুর্গে। নিজের দোষে মারা গেছে একজন, আমরা দু'জন বহুকষ্টে উদ্ধার পেয়েছি ওখান থেকে।' এইটুকু বলে যথেষ্ট সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা, তারপর আবার চোখ তুলল। 'কি? এখনও হেঁয়ালি মনে হচ্ছে আমার কথাগুলো?'

ভিত পর্যন্ত কেঁপে গেল জটিলেশ্বরের। বলে কি! নিজের মেয়েকে খুন করবার চেষ্টা করেছে শংকরলালজী! ওর সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গুন্থারকে ভার দিয়েছে সমস্যা সমাধানের! রানার চোখের দিকে চেয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারল সে একটি কথাও মিথ্যা বলছে না রানা এই মুহূর্তে। আধ মিনিট চুপচাপ থেকে তারপর মুখ খুলল সে।

'কি কি ঘটেছে সব খুলে বলুন তো, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'বলতেই এসেছি,' নড়েচড়ে বসল রানা। আগাগোড়া প্রত্যেকটি ঘটনা বলে গেল সে।

দুই হাতের তালুর উপর চিবুক রেখে চুপচাপ শুনল জটিলেশ্বর। শুধু গভীর রাতে রানার হোটেল কামরায় শিখার প্রবেশ ঘটতেই সচেতন হয়ে উঠল সে, পর্দার ওপাশে বসে সব শুনছে শংকরলালজী। কাপড় ছেড়ে শিখা যখন রানার বিছানায় উঠে পড়ল, তখন নরম কণ্ঠে ঘটনাটা ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল। নেবরের মৃত্যুর জায়গায় এসে গাল দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হলো জটিল রায়ের, কিন্তু বর্ণনায় কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করে শুনে গেল চুপচাপ।

'কাজেই,' বক্তব্য শেষ করল রানা এভাবে, 'যখন দেখলাম লজ্জায় একেবারে মিশে যাচ্ছে মাটিতে, যখন বুঝলাম সত্যিই ঘেন্না ধরে গেছে ওর বাপের ওপর, প্রতিজ্ঞা ও সত্যিই রাখবে, তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফিল্মগুলো তুলে দিলাম

আমি ওর হাতে। কাজটা আপনার পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু আমার যেটা উচিত বলে মনে হয়েছে তাই করেছি। আমার মনে হয়, শাস্তি যা পাওয়ার পেয়ে গেছে, আপনার বন্ধুরও আর উচিত হবে না ওর পেছনে লাগা।'

চশমা ঠিক করল জটিলেশ্বর। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল পুরো একটা মিনিট। তারপর মুখ খুলল।

'প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনাদের বন্দী বা নেবরকে খুন করার পেছনে শংকরলালজীর হাত আছে?'

'পারব। কিন্তু করব না। শিখার যদি ইচ্ছে থাকত খুনের দায়ে ওর বাপকে ফাঁসাবার, বলা যায় না, হয়তো সাহায্য করতাম। লোকটা নীচ জানতাম, কিন্তু এতই নীচ কল্পনা করিনি। যাই হোক, ওর মত আরও হাজার হাজার লোক আছে এই দুনিয়ায়, সবার পিছনে লেগে বেড়ানো আমার কাজ নয়।'

'শিখা কোথায় এখন?'

'প্যারিসে। খানিক আগেই ফোন করে জানিয়েছে আমাকে, সব শোনার পরও ওকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছে ওর ফিয়াঁসে। আগামী শুক্রবার ঠিক হয়েছে বিয়ের দিন।' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল, 'এবার উঠতে হয়।'

চতুর একটুকরো হাসি খেলে গেল জটিলেশ্বরের ঠোঁটে।

'একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ফিল্ম তিনটে শংকরলালজীর হাতে তুলে দিতে না পারলে তার কাছ থেকে বাকি টাকা বের করা যাবে না।'

'বের করবার দরকার নেই,' বলল রানা মৃদু হেসে। পকেট থেকে একটা মোটাসোটা প্যাকেট বের করল। 'শিখার হাতে যখন ওগুলো তুলে দিই তখনই বুঝে নিয়েছি আমি সেটা। যদি আপনি সাধাসাধি করতেন, তাও আর টাকা নিতাম না আমি। কোন কোন টাকায় বেজায় দুর্গন্ধ থাকে, কিছুতেই কাছে রাখা যায় না।' প্যাকেটটা থপ করে টেবিলের উপর ফেলল রানা জটিলেশ্বরের সামনে।

'কি আছে এতে?' প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল জটিলেশ্বর।

'আপনাদের দেয়া তিরিশ হাজার ডলার। এ টাকা কিছুতেই হজম হবে না আমার, তাই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'গুডবাই অ্যাণ্ড গুডলাক। জন্ম আর মৃত্যুর মতই খালি হাতে এসেছিলাম, খালি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছি—মাঝে দেখে নিলাম জীবনটা।'

'এত টাকা কোথায় পেলেন আপনি!'

'দেশ থেকে। আমার কাজের গুরুত্ব বুঝতে পেরে এ টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। টাকার কাঙাল আর নই এখন আমি।'

দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল রানা এমনি সময় আর থাকতে না পেরে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল শংকরলালজী পর্দার আড়াল থেকে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছিল পিস্তল, সেটা আবার হোলস্টারে পুরে দিয়ে আপাদমস্তক দেখল সে বিশাল চেহারার লোকটাকে, তারপর ফেটে পড়ল

প্যারিসে।

'ভালই হলো,' বলল রানা, 'জীবনে যেসব কথা শোনাবার সুযোগ পেতাম না কোনদিন, সেগুলো শুনিয়ে দেয়া গেছে আজ কায়দা মত। বিশ্বাস করুন, আপনার সম্পর্কে আমার প্রত্যেকটি মন্তব্য, অভিযোগ আর ধারণার কথা উচ্চারণ করতে আমার কষ্ট হয়েছে। মানুষের নীচতার কথা বলতে গেলে নিজের মনটাও ছোট হয়ে যায়।'

'যা বলেছ ঠিকই বলেছ, বাবা। একটা কথাও মিথ্যে বলোনি। শিখাকে হত্যা করার প্ল্যান ছিল গুন্থারের, আমি অনুমতি দিয়েছিলাম। এতবড় পাবাণের কাজ আমি কি করে করলাম এখনও বুঝতে পারছি না, কিন্তু সত্যিই করেছি আমি। এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে হতবুদ্ধি হয়ে সায় দিয়েছিলাম ওর কথায়। এখন বুঝতে পারছি কি করেছি, তখন থেকে দাউ দাউ জ্বলছে আমার বুকের ভেতরটা। পাগলের মত ছুটে এসেছি প্যারিসে।' পকেট হাতড়াতে শুরু করল, 'এই দেখো, মিউনিখের টিকেট। জর্জেস ফাইভ হোটেলে গুন্থারকে না পেয়ে আজই সন্ধের ফ্লাইটে রওনা হচ্ছিলাম আমি গারমিশখের উদ্দেশে।' রানার হাত ধরে ফেলল শংকরলালজী। 'তোমার কাছে আমি যে কতখানি ঋণী হয়ে রইলাম তা বলে বোঝাতে পারব না, বাবা। তুমি শিখাকে বাঁচিয়েছ, আমাকে রক্ষা করেছ অনন্ত নরক-যন্ত্রণা থেকে, ওকে সৎপথে পথে এনেছ—তোমার দানের তুলনা নেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, এবার আমাকে একটু ঠিক পথে আসবার সুযোগ দাও, বাবা!'

ভ্যালা বিপদ!—ভাবল রানা। এ যে রীতিমত নাটক শুরু করে দিয়েছে! মেলোড্রামা! কি বলবে বুঝে পেল না সে কিছুক্ষণ। কড়া একটা জবাব এসে যাচ্ছিল জিভের ডগায়, কিন্তু একটা চেয়ারে বসে পড়ে শংকরজীকে দুই হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সামলে নিল। বুঝতে পারল, সত্যিই, ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে লোকটা। অনুশোচনার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরছে। এই পাকা বুড়োকে সে কি সাহায্য করতে পারে বুঝে উঠতে পারল না রানা।

'আপনার খাতিরে শিখাকে উদ্ধার করিনি আমি,' বলল সে। 'তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি আমি পরিষ্কার। আপনার স্নেহের জন্যে কাঙাল ছিল বলেই আপনার ওপর অত্যাচার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা ছিল ওর। কিন্তু আপনার নিষ্ঠুর আচরণ উপলব্ধি করে একেবারে নৈরাশ্যের সাগরে ডুবে গেছে মেয়েটা। যদি পারেন, বাঁচান ওকে।'

'ওর সাথে যেমন করে পারি আপোষ করে নেব আমি, বাবা। কিন্তু তোমাকে তো আর হাতের কাছে পাব না কোনদিন। তুমি যদি তোমার প্রাপ্য টাকা না নাও...'

'ফিল্মগুলো আপনার হাতে তুলে দিইনি আমি, কাজেই ও টাকা আমার প্রাপ্য নয়।'

'কিন্তু যেজন্যে ওগুলো আমি চাইছিলাম সে উদ্দেশ্য তো পূর্ণ হয়েছে। তুমি যে

সুসমাধান দিয়েছ, এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতেই পারে না। আমিও বাঁচলাম, শিখাও বাঁচল—সব কূল রক্ষা পেল। এত বিরাট একটা কাজ করবার পর তুমি যদি ঘৃণাভরে আমার টাকা ফেরত দাও, তাহলে কোনদিনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না আমি। আমি খারাপ লোক, স্বীকার করি, নিজের উন্নতির জন্যে অনেক স্বার্থপর কাজ করেছি আমি, বন্ধুর গলায় ছুরি চালাতেও বাধেনি আমার। কিন্তু ওটা রাজনীতিরই অঙ্গ। আমি আগে ছুরি না মারলে সে মারবে আমাকে। বিশ্বাস করো, রাজনীতিতে যেটুকু নোংরামি সবাই করে, সেটুকুই করি আমি, তার বেশি নয়। ব্যক্তিগত জীবনে অতটা খারাপ আমি ছিলাম না, শুধু ....'

রানাকে একটু নরম হয়ে আসতে দেখে ড্রয়ার থেকে বিশ হাজার ডলারের একটা বাণ্ডিল বের করে ত্রিশ হাজারের প্যাকেটের উপর রাখল জটিলেশ্বর, ঠেলে খানিকটা এগিয়ে দিল সামনে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'নিচ্ছি আমি ওগুলো। কিন্তু আপাততঃ থাক ওগুলো জটিল বাবুর ড্রয়ারেই। শিখার বিয়ের দিন আমার হয়ে পাঠিয়ে দেবেন ওগুলো যৌতুক হিসেবে। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

'আপনি নিজ হাতে দিলে ভাল হত না?' জিজ্ঞেস করল জটিলেশ্বর।

'প্যারিসে থাকছি না আমি সে সময়ে।'

এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল রানা। খশখশ করে একটা চিঠি লিখল সংক্ষেপে। সাদা প্যাডটা জটিলেশ্বরের দিকে ঠেলে দিয়ে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

•

রানাকে দেখেই রুলারটা তুলে নিতে যাচ্ছিল আসমা শেরি, কি ভেবে বিরত থাকল, আরও কি ভাবল সে-ই জানে, হাসল রানার চোখের দিকে চেয়ে।

কথায় আছে বানর লাই পেলে মাথায় ওঠে; টেবিলের এক কোনায় চড়ে বসে ভুবন ভুলানো হাসি হাসল রানা।

'দেখলে? শেক্সপীয়ার বলে গেছেন, ট্রাই অ্যাণ্ড ট্রাই এগেন ট্রাই, ইউ উইল সাকসীড অ্যাটলাস্ট। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তুমি যদি কোন সুন্দরী রমণীর পেছনে নিরলস ভাবে ফিল্ডিং দিতে থাকো, প্রথম প্রথম সে যত ডাঁটই মারুক, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হবে সে ভজে যেতে...'

হেসে ফেলল শেরি।

'এসব কথা কোথায় পেলে তুমি! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন... কবে, কাকে?'

'আমাকে, সত্যি, স্বপ্নে। প্রায়ই তো দেখা হয় তাঁর সাথে। সেদিন বলছিলেন, আসমাকে আর একবার ডিনারের প্রস্তাব দিয়ে দেখো, খুব সম্ভব রাজি হয়ে যাবে। এমন কি ডিনারের পর হয়তো ও নিজেই বলবে, চলো, তোমার হোটেল-কামরাটা...'

'ভাগ্যিস শিখার বিয়ের যৌতুক হিসেবে টাকাগুলো দিয়ে গেল,' ইন্টারকমের

মধ্যে দিয়ে জটিলেশ্বরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আপনি যে রকম ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন, যেভাবে সাধাসাধি করছিলেন, আমি ভেবেছিলাম গেল বুঝি এতগুলো টাকা!'

হেসে উঠল রানা।

'সব কথা শোনা হচ্ছিল বুঝি এখানে বসে রসে?'

'না শুনে উপায় ছিল না,' বলল শেরি। 'তাড়াহুড়োয় সুইচটা অফ করতে ভুলে গেছেন বস্। জানলাম, সত্যিই বড় মনের মানুষ তুমি। কিন্তু···সব শুনলাম কোথায়? আসল জায়গাটাই তো শুনতে দিল না বুড়ো। সেই যে রাত দুপুরে, হোটেলে···'

'ও নিজের জন্যে যদি টাকাগুলো নিত, তাহলে আমি আরও অনেক খুশি হতাম, জটিল,' বলল শংকরলালজী। 'আশ্চর্য ভাল ছেলে! অনুতপ্ত এক বুড়ো মানুষকে অপমান করল না, অসম্মান করল না, অথচ ফিরিয়ে দিল সব টাকা।'

'যা যা বলেছ সব সত্যি?' রানার চোখে চোখ রাখল শেরি।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সে-রাতে কি হয়েছিল আসলে?'

'শিখা এসে আমার ঘরে ঢুকবার পর তো?' হাসল রানা। 'সে অনেক কথা। সব শুনতে হলে চলে এসো আজ ল্যাসেরে রেস্তোরাঁয়। ঠিক ন'টার সময়। ডিনার। অলরাইট?'

'তুমি আমাকে পাপের পথে ডাকছ?'

'দুটো মানুষ যদি পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, আমি তো বুঝি না তার মধ্যে পাপটা কোথায়? জানো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন···'

'হয়েছে, হয়েছে। আসছি আমি। ঠিক ন'টায়। এখন ভাগো। যে কোন সময় বেরিয়ে আসতে পারে বুড়ো। কিছু সন্দেহ করলে আবার ওভারটাইম দিয়ে আটকে দেবে।'

'ঠিক আছে। জাস্ট ওয়ান কিস্। তারপর দূর হয়ে যাব।'

উঠে দাঁড়াল আসমা শেরি। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। রানার বাম হাতটা জড়িয়ে ধরল ওর ক্ষীণ কটি। চিক চিক করছে শেরির চোখের তারা। নেমে এল রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট।

ঠিক এমনি সময়ে নিঃশব্দে খুলে গেল জটিলেশ্বরের দরজা।

সামনের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল জটিলেশ্বর। কি করবে বুঝে পেল না কিছুক্ষণ। এগোতে গিয়েও থেমে গেল, পিছিয়ে গেল, তারপর নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল আবার দরজাটা।

****

মাসুদ রানা
[দুইখণ্ড একত্রে]

নীলছবি

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্যারিস থেকে ছুটল রানা,
উদ্ধার করবে তিনটি ছবির রীল।
ফিরিয়ে আনবে শিখা শংকরকে।
মুশকিল হলো, আরও অনেকে চায় ওগুলো।
শেষ করে দিতে চায় অবাধ্য শিখাকে।

জার্মানীর এক বিশাল পাঁচিল ঘেরা দুর্গে
মুখোমুখি হলো সবাই।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০